ফ্রয়েড

(Freud : Life and Psychoanalysis)

সুনীল কুমার সরকার

অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি কলেজ, রায়গঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ ।

।। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে পুনঃ প্রকাশিত ।।

প্রথম সংস্করণ আগষ্ট, ১৯২২
দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৪৪
তৃতীয় সংস্করণ জুলাই, ১৯৫৯

শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট
শ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর
ভি, আই, পি, রোড, কলিকাতা-৫৯

শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত
এবং তারা প্রিন্টার্স. ২৬ নং কে, জি, বোস সরণী,
কলিকাতা-৮৫ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

স্বর্গলোকবাসী আমার পিতৃদেব সুধীর চন্দ্র সরকারের
স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ।

সূচী

ভূমিকা

১৯৩৬ সালে ফ্রয়েডের ৮০-তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হ'ল। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিনন্দন আসতে শুরু করল। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন (Einstein) চিঠি পাঠালেন: "এ-যুগের অন্যতম শিক্ষকদের একজন হিসেবে এ-যুগের মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারছে বলে আমি খুব আনন্দিত। .... । কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি শুধু আপনার চিন্তা-শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারতাম এবং বর্তমান যুগের বিশ্ব-বীক্ষার ওপর এর কত প্রচণ্ড প্রভাব আছে তা' বুঝতে পারতাম;—এর মধ্যে কতটা সত্য লুকিয়ে আছে তা' হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। যা'হোক, বেশীদিন আগের কথা নয়, আমার কতকগুলো সাধারণ ঘটনার কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল। আমার মতে সেগুলোকে আপনার অবদমন-মতবাদ (Theory of repression) ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সে-গুলো জানতে পেরেছিলাম বলে আমি খুশী, কারণ যখন কোন মহৎ এবং সুন্দর চিন্তাধারা বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায় তখন সত্যি খুব আনন্দ হয়।" টমাস মান্ (Tomas Mann), রোঁমা রোঁলা (Romain Rolland), এইচ. জি. ওয়েলস্ (H. G. Wells), ভার্জিনিয়া উল্ফ (Virginia Woolf), ষ্টিফান সোয়াইগ (Stefan Zweig) এবং অন্যান্য ১৯১ জন বিখ্যাত লেখক ও শিল্পীদের স্বাক্ষর-করা একটি অভিনন্দন-পত্র এসে হাজির হল। বিংশশতাব্দীতে মানুষের চিন্তাধারাকে ফ্রয়েডের মতবাদ কতখানি নাড়া দিয়েছিল তা' অন্ততঃ কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে এ-থেকে।

সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজবিজ্ঞানে, দর্শনে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ফ্রয়েডের প্রভাব সর্বত্র বিদ্যমান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বোধহয় ফ্রয়েডকে জানতে কৌতূহলী হয়েছিলেন। তাই হয়তো ১৯২৬ সালের ২৫শে অক্টোবর ভিয়েনায় থাকতে তিনি একবার ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করেন। ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানে কৌতূহলী হয়ে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও ১৯৩৫ সালে ভিয়েনাতে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর মতবাদ উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বাংলাভাষার পাঠকদের অনেকেই ফ্রয়েডকে জানতে আগ্রহী, অথচ তাঁদের কাছে তাঁর মূল চিন্তাধারাগুলো সংক্ষেপে এবং সহজ-সরলভাবে পৌঁছে দেবার মত বই নেই বললেই চলে। তাই আমার এই প্রচেষ্টা। রচনা সার্থক হয়েছে এ আমি বলব না ; সে অভিপ্রায়ও আমার ছিল না ; অপি চ সে ক্ষমতাও আমার নেই। শুধু, বাংলাভাষার পাঠকের মনে এই রচনা ফ্রয়েড সম্পর্কে একটুখানিও যদি কৌতূহল জাগাতে পারে, তাহলেই নিজেকে আশাতীত ধন্য মনে করব।

ফ্রয়েডের জীবনের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে তাঁর জীবনীতে আমাদের ঔৎসুক্য। সম্মোহন সম্পর্কে অনেকেরই সঠিক ধারণা হয়তো নেই, অথচ মনঃসমীক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে সম্মোহনের কথা বলতে হয়েছে বারবার। তাই ১ নং 'পরিশিষ্টে' সম্মোহন নিয়ে আলোচনা করেছি।

এই পুস্তক রচনায় যে-সব লেখকের রচনা থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি তাঁদের নাম ৩নং পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছি। তাঁদের সবার কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের রিডার শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য (যিনি একজন প্রতিষ্ঠিত মনঃসমীক্ষক) এ-রচনার উন্নতি-কল্পে আমাকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ শিবপদ চক্রবর্তী, এম. এ., ডি. লিট, আমার পাণ্ডুলিপি যত্নসহকারে দেখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ আমার পাণ্ডুলিপি ছাপিয়েছেন বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পরিশেষে, আমার স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জু সরকার এ-লেখায় যে-প্রেরণা দিয়েছেন তা ভুলবার নয়।

ইউনিভার্সিটি কলেজ,
রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর

শ্রীসুনীল কুমার সরকার

মানুষের মনের গোপন রহস্যের কথা কে না জানতে চায় ? এ-রহস্য যে কত অতলান্তিক, কত বিচিত্র, —তা ভাবতেও পারা যায় না। রহস্যজনক বলেই মানুষের মনকে মানুষ জানতে চেষ্টা করছে সেই আদি কাল থেকে। মনস্তত্ত্বে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে মানুষ মানুষের মনকে জানতে চেয়েছে। কিন্তু মানুষের মনকে জানার এত সাধনা সত্ত্বেও আমরা ততদিন অজানার অন্ধকারেই ছিলাম, যতদিন নাকি সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) আমাদের কাছে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনের অজানা দুই প্রকোষ্ঠের (অবচেতন ও অচেতন মন) দ্বারোদ্‌ঘাটন না করেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে তাই সিগমুন্ড ফ্রয়েড একটি চিরস্মরণীয় নাম।

মোরাভিয়ার ফ্রাইবার্গ-এর ১১৭ নং শ্লোসারগ্যাসে ১৮৫৬ সালের ৬ই মে সকাল ৬-৩০ মিনিটে ফ্রয়েডের জন্ম হয়। উত্তরকালে ফ্রয়েডের সম্মানে শ্লোসারগ্যাস-এর নাম পাল্‌টে ফ্রয়েডোভা ইউলিস্‌ রাখা হয়।

ফ্রয়েডের আত্মজীবনী ও তাঁর ছাত্র আরনেষ্ট জোন্‌স-এর তিন খণ্ডে লেখা ফ্রয়েডের জীবনী থেকেই ফ্রয়েড মানুষটিকে জানতে পারি। ফ্রয়েডের আত্মজীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত। ফ্রয়েড নিজের জীবনী লেখা সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। তিনি বলতেন, তাঁর কাজ এবং চিন্তাধারাই আসল কথা। তাঁর জীবনী কিছুই না। তাই তাঁর আত্মজীবনী থেকে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারি না জোন্‌স ছিলেন ফ্রয়েডের প্রিয়তম শিষ্য এবং প্রায় ত্রিশ বছর তিনি ফ্রয়েডের সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। তাঁর বিশদভাবে লেখা তিনখণ্ডে ফ্রয়েডের জীবনী থেকেই আমরা মানুষ ফ্রয়েডকে বেশ ভালভাবে জানতে পারি।

ফ্রয়েডের বাবার নাম ছিল জ্যাকব ফ্রয়েড। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন উলের ব্যবসায়ী।

ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান অনুসারে শিশুর যখন তিন বছর বয়স, তখনই তার বাকী জীবনের চরিত্রের কাঠামো গড়া হয়ে গেছে। তাই ফ্রয়েডের খুব ছোটবেলা সম্বন্ধে আমরা এত কৌতূহলী। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি তাঁর তিন

বছর বয়স অবধি ঘটনাবলীর কথা বিশেষ স্মরণ রাখতে পারেন নি। যে দু'চারটি ঘটনা তিনি স্মরণ করতে পেরেছেন এবং তাঁর চল্লিশ বছর বয়সের সময় মনঃ সমীক্ষণের সাহায্যে তিনি যা উদ্ধার করতে পেরেছেন, তাও খুবই অল্প।

ফ্রয়েড ছিলেন তাঁর মায়ের প্রথম সন্তান। ছোটবেলায় ফ্রয়েড ছিলেন শান্ত, সুবোধ বালক—লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন বেশি। ফ্রয়েড 'পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। ফ্রয়েডের লেখাপড়ার প্রতি পরিবারের নজর ছিল অপরিসীম। ছাত্র জীবনে বাবার সঙ্গে ফ্রয়েডের কোন মতানৈক্য হয় নি। শুধু একবার একটু মতানৈক্য দেখা দেয়। ষোল-সতেরো বছর বয়সের সময় ফ্রয়েডের এত বেশী বই কেনার ঝোঁক ছিল যে তাঁর বাবা আর কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারতেন না।

ফ্রয়েডের ধর্ম কি ছিল, তা বলা মুস্কিল। তাঁর বাবা ছিলেন গোঁড়া ইহুদী। তাঁর ছেলেদের কাছ থেকে আমরা যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় তিনি ধর্ম সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত ছিলেন।

স্কুল জীবনের ইতিহাস তাঁর খুবই উজজ্বল ছিল। কারণ স্কুলে থাকতে ছয় বছরের প্রতিবারই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সতের বছর বয়সে ডিষ্টিংশন নিয়ে গ্রাজুয়েটেড্ হন। শুধু বিজ্ঞানে নয় ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল যথেষ্ট। ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী এবং ইংরেজী বেশ ভাল জানতেন। শেষকালে ব্রুকের (Brucke) প্রভাবে তিনি শরীরতত্ত্বে মনোনিবেশ করলেন। বিজ্ঞানের সব শাখাতেই তাঁর অপরিমেয় আকর্ষণ ছিল। নিজের সীমাবদ্ধ প্রতিভাতে তিনি কখনো সন্তুষ্ট ছিলেন না। অনেকের ধারণা, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ হয় শার্কো (Charcot) এবং ব্রয়ারের সংস্পর্শে এসে। আসলে তিনি যখন ব্রুকের তত্ত্বাবধানে কাজ করছিলেন তখন থেকেই মনস্তত্ত্বে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়।

১৮৮১ সালের ৩০শে মার্চ ফ্রয়েড চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। ১৮৮১ সালেই তিনি ব্রুকের শরীরতত্ত্ব গবেষণাগারে ডেমন্‌ষ্ট্রেটর পদে আসীন হলেন। দেড় বছর পর একদিন হঠাৎ তিনি ব্রুকের গবেষণাগারের চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথে নেমে পড়লেন।

আর্থিক অবস্থা যখন ভগ্নপ্রায়, তখন মহানুভব জোসেভ ব্রয়ার তাঁকে নিয়মিত সাহায্য করে যেতে লাগলেন। এম. ডি. (M. D.) ডিগ্রী অর্জন

করার পর থেকেই তিনি ব্যথিত হৃদয়ে ভাবছিলেন—এবারে সংসারের পথে পা না বাড়ালে আর নিস্তার নাই। ঠিক একই সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে গেল। মার্থা বার্ণেস (Martha Bernays) নামে একটি যুবতীর প্রতি তিনি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেন। ১৮৮২ সালের ৩১শে জুলাই তিনি ভিয়েনার জেনারেল হস্পিটালে যোগ দিলেন। ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তিনি চর্মরোগ বিভাগে নিয়োজিত হ'লেন। ১৮৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী ঐ হাসপাতালের স্নায়ু বিভাগে তিনি যোগ দেন। এখানেই তিনি কাজ করেছেন সবচেয়ে বেশী। ১৮৮৫ সালে ফ্রয়েড স্নায়ুরোগ চিকিৎসার অধ্যাপক (Lecturer) নিযুক্ত হলেন।

এরপর ফ্রয়েড স্নাতোকোত্তর ভ্রমণমূলক বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করেন এবং এবারও ব্রুকের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় এই বৃত্তি পেয়ে যান। ১৮৮৫ সালে এই বৃত্তি নিয়ে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করেন। বৃত্তি নিয়ে তিনি প্রথমে উনিশ মাস প্যারিসে স্নায়ুতন্ত্রের ওপরে কাজ করেন। পরে তিন সপ্তাহ বার্লিনে ব্যাগিনস্কি-এর (Baginski) অধীনে শিশু রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সুতরাং ১৮৮৫ সাল তাঁর সফলতার বছর।

ফ্রয়েড তাঁর হৃদয়ের কোমল দিকটি সবসময় ঢেকে রাখতেন। তাঁর প্রণয় কাহিনী ছিল তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সারা জীবনে তিনি সর্ব মোট ন'শ'-এরও বেশী চিঠি লেখেন তাঁর প্রিয়তমা মার্থার কাছে। দুজনের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে বোঝাপড়া হবারও সাড়ে চার বছর পর তাঁদের বিয়ে হয়।

যৌন ব্যাপারে ফ্রয়েড তৎকালীন সামাজিক শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। একবার মার্থা এক নবদম্পতীর সঙ্গে কয়েকদিন থাকার অনুমতি চেয়ে ফ্রয়েডকে লিখেছিলেন—এই দম্পতী বিয়ের আগেই বাসর যাপন করেছেন। ফ্রয়েড মার্থাকে অনুমতি না দিয়ে বলেছিলেন যে এ-ধরনের লোকের সঙ্গে মেলামেশা না করাই বাঞ্ছনীয়। যা'হোক, এই সময় থেকেই ফ্রয়েড সায়াটিকা রোগে ভুগতে আরম্ভ করেন। এই সায়াটিকা তাঁর শেষ জীবনে দুর্বিসহ যন্ত্রণা টেনে এনেছিল। কিন্তু তাঁর নিজের চেয়েও মার্থার জন্য তাঁর চিন্তা ছিল বেশী। তাঁর অন্যতম বন্ধু শুনবার্গের যখন বাড়াবাড়ি অবস্থা তখনও ফ্রয়েডের বন্ধুর চেয়ে বেশী চিন্তা ছিল মার্থার বিবর্ণ কপোলের জন্য। একবার মার্থা স্কেটিং অনুশীলন করার জন্য ফ্রয়েডের অনুমতি চেয়েছিলেন।

পড়ে গিয়ে তাঁর শরীরে আঘাত লাগতে পারে এবং অন্য লোকের হাত ধরে অনুশীলন করতে হবে—এই দুই কারণে ফ্রয়েড প্রথমদিকে অনুমতি দেন নাই। শেষে অনুমতি দিয়েছিলেন এই শর্তে যে মার্থা অন্য কারো হাত ধরে অনুশীলন করবেন না।

মার্থার সঙ্গে বিয়ে ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছিল একমাত্র ফ্রয়েডের দারিদ্রের জন্য। ১৮৮৬ সালের ২৫শে এপ্রিল রবিবার অর্থ সংগ্রহার্থে তিনি ভিয়েনায় চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন।

অবশেষে বিয়ের সেই আনন্দঘন মুহূর্ত্তটি এ'ল ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ সালে। কিছু কালের মধ্যেই নতুন নতুন মুখ এসে তাঁদের সংসার আনন্দে ভরিয়ে তুলল। এ-পর্যন্ত আমরা যা জানতে পারলাম তাথেকে দুটো জিনিস খুব স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি—দারিদ্র ছিল ফ্রয়েডের জীবনে এক বিরাট অন্তরায়, আর তাঁর বন্ধুরা ছিলেন সবাই বিখ্যাত গুণীলোক। হাসপাতা-লের কাজের বাইরেও তিনি রোগী দেখতেন, তৎকালে এ-ব্যবস্থা অনুমোদিত ছিল। এ-ছাড়া ছিল প্রাইভেট ছাত্র পড়ানো। ফ্রয়েডকে সাহায্য করতেন ব্রয়ার। ব্রয়ারের আর্থিক সাহায্য না পেলে তাঁর জীবনে আরও অনেক অশান্তি নেমে আসতে পারত। শেষ বয়সে ফ্রয়েড 'রাইটার্স ক্র্যাম্প' বা 'লেখকদের আড়ষ্টতা' রোগে আক্রান্ত হন। তিনি এত বেশী লিখতেন যে তাঁর এ-রোগ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ১৮৮৪ সালে সায়াটিকা রোগে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। প্রায় কুড়ি বছর তিনি স্নায়ুদৌর্বল্যে ভুগেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আশাবাদী ঃ "আমি বিশ্বাস করি ওপর তলার দশ হাজার লোকের মধ্যে নিজে স্থান করে নেবার মত প্রতিভা আমার আছে।" ফরাসী লোকদের প্রতি তাঁর উপেক্ষার সবটাই উবে গেল তিনি যখন শার্কোর সংস্পর্শে এলেন। শার্কোর প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। শার্কো ছিলেন "দারুণ উত্তেজক, প্রায় পাগলকরা মানুষ"। "শার্কোর মত অন্য কেউ আমাকে এতখানি প্রভাবিত করে নাই।" শার্কোই ফ্রয়েডকে স্নায়ুতন্ত্রের পথ থেকে মানসিক চিকিৎসার জগতে নিয়ে এসেছিলেন। ফ্রয়েড চিরদিনই ছিলেন স্বাধীনচেতা। জীবনে মূল্যবান একটা কিছু করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আরামকে তিনি ঘৃণা করতেন ; নানারূপ বাধা থাকলেই যেন তিনি বেশী কাজ করতে পারতেন। সফলতা বড় কথা নয়।

১৮৮৫ শরৎকালে এ'ল বিখ্যাত পণ্ডিত শার্কোর কাছে তাঁর শিক্ষা

গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ। শার্কোর কাছে থেকে স্নায়ুতন্ত্র এবং মূর্ছারোগ সম্বন্ধে ফ্রয়েড অনেক জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছিলেন।

পরবর্ত্তি ৫ বছর ফ্রয়েড পারিবারিক কাজে, চিকিৎসা ব্যবসাগত কাজে এবং শার্কো ও বার্ণহেইমের বইগুলোর অনুবাদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ-সময়ে তিনি মাত্র একটি গবেষণামূলক রচনা তৈরী এবং প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯১ সালে 'বাকরোধ' (Aphasia) নামক তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন। শার্কোর মৃত্যুর পরই স্নায়ুতন্ত্রের গবেষণা থেকে ফ্রয়েড ক্রমে ক্রমে সরে এসে মনোবিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

ডঃ ব্রয়ারের নাম আমরা আগেই জেনেছি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনাতে প্রাইভেট্ ডোসেণ্ট নিযুক্ত হ'ন। তিনি প্রতিভাবান ও খ্যাতি-সম্পন্ন চিকিৎসক ছিলেন। শরীরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে দেখামাত্রই ফ্রয়েড ব্রয়ারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরে, ব্রয়ার ও ফ্রয়েড পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা-পূর্ণ পরিবেশ গড়ে ওঠে। ব্রয়ারই মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত 'এ্যানা-ও' নামক রোগিণীকে ফ্রয়েডের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এ্যানা হঠাৎ মানসিক রোগে আক্রান্ত হন এবং ব্রয়ারের শরণাপন্ন হন। তাঁর শরীরের তিনটি অঙ্গে পক্ষাঘাত দেখা দিয়েছিল; দৃষ্টি ও বাক্শক্তির গোলযোগ হয়েছিল। ব্রয়ার তাঁকে প্রথমে শুধু তাঁর রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত সবকিছু বলতে বলেন। এ্যানা তাঁর রোগকে ঘিরে যত ভাবনা-কল্পনা মনে আসতে লাগল তা' সব ব্রয়ারকে বলতে লাগলেন। দেখা গেল প্রত্যেকবার এরূপ অনুষ্ঠানের (sitting) পর এ্যানা কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। ভেতরে চাপা আবেগরাশি যতই প্রকাশপথ পেল বুক ততই হাল্কা হতে লাগল এবং এ্যানা-ও ততই সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। এই পদ্ধতিকে ব্রয়ার ক্যাথার-সিস্ (catharsis) নাম দিলেন।

কিন্তু কিছুটা সুস্থ হবার পর আর তাঁকে অধিক নিরাময় হতে দেখা গেল না। রোগিণী একরকম প্রেমে পড়ে গেলেন ডঃ ব্রয়ারের। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একে বলা হয় ক্যাথেক্সিস্ (cathexis)। ব্রয়ার তা বুঝতে পেরে একদিন এ্যানাকে ফ্রয়েডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ফ্রয়েড এ-রোগিণীতে অতি উৎসাহী ছিলেন, কারণ শার্কোর কাছে মৃগীরোগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেবার পর এ-রোগ সম্পর্কে আরও জানবার এ-টা ছিল সুবর্ণ সুযোগ। এই বছর ফ্রয়েড নানাকাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। তিন সম্মোহনের প্রতি তাঁর

সমর্থন চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সব রোগীকে সম্মোহিত করতে পারতেন না। তাই ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের নান্সি (Nancy)-তে কয়েক সপ্তাহের জন্য গেলেন সম্মোহনপদ্ধতি ভালভাবে শিখতে। নান্সিতে লিবল্ট ও বার্ণহাইমের কাছে সম্মোহন করার পদ্ধতির প্রশিক্ষণ নিলেন। চেতনমনের পেছনে একটি অতি শক্তিশালী নির্জ্ঞানমন লুকিয়ে থাকতে পারে এই ধারণা তাঁর এখান থেকেই শুরু হয়।

এরপরই ফ্রয়েডের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলোর ইতিহাস শুরু হ'ল। এই আবিষ্কারগুলোর প্রথমটি হচ্ছে অবাধভাবানুসঙ্গ পদ্ধতি (method of free association)। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি এই অবাধ-ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সম্মোহন, অভিভাবন, উপরোধ (pressing). প্রশ্নাবলী (questionaire), ইত্যাদি পদ্ধতি ধীরে ধীরে অবাধভাবানুসঙ্গ পদ্ধতির দ্বার উদ্ঘাটন করে। সবরোগীকে প্রয়োজনমত সম্মোহিত করা যেত না, তাই সম্মোহন ভিন্ন অন্য পদ্ধতির আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য ছিল ফ্রয়েডের।

এলিজাবেথের ব্যাপারে ফ্রয়েড সম্মোহন পদ্ধতি ব্যবহার না ক'রে নতুন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেন রোগিণীর হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে ফিরে পাবার জন্য। তিনি এই পদ্ধতির নাম দেন মনঃসংযোগ (concentration) পদ্ধতি। ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন যে রোগীর স্মৃতিগুলো ক্রমশঃ পুরাতন থেকে পুরানতর স্তরে যায়। এমনকি এ-গুলো শিশু বয়সের স্মৃতি পর্য্যন্ত হতে পারে। তাই তিনি বললেন যে শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলো, বংশগত প্রবণতা (hereditary inclination) সহ অথবা ব্যতিরেকে, মানসিক রোগের সৃষ্টি করে থাকে। ক্রমে ফ্রয়েড মানসিক রোগের সঙ্গে যৌনসংক্রান্ত ব্যাপারের নিবিড় সম্পর্ক আছে বলে মনে করতে থাকেন।

কিন্তু ফ্রয়েডের ক্রমশঃ মানসিক ব্যাধিতে যৌন ব্যাপারের অস্তিত্বের কথা জোর দিয়ে বলাতে ক্রমে তার সহকর্মীদের থেকে বাধা আসতে লাগল। যা হোক অচিরেই তিনি ব্রয়ারের সহযোগিতা পেলেন। তাঁরা দু'জনে মিলে মূর্চ্ছারোগের ওপর একটি রচনাও প্রকাশ করলেন। এর দু'বছর পর তাঁরা 'ষ্টাডিজ ইন্ হিষ্টোরিয়া' নামক মূর্চ্ছারোগের ওপর একখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন। এই বইয়ের প্রকাশনার তারিখ থেকেই অনেকে মনঃসমীক্ষ-ণের শুরু বলে করেন।

ফ্রয়েড জেনে (Janet)-এর মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মূর্ছারোগের কারণ নিষ্পেষিত স্মৃতি ; আবিষ্ট ধারণার ব্যাধির কারণ বিকৃত আবেগ ; আর ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাধির কারণ আত্ম-রক্ষামূলক উদ্ভট কল্পনারাজি।

এই সময়ে ফ্রয়েড একপ্রকার মানসিক রোগে ভুগছিলেন। বাইরে থেকে তাঁর ভেতরের যন্ত্রনা কিছুই বোঝা যেত না। রোজের কাজ ঠিক ঠিক করে যেতেন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক স্বাভাবিক ছিল, এবং লেখাপড়া ও গবেষণা-ও চালিয়ে যেতেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রায় দশ বছর ধরে তিনি দারুণ মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করেছিলেন। রোগের আক্রমণ যখন বেশী হ'ত তখন তিনি চিন্তায় নিবিষ্ট থাকতে পারতেন না ; কখনো উৎফুল্ল থাকতেন আবার কখনো ভেঙ্গে পড়তেন, মনটা থাকতো আলোআধারি-ভাবে।

১৮৯৭ সালের গ্রীষ্ম থেকে ফ্রয়েড আত্মবিশ্লেষণ শুরু করেন। আত্ম-বিশ্লেষণ শুরু করার আগে তাঁর ভয় ছিল যে এর ফলে অপ্রীতিকর স্মৃতি মনে আসতে পারে এবং ফলে অনেক সাংসারিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু শেষে সত্য সন্ধানের স্পৃহা তাঁকে পেয়ে বসল। আত্মবিশ্লেষণ থেকে ফ্রয়েড তাঁর দুটি আবিষ্কারের সমর্থনের সুযোগ পেয়েছিলেন—স্বপ্নতত্ত্ব এবং শৈশবকালীন যৌনতা। ১৮৯৫ সালে তিনি সর্বপ্রথম তাঁর নিজের স্বপ্ন বিশ্লেষণ শুরু করেন। আত্ম-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বই 'স্বপ্ন ব্যাখ্যা'র (The Interpretation of Dreams) পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

ফ্রয়েডের 'স্বপ্নব্যাখ্যা' (The Interpretation of Dreams) ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়, অবশ্য প্রকাশক নাম-পৃষ্ঠায় ১৯০০ সাল ছাপিয়ে ছিলেন। বইখানি ফ্রয়েডের অমূল্য অবদান। তিনি বলতেন যে তাঁর বইগুলোর মধ্যে এই বইখানি এবং 'থ্রি এসেজ্ অন দি থিওরি অফ সেক্সুয়ালিটি' এই বইখানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

স্বপ্ন-ব্যাখ্যা হ'ল অবচেতনমনের পথপ্রদর্শক। স্বপ্নে আমরা আমাদের ইচ্ছাকে কাল্পনিকভাবে চরিতার্থ করি। এ-দিক দিয়ে দিবাস্বপ্নের (day-dreaming) সঙ্গে স্বপ্নের কোন পার্থক্য নাই। শুধু এইটুকু পার্থক্য যে দিবাস্বপ্নে আমাদের ইচ্ছাগুলো থাকে সচেতনমনের ইচ্ছা আর স্বপ্নে আমা-

দের ইচ্ছাগুলো থাকে নির্জ্জান মনের ইচ্ছা। আবার মানসিক রোগ লক্ষণগুলোর সঙ্গেও স্বপ্নের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রোগলক্ষণগুলোও কাল্পনিক ইচ্ছা-চরিতার্থের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তফাৎ শুধু এইটুকু যে স্বপ্নে আমরা ইচ্ছাগুলোকে কাল্পনিকভাবে পুরোপুরি চরিতার্থ করতে পারি আর রোগলক্ষণগুলোতে অবদমিত ইচ্ছাগুলো এবং অবদমনকারী শক্তির মধ্যে একটা আপোষ হয় মাত্র।

১৯০২ সালে ফ্রয়েডের বাসায় মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হত। এ-থেকেই শুরু হয় 'বুধবারে মনোবিজ্ঞান সমাজ'। পরবর্ত্তিকালে এই সমাজ 'ভিয়েনা সাইকোএ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি' নামে পরিচিত হয়। ক্রমে পশ্চিমী দেশগুলোতে ফ্রয়েডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা যায় ব্লয়লারের (Bleulor) প্রধান সহকর্মী সি. জি. ইয়ুং (C. G. Jung)-এর মধ্যে। ফ্রয়েডের 'স্বপ্ন-ব্যাখ্যা' প্রকাশিত হবার পরই এ বই পড়ে তিনি মুগ্ধ হন।

১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হলে ফ্রয়েডের ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়ুংকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তার সভাপতি করা হ'ল। এর পর কার্ল আব্রাহাম (Karl Abraham), স্যানডর ফেরেনজি (Sandor Ferencgi), হান্স স্যাক্স (Hans Sachs), প্রমুখ মনীষীরা এসে ফ্রয়েডের অনুগামী হন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শত্রুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। তিনি হেসে বলতেন : "অনেক শত্রু মানে অনেক সম্মান।" আমেরিকাতেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। ম্যাসাচুসেট্স-এর ক্লার্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ষ্ট্যানলী হল (Stanly Hall) ফ্রয়েডকে কয়েকটি ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমেরিকাতে থাকাকালীন তিনি মনো-বিজ্ঞানী ও দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ (William James)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুতত্ত্বের অধ্যাপক জে. জে. পুটনাম (J. J. Putnam) তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে তাঁর যশ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। কিন্তু তাঁর নিজের ভিয়েনাতে তাঁর কাজের মূল্যের স্বীকৃতি কোন দিনই পাওয়া যায় নাই।

১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত ছিল তাঁর জীবনের সুখের সময়। এর পরই এ'ল একে একে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর মর্মান্তিক বিচ্ছেদ, আর্থিক অনটন

এবং শারীরিক অসুস্থতা। ১৯১১ সালে প্রিয় অনুগামী এ্যাডলার এবং ১৯১৩ সালে ইয়ুং-এর সঙ্গে তাঁর চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হ'ল। এ-বিচ্ছেদের কারণ ব্যাক্তিগত ব্যাপার নয়—মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের পার্থক্য। কিন্তু শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯১৩ সালের প্রথমার্ধ তাঁর 'টোটেম এন্ড ট্যাবু' নামক বই লিখতে কেটে গেল।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব সহজে কেউ কোনদিন সহজে গ্রহণ করেন নি। তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জার্মন স্নায়ুতত্ত্ববিদ (neurologist) ও মনোচিকিৎসকদের (Psychiatrists) সম্মেলনে ১৯১০ সালে অধ্যাপক (Professor) উইলিয়াম বেগ্রাণ্ট (Wilhelm Weygrandt) ফ্রয়েডের যৌনমতবাদের দারুণ প্রতিবাদ করেন।

তারপর এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের সময়ে তাঁর লেখা কিন্তু থেমেছিল না। শরীর ভেঙ্গে পড়লেও লেখা চলছিল পুরোদমে। অসুস্থ শরীরেই তাঁর লেখা যেন চলছিল দ্রুততর গতিতে।

১৯১৮ সালের ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর ৫ম 'আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষণ কংগ্রেস' হাঙ্গেরীর 'এ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স' হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসের বিশেষত্ব ছিল এই যে এতে অষ্ট্রিয়া, জার্মানী এবং হাঙ্গেরীর সরকারের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের যোগ দেবার কারণ ছিল এই যে তখন মনঃসমীক্ষণের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যুদ্ধে অনেক 'ওয়ার নিরোসিস' (War neurosis) বা যুদ্ধজনিত-বায়ুরোগ দেখা দিয়েছিল।

এশিয়া, গ্রীক ও ইজিপ্টের পুরানো জিনিসপত্র সংগ্রহ করাতে ফ্রয়েডের ভীষণ আগ্রহ ছিল। তাঁর কোনদিন খুব বড় অসুখ দেখা যায় নাই। তবে সারাজীবন তিনি ছোটখাট অনেক অসুখে ভুগেছেন। বাত, আধমাথাধরা ও সর্দ্দি তাঁকে সারাজীবন খুব কষ্ট দিয়েছে। চিরদিনই তাঁর অদ্ভুত একটা মৃত্যুভয় ছিল।

লেখাটা ছিল তাঁর একটা সুখকর অভ্যাস। তিনি নিজে হাতে লিখতেন, শেষ বয়েসে অর্থাৎ ৭০-এর পর তাঁর কন্যা মাঝে মাঝে লিখে দিতেন তাঁর কথাগুলো। তাঁর লেখার কায়দা ছিল অদ্ভুত। হয়তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ বা মাসের পর মাস কিছু লিখলেন না। তারপর হঠাৎ একদিন

লেখা শুরু করলেন। প্রথমদিকে ২।৪ লাইন করে, পরে তাঁর লেখার হাত যেন থামতেই চাইত না। শারীরীক অসুস্থতার মধ্যেই যেন তিনি লিখতে পারতেন বেশী।

চারিত্রিক দিক থেকে বলতে গেলে ফ্রয়েড ছিলেন অতি সাদাসিধে লোক। তিনি ছিলেন শান্ত স্বভাবের, কোনরকম ঔদ্ধত্য তাঁর মধ্যে ছিল না। কোন রকম পাণ্ডিত্যের বা আভিজাত্যের ভান তিনি করতেন না। চৌকস কথা-বার্তা নিজে না বললেও এসব তিনি পছন্দ করতেন। তাঁর শৈশব বা বাল্য-কালের ঘটনা তিনি ছেলেমেয়েদেরকে বলতেন না। কিন্তু তাঁর একটি বড় দোষ এই ছিল যে তিনি কারো গোপন কথা গোপন রাখতে পারতেন না, সুযোগ এলেই বেখেয়ালভাবে কাউকে বলে ফেলতেন। সাধারণ ধারণা এই যে ফ্রয়েড ছিলেন নিরাশাবাদী; আসলে কিন্তু তা নয়; তাঁকে বড়জোর উৎসাহ-যুক্ত বা প্রফুল্ল নিরাশাবাদী বলা যেতে পারে। তিনি বর্তমানকে নিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। নিজেকে তিনি বড় কিছু ভাবতেন না। লোকে-রাই তাঁকে মাঝে মাঝে গ্যাঠে, কান্ট, ভলটেয়ার, ডারউইন, শোপেনহাওয়ার বা নিট্শের সঙ্গে তুলনা করত।

তাঁর মধ্যে একটা দ্বৈত ভাব ছিল সবকিছুতে। তিনি নিজের মধ্যেও ভালবাসা ও ঘৃণার পাশাপাশি অবস্থান দেখেছেন। আবার তাঁর মতবাদেও দেখা যায় দ্বৈতবাদ—এরস্ (Eros) আর থানাটস্ (Thanatos); আত্মমুখী যৌনতা আর পরমুখী যৌনতা; অধিশাস্তা আর অদস্ (Super-ego and Id); ইত্যাদি। ফ্রয়েডের মানসিকতা ছিল নমনীয় (plastic)। মুক্ত এবং উচ্চতর কল্পনা শক্তি তাঁর রক্তমাংসে ছিল। দার্শনিক হেরাক্লি-টাসের মতে এই গুণ ছাড়া নতুন নতুন আবিষ্কার করা যায় না। আপাতঃ অসম্ভব এবং অদ্ভুত জিনিসে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন—প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে এটা দেখা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলো তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। এই সময়ে তাঁর কিছু রচনা 'এ জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন টু সাইকোএ্যানা-লিসিস্' নামে প্রকাশিত হয় এবং তা থেকে তিনি কিছু অর্থ পান। এ-বইতে কিছু ভুল থাকাতে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হ'ন। পরে এই বইখানি 'ইনট্রোডাকটরি লেকচার অন সাইকোএ্যানালিসিস্' নামে শুদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়।

মনঃসমীক্ষণের মতে সমস্ত মানসিক রোগের কারণ হ'ল আবেগের দ্বন্দ্ব (emotional conflict)। যুদ্ধের সময় সৈনিকদের যুদ্ধ করার ইচ্ছা বা আবেগ এবং বাঁচার ইচ্ছা বা আবেগ এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকায় প্রায়ই সৈনিকদের মধ্যে মানসিক রোগ দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এরূপ অনেক মানসিক রোগী দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্রয়েডের খ্যাতি চারদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯২০ সালেই তাঁর আর্থিক অবস্থা ফিরে আসতে থাকে। মনঃসমীক্ষণের পত্রিকা ফারল্যাগ (Verlag) প্রতিষ্ঠিত হয় এই একই বছর। তাঁর 'ইনট্রোডাকটরি লেকচারস্ অন সাইকোঅ্যানালিসিস'-ও এই বছরেই তিনি শেষ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ফ্রয়েডের মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। ধ্বংসের বা মৃত্যুর প্রতি মানুষের যে প্রবৃত্তিগত আকর্ষণ আছে ফ্রয়েড সেটাকে আগে তেমন গুরুত্ব দেন নি। বিশ্বযুদ্ধের পরই এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ সচেতন হন। এবং এর ফলেই তাঁর বই 'বিয়ণ্ড দি প্লেজার প্রিন্সিপল্‌স্' এর জন্ম হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুবছর তিনি আগের সেই উদ্যম ফিরে পেয়েছিলেন; তাঁর কাজ এবং লেখা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন হল না, ফ্রয়েডের যশ যুদ্ধের সময়ই বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া এবং ফ্রান্সে তাঁর কথা ঘরে ঘরে শোনা যেতে লাগল। আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে দলে দলে শিক্ষার্থী আসতে লাগল তাঁর কাছে।

তারপর শুরু হল দুর্ভাগ্য। তাঁর ভগ্নী সেইসিলি ১৯২২ সালে মারা যান। ফ্রয়েড তাঁকে খুব ভালবাসতেন। ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইস্. জি. ওয়েলস-এর সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচিতি ছিল। এই বছর ডিসেম্বর মাসে তার ৫ম পুত্রের জন্ম হয়। পরে এই পুত্র একজন প্রথিতযশ চিত্রকর হন। ১৯২৩ সালে জোন্‌স এবং র‍্যাঙ্কের মধ্যে দারুণ কলহ শুরু হলে কমিটির কাজে অসুবিধা হতে লাগল বলে তিনি খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। ঠিক এই সময়েই তাঁর প্রাণান্তকর ক্যান্সার ধরা পড়ল।

স্যামুয়েল গোল্ডউইন নামক এক চলচিত্র প্রযোজক ফ্রয়েডকে একলক্ষ ডলারের বিনিময়ে কিছু প্রেমকাহিনী সম্বলিত একটি ছবিতে সহযোগীতা করতে বললে ফ্রয়েড অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ছবিতে 'এ্যাণ্টনী ও

ক্লিওপেট্রা' নাটকের মত প্রেমকাহিনী থাকবে, কথাছিল। মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে প্রেমকাহিনীর নিবিড় সম্পর্ক দেখিয়ে পয়সা করার ফন্দিকে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না।

শরীর ভেঙ্গে পড়লে ফ্রয়েড ভিয়েনা সোসাইটিতে যাওয়া ছেড়ে দিলেন এবং দৈনিক মাত্র তিনজন রোগী দেখে শান্ত জীবন কাটাতে লাগলেন। ২৫শে অক্টোবর (১৯২৬ সাল) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে তিনি ভিয়েনাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে যে কোন কারণেই হোক না কেন ফ্রয়েডের খুব একটা ভাল লাগেনি।

রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বসে ছিলেন না। একমাসের মধ্যেই 'সভ্যতা ও তার অসন্তোষ' (Civilization & Its Discontents) বই-এর প্রথম খসড়া শেষ হয়ে গেল। জুলাইমাসে সুখবর এল, ফ্রয়েডকে গ্যাঠে পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এ-পুরস্কার পেয়ে তিনি খুবই খুশী হয়েছিলেন।

এদিকে নাৎসী অত্যাচার চরমে উঠল। মনঃসমীক্ষণের অবস্থাও ফলে শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। এর কারণ ছিল দুটো—প্রথমতঃ, ইহুদীদের ওপর নাৎসীদের ছিল রক্তচক্ষু আর ফ্রয়েড ছিলেন ইহুদী। দ্বিতীয়তঃ, মনঃ-সমীক্ষণকে নাৎসীরা কেন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল।

সাধারণ মানুষের প্রতি ফ্রয়েডের কি পরিমাণ দয়া ছিল তা বোঝা যাবে আমেরিকার এক ভদ্রমহিলার কাছে লেখা তাঁর একখানি চিঠি থেকে। এই ভদ্রমহিলার ছেলে সমমৈথুনে দারুণ আকৃষ্ট ছিল। ভদ্রমহিলা তাই ফ্রয়েডের কাছে পরামর্শ চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও ফ্রয়েড এই চিঠির উত্তর দিতে ভোলেন নি। তিনি লিখে পাঠালেন যে সমমৈথুন কোন মানসিক রোগ নয়, যৌনক্রিয়ার এক অসাধারণ প্রকার মাত্র। সমমৈথুনের সঙ্গে অন্য কোন মানসিক রোগ না থাকলে, ভাবনার কিছু নেই। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লোক সমমৈথুনে অভ্যস্ত ছিলেন, যেমন প্ল্যাটো (Plato), মাইকেল এঞ্জেলো (Michael Angelo), লিওনার্ডো ডা ভিন্সি (Leonardo da Vinci), ইত্যাদি।

এই সময়ে খবর এলো লণ্ডণের 'রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিন' তাঁকে সম্মানসূচক ফেলো সর্বসম্মতিক্রমে করেছেন।

১৯৩৬ সালে তাঁর ৮০তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিনন্দন পত্র আসতে শুরু করল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

আইনষ্টাইন চিঠি পাঠালেন ঃ "এ-যুগের অন্যতম শিক্ষকরূপে এ-যুগের মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারছে বলে আমি খুব আনন্দিত। ...কিছুদিন আগেও আমি শুধুমাত্র আপনার অসম্ভব চিন্তাশক্তিকে উপলব্ধি করতে পারতাম, আর বুঝতে পারতাম যে বর্তমান যুগদর্শনে এর কি প্রভাব আছে ; আপনার চিন্তার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমার ছিল না। যা হোক, বেশীদিন আগের কথা নয়, আমার কতকগুলো সাধারণ ঘটনার কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল। আমার মতে সেগুলোকে আপনার অবদমন-মতবাদ (Theory of repression) ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেগুলো জানতে পেরেছিলাম বলে আমি খুশী; কারণ যখন কোন মহৎ এবং সুন্দর চিন্তাধারা বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায়। তখন সত্যি খুব আনন্দ হয়।" জন্মবার্ষিকীতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভিয়েনার সমস্ত বিখ্যাত লোক। টমাস মান, রোমাঁ রোলা, জুল্‌স রোমেইন্‌স (Jules Romains), এইস্‌. জি. ওয়েল্‌স, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (Virginia Woolf), ষ্টিফ্যান সোয়াইগ (Stefan Zweig) এবং অন্যান্য আরও ১৯১ জন লেখক এবং আর্টিষ্টদের সই করা একটি অভিনন্দন পত্র এসে হাজির হল।

এই বছরই তাঁকে 'দি এ্যামেরিকান সাইকিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েশন', 'দি এ্যামেরিকান সাইকোএ্যানালিটিক এ্যাসোসিয়েশন', 'দি ফ্রেঞ্চ সাইকো-এ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি', 'দি নিউইয়র্ক নিউরোলজিক্যাল সোসাইটি' এবং 'দি রয়াল মেডিকোসাইকোলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্মানসূচক সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এ-ছাড়া, এই বছরই তাঁকে 'রয়াল সোসাইটির' করেস্পন্ডিং মেমবার করে তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ট্রটার (Trotter) রয়েল সোসাইটিতে এ প্রস্তাব এনেছিলেন।

যা হোক যুদ্ধ চলাকালেও ভিয়েনা ত্যাগ করা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ নাৎসীরা অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করলে তাঁর পক্ষে ভিয়েনা থাকা সম্ভব হ'ল না। চারদিকে শুধু ট্যাঙ্ক আর ট্যাঙ্ক। 'হিটলারের জয়' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস উন্মাদ। জোন্‌স শেষবারের মত তাঁকে ভিয়েনা ছাড়তে অনুরোধ করলেন। এদিকে একদিন হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। একদল গেষ্টাপো পিস্তল ও চাকু নিয়ে ফ্রয়েডের বাসায় ঢুকে পড়ল। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে ৩০০ পাউণ্ড

টাকা নিয়ে গেল। যাবার সময় ফ্রয়েডের কন্যা এ্যানা ফ্রয়েডকে সঙ্গে নিয়ে গেল। জোন্সের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ঐদিনই পরে এ্যানাকে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁর ওপর কোন রকম অত্যাচার করা হয় নাই।

১৯শে জুলাই (১৯৩৯ সাল) ষ্টিফেন সোয়াইগ বিখ্যাত চিত্রকর সাল-ভাডর ডালিকে (Salvadar Dali) নিয়ে এলেন। ডালি তৎক্ষণাৎ ফ্রয়েডের একখানি স্কেচ করে ফেললেন। ফ্রয়েডের অবস্থা দ্রুত পড়ে যেতে লাল। শরীর শুকিয়ে গেল, যে ঘুম তাঁর চিরবন্ধু ছিল সেও ছেড়ে চলে গেল। হান্স স্যাক্স এলেন তাঁর 'শিক্ষক এবং বন্ধু'-কে শেষবারের মত দেখতে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, এত রোগযন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও ফ্রয়েডের মুখে শান্ত ভাব! ভাগ্যকে তিনি যেন পুরোপুরি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। সুচিকিৎসকদের মত ফ্রয়েডও অষুধ খেতে ভালবাসতেন না। যন্ত্রণা যখন একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল তখন মাত্র এ্যাস্পিরিণ্ খেতে রাজী হলেন। আশ্চর্য্য, এ অবস্থায়ও তিনি কোনরকমে জুলাইর শেষ অবধি মনঃসমীক্ষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ সাল) সাল মধ্য রাত্রির একটু আগে ফ্রয়েড তাঁর সমস্ত যন্ত্রনার অবসান করে চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব জানতে হলে তাঁর কতকগুলো মূল প্রত্যয় আগে জানা বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রত্যয়গুলো হচ্ছে ঃ—

১) Psychical Determinism বা মানস নিয়ন্ত্রণবাদ ;

২) Life and Death Polarity বা জীবন-মৃত্যু দ্বিপক্ষবাদ ;

৩) Infantile Sexuality বা বাল-যৌনতা ; এবং

৪) The Unconscious বা নির্জ্ঞান।

এই চারিটি হচ্ছে তাঁর মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা। ফ্রয়েড কিন্তু আগে থেকেই এদেরকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেন নি। তাঁর গবেষণার বিভিন্ন স্তরে তিনি এ-সব মূল ধারণাগুলোর সন্ধান পান। তবে মানস-নিয়ন্ত্রণবাদটি তিনি বলতে গেলে আগে থেকেই ধরে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হেমহজের (Helmholtz) মতে বিশ্বাসী। হেমহজ বিশ্বাস করতেন যে বস্তুগত যে কোন ঘটনার মতই মানসিক যে কোনও ঘটনার পেছনে একটা না একটা কারণ ও তার নিয়ন্ত্রণ থাকবেই। এখন এই চারটি মূল প্রত্যয়ের একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।

১) মানসিক নিয়ন্ত্রণবাদ ঃ আমরা সাধারণতঃ ভাবি যে মনের অনেক ঘটনাই কারণ ব্যতিরেকে ঘটে থাকে। আমরা বলে থাকি "আমার মনে হয়..."। কিন্তু আমার ঠিক এমন মনে হয়ে অন্য কিছু মনে হ'ল না কেন এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে আমরা বলি যে আমার মনে ঠিক এমন কেন হ'ল তা বলা যায় না। মন স্বনির্ভরশীল, বলতে পারি কিছুটা খাম-খেয়ালী। সুতরাং ঠিক এমন এমন কেন মনে হ'ল তা' বলা যায় না। কিন্তু হেমহজের (Helmholtz) মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কথা হ'ল মনের যে কোন ঘটনারই প্রয়োজনীয় এবং যথোচিত (necessary and sufficient) কারণ না থেকেই পারে না। "Not a sparrow falls without the command of God (ভগবানের আদেশ ছাড়া একটা চড়ুই-ও মাটিতে বসে না)"—ক্যাথলিকরা এমনি চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। ঠিক তেমনি হেমহজের মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন যে কোনরূপ কারণ

না থাকলে কোনরূপ মানসিক ক্রিয়া ঘটতেই পারে না। একটা উদাহরণ নেয়া যাক। আমরা বলি যে আমরা কেন স্বপ্ন দেখি তা বলা যায় না। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন আমাদের মন আজে বাজে কল্পনা করে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে কাজ করে—এটাই স্বপ্ন। কিন্তু হেমহজের মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন যে কোন কারণ না থাকলে মন ঐ আজে বাজে চিন্তা করত না। ধরে নে'য়া যাক যে মন উত্তেজিত ছিল (মস্তিষ্ক উত্তেজিত ছিল) বলেই আমরা ঘুমের ঘোরে ঐ আজে বাজে চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন ওঠে যে আমাদের কতকগুলো স্বপ্নের মধ্যে বিশেষ কতকগুলো মূল ধারণা পাওয়া যায় কেন? কতকগুলো স্বপ্নের মধ্যে এই বিশেষ মূল ধারণার আলোচনা আমরা ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনার সময় করব। যা'হোক তা'হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ফ্রয়েডের মতে কোন প্রকার মানসিক ঘটনা কারণ ব্যতিরেকে ঘটতে পারে না।

২) জীবন-মৃত্যু দ্বিপক্ষবাদ ঃ আমাদের মনের মধ্যে দুটো পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করছে—একটি জীবনমুখী, অপরটি মৃত্যুমুখী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে আমাদের মনের শক্তি শুধুই জীবন-মুখী। এই শক্তির বিকাশ হয় দুটো প্রধান প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে—আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (self-preservation) এবং বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি (reproduction)। আমরা যত রকম কাজই করি না কেন তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়। আমাদের ভালবাসার মধ্যেও এই দুটি প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। জীবনমুখী এই দুটি প্রবৃত্তির কর্ণধার যে মানসিক শক্তি তাকে তিনি বললেন এরস্ (Eros)। দ্বিতীয় মানসিক শক্তির পরিচয় তিনি পেলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। যুদ্ধের ধ্বংসময় তান্ডবলীলা দেখে তিনি ভাবলেন যে মানুষের শুধু মাত্র জীবনমুখী প্রবৃত্তি থাকলে এই ধ্বংসলীলা সম্ভব হ'ত না। তাই তিনি বললেন যে আমাদের আরও একটি প্রবৃত্তি বা মানসিক শক্তি আছে। তিনি এটির নাম দিলেন থ্যানাটস্ (Thanatos) এই শক্তি দু'দিকে বইতে পারে—এক, এটি আত্মঘাতী হ'তে পারে; দুই, এটি পরঘাতী হতে পারে। যখন আত্মঘাতী তখন এর উদ্দেশ্য হ'ল জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে দেয়া; আর যখন পরঘাতী তখন উদ্দেশ্য হ'ল অপরকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা। 'জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা' বলতে

আমরা বুঝব এই যে থ্যানাটস্ আমাদেরকে বিবর্ত্তনের (evolution) উল্টোদিকে নিয়ে যেতে চায়। এরস্ ঠিক তেমনি বিবর্ত্তনের পরিপন্থী নয়, সহায়ক।

ব্যাপারটিকে আরও একটু ভাল করে বুঝে নেয়া যাক। এই এরস্‌কে ফ্রয়েড লিবিডো-ও (libido) বলেছেন। লিবিডো আর যৌনপ্রবৃত্তি ফ্রয়েডের কাছে এক। লিবিডোর প্রকাশ ভালবাসায় বা আকর্ষনে। এটা যখন আত্মমুখী হয় তখন আমরা নিজেদেরকেই ভালবেসে ফেলি। এই অবস্থাকে ফ্রয়েড বলেছেন নারসিসিজম্ (narcissism)। নারসিসাস্ (Narcissus) হ'ল গ্রীক দেবতা, নদী-দেবতা সেফিসাস্-এর (Cephisus) পুত্র। দেবী ইকো (Echo) তার প্রেমে পড়ল, কিন্তু নারসিসাস্ তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করল। দেবীকে এমনতর অপমান করাতে ক্ষুব্ধ হ'য়ে দেবী ভেনাস (Venus) নারসিসাস্‌কে অভিশাপ দিল। ফলে, নারসিসাস্ ঝর্ণার জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে দেখে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং সেই প্রতিচ্ছবির প্রেমে কাতর হয়ে শেষকালে একটি কুসুমে পরিণত হ'ল। লিবিডোর প্রকাশ শুধুমাত্র আত্মরতি বা নারসিসিজমেই হয় না। আমাদের আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তিও লিবিডোর প্রকাশ।

কিন্তু লিবিডো যখন পরমুখী হয় তখন তার প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য হ'ল বংশবৃদ্ধি। লিবিডোকে ফ্রয়েড সম্পূর্ণ যৌনধর্মী বলেছেন। উদ্দেশ্য বংশবৃদ্ধি হ'লেও বাইরে থেকে এবং সাধারণতঃ যৌন আকর্ষণের মধ্যেই এই প্রকার লিবিডো নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। নারী-পুরুষের ভালবাসা বা যৌন আকর্ষণের মূলে রয়েছে এই বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্য। ইংরেজ নাট্যকার বার্ণার্ড শ'-এরও ধারণা ছিল যে নারী-পুরুষের প্রেমের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হ'ল বংশবৃদ্ধি। তবে ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে বার্ণার্ড শ'-এর মতে বংশবৃদ্ধির ভার পড়েছে নারীর ওপর। কিন্তু যেহেতু পুরুষ ভিন্ন নারীর এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না, তাই নারী পুরুষকে আকর্ষণ করতে সদা সচেষ্ট। আর ফ্রয়েড বলেছেন, বংশবৃদ্ধির এই দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের ওপরেই সমান ভাবে ন্যস্ত হয়েছে। তাই উভয়েই উভয়কে সমান ভাবে আকর্ষণ করে।

(৩) বাল যৌনতা ঃ ইংরেজ কবি উইলিয়ম ব্লেক (William Blake) শিশুকে নিষ্পাপ কুসুমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমারও

বলে থাকি যে শিশু হল দেবতুল্য, ধরার মলিনতা তার গায়ে আজও লাগে নাই। কিন্তু ফ্রয়েডের ধারণা কিছুটা খৃষ্ট ধর্মের অনুরূপ। খৃষ্টধর্ম বিশ্বাস করে যে দেহ অর্থই পাপ : আমরা যখন দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসি তখনই পাপই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসে। ফ্রয়েডও তেমনি বলেছেন যে যৌনতাকে দেহ থেকে আলাদা করা যায় না। দেহ সব সময় সুখ চায় (pleasure principle)। এই সুখ দুভাবে আমরা উপভোগ করে থাকি। প্রথমতঃ, আমরা অপরকে দুঃখ দিয়ে সুখ উপভোগ করি। এটাকে ফ্রয়েড বলেছেন ধর্ষকাম (sadism) নারী-পুরুষের যৌন মিলনে পুরুষ নানা ভাবে নারীকে ব্যথা দিয়ে নিজের যৌনসুখ আরও বাড়িয়ে তোলে। এটাই হ'ল ধর্ষকাম। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যখন দুঃখ পাই তখনও অনেক সময় সুখ উপভোগ করি। এটা উদ্ভট মনে হ'লেও ঠিক। নারী-পুরুষের যৌন সম্ভোগের সময় নারী এক প্রকারভাবে অত্যাচারিত হয়। এই অত্যাচারের মধ্যেও নারী একপ্রকার সুখ পায়, এটাই হ'ল দ্বিতীয় প্রকারের সুখ। ফ্রয়েড একে বলেছেন মর্ষকাম (mesochism)। অবশ্য, ধর্ষকাম এবং মর্ষকাম সব সময় আলাদা ভাবে নাও থাকতে পারে। আবার নারীর সুখ সবটাই মর্ষকাম থেকে হয়ে থাকে এবং পুরুষের সুখ সবটাই ধর্ষকাম থেকে হয়ে থাকে, এটাও বলা যায় না।

সে যা'হোক, ফ্রয়েড বলেন যে দেহ মাত্রই সুখ উপভোগ করতে চায়। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর দেহ সুখ চায়। কিন্তু এটাকে যৌনসুখ বলার কারণ কি? সমস্ত দেহটা সুখ চাইলেও এই সুখ দেহের বিভিন্ন অংশে বিশেষ ভাবে কেন্দ্রিভূত। এবং দেহের এই কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যৌনতা জড়িয়ে থাকার জন্যই ফ্রয়েড দেহকে যৌনসুখবিলাসী বলেছেন। এই কেন্দ্র গুলো হ'ল মুখ, পায়ু এবং যৌনাঙ্গ। জীবতত্ত্বের দিক থেকে মুখ এবং পায়ু-কে আলাদা করা যায় না। জাইগট্ (Zygote) অবস্থায় গর্ভে শিশুর মুখ এবং পায়ু একই জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়। এই তিনটির প্রথম দুটি যৌন-কেন্দ্র পরবর্ত্তিকালে (স্বাভাবিক যৌন স্তরে) মুখ্য অংশ অধিকার না করলেও গৌণভাবে এদুটি যৌনসম্ভোগে সাহায্য করে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে মুখ শুধুমাত্র উদরপূর্ত্তির দ্বার নয়, যৌন সম্ভোগেরও কেন্দ্র। অনুরূপ ভাবে পায়ু শুধুমাত্র মলত্যাগের পথ নয়, যৌনকেন্দ্রও বটে। এ-গুলো

শরীরের আরও অন্যান্য অংশ গৌনভাবে যৌনসম্ভোগে সহায়তা করে। সুতরাং দেহকে যৌন সম্ভোগবিলাসী বললে অত্যুক্তি হয় না।

শৈশব থেকে প্রাপ্ত বয়স অবধি এক এক সময়ে এক একটি যৌনকেন্দ্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

১। জন্মথেকে প্রায় ১$\frac{১}{২}$ বছর অবধি : মুখ।

২। ১$\frac{১}{২}$ বছর থেকে প্রায় ৪ বছর অবধি : পায়ু।

৩। ৪ বছর থেকে প্রায় ৬/৭ বছর অবধি : যৌনাঙ্গ।

৪। ৬/৭ বছর থেকে প্রায় ১০/১২ বছর অবধি : যৌন অবচেতনতা।

৫। ১০/১২ বছর থেকে শুরু হয় স্বাভাবিক যৌনতা, যৌবন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে।

এই কালগুলো বেশ কিছুটা কম বেশী হতে পারে। তবে সাধারণভাবে কালগুলোকে আমরা এইভাবে ভাগ করে থাকি। যা হোক, জন্মের পর শিশুর যৌনকেন্দ্র হ'ল মুখ। মুখ দিয়ে শিশু যত সুখ উপভোগ করে, দেহের অন্য কোন অংশ দিয়ে তেমন সুখ উপভোগ করে না। স্তন্য পান করার সময় শুধুমাত্র এই সুখ উপভোগ করে না, যে কোন জিনিস পেলেই শিশু প্রথমেই মুখে নেয় সুখ উপভোগের জন্য। বস্তুর সংস্পর্শে তার মুখ এলেই সে একপ্রকার সুখ পায়, তাই সমস্ত বস্তুই সে মুখে দিতে চায়। স্বাভাবিক যৌনাবস্থা ফিরে এলেও অনেকখানি যৌনতা মুখে তখনও থেকে যায়। চুম্বন ইত্যাদি থেকে যেটুকু সুখ মানুষ লাভ করে তা' এই প্রথম স্তরের যৌনতারই রেশ মাত্র। ফ্রয়েড এই স্তরের নাম দিয়েছেন মুখস্তর বা oral stage। এর পর পায়ু প্রধান যৌনকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। শিশু মল ত্যাগের মধ্যে একপ্রকার আনন্দ লাভ করে। মলত্যাগ করা তার কাছে এক প্রকারের খেলা হিসেবে দাঁড়ায়। অনেক সময় সে ইচ্ছা করে মলত্যাগ না করে ধরে রাখে। এটাও সুখের জন্যেই। আবার অনেক সময় ক্ষণে ক্ষণে মলত্যাগ করে, এ-ও মলদ্বারে সুখ অনুভবের জন্য। ফ্রয়েড এই স্তরের নাম দিয়েছেন পায়ু-স্তর বা anal stage। পরবর্তী স্তরের নাম উপাঙ্গ-স্তর বা phallic stage। এ সময়ে যৌন চেতনা যৌনাঙ্গে থাকলেও একে স্বাভাবিক যৌনতা বলা যায় না। কারণ স্বাভাবিক যৌনতার মধ্যে অর্থাৎ পরিপূর্ণ যৌনতার মধ্যে সহগামী অন্যান্য যে সব লক্ষণ উপস্থিত থাকে এখানে তার কিছুই দেখা যায় না। স্বভাবিক যৌনতায় বা পরিণত

যৌনতায় যেমন বিপরীত লিঙ্গের দেহের অন্যান্য অংশও আকর্ষণ করে, এখানে তেমন আকর্ষণ করে না। এইসময়েই ইডিপাস্ এষণা (Oedipus complex) ঘটে থাকে। যৌন আকর্ষণের জন্য মা ছেলের প্রথম প্রিয়তমা হ'ন আর তেমনি ভাবে মেয়ের কাছে বাবা হ'ন প্রথম প্রিয়তম। যাকে ফ্রয়েড বলেছেন যৌনতা তাকে আমরা সাধারণতঃ যৌনতা বলতে যা বুঝি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে দারুণ ভুল করা হবে। ফ্রয়েডের যৌনতার পরিধি অনেক বিস্তৃত।

এর পর বালক-বালিকার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। এত দিন যারা যৌন সম্ভোগের বিভিন্ন পথ খুঁজে বেড়াত, তারা যৌনচেতনাকে একেবারে না হলেও অন্ততঃ কিছুটা ভুলে থাকে। উপাঙ্গ-স্তরের কোন প্রকার প্রকাশ এখানে থাকে না। কিন্তু তাই বলে যৌন চেতনা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। এটা একটা মধ্যস্তর বা, বলা যেতে পারে, যৌন চেতনার বিবর্ত্তনের পথে একটা বিশ্রামাগার মাত্র। যৌন চেতনা এখানে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাই ফ্রয়েড এ-স্তরের নাম দিয়েছেন যৌন-অবচেতন স্তর বা latency period। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এতদিন শিশু তার নিজের দেহের বিভিন্ন অংশ উদ্দীপিত করে যৌনসুখ পেত। কিন্তু যৌন অবচেতন স্তরের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শিশু আর নিজের দেহের বিভিন্ন অংশ উদ্দীপিত করে যৌনসুখ পেতে চায় না। যৌন অবচেতন স্তরে একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করা যায়—এই সময় বালিকারা বালিকাদের দলেই খেলতে ভালবাসে আর বালকরাও বালকদের দলেই বেশী থাকতে চায়। যৌন অবচেতন স্তরের পর স্বাভাবিক যৌনতা শুরু হ'লে শিশুর সেই আত্মজ যৌনসুখ আর থাকে না, যুবক যুবতী তখন বিপরীত লিঙ্গে যৌন সুখ খুজে বেড়ায়। সুতরাং যৌন অবচেতনস্তরকে স্বাভাবিক যৌনস্তরে বিপরীত লিঙ্গে আকৃষ্ট হবার আগে ক্ষণকালের জন্য বিপরীত মুখী আকর্ষণ বলা যেতে পারে। যা'হোক যৌন অবচেতনস্তর শেষ হয়ে যাবার পর শুরু হয় স্বাভাবিক যৌনতা। মেয়েদের বেলায় রজঃস্রাব শুরু হবার কিছু আগেই এই স্তরের শুরু। এই সময় মেয়েদের দেহে অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন স্তনের বিকাশ, যৌনাঙ্গের চারিধারে লোমের আবির্ভাব, নিতম্বের প্রসারতা ইত্যাদি। ছেলেদের মধ্যে যৌবন আরম্ভের লক্ষণ হ'ল মুখে ও শরীরের বিভিন্নস্থানে লোমের আবির্ভাব কন্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন, ইত্যাদি। স্বাভাবিক যৌনস্তর হলেই আরম্ভ হয় বিপরীত লিঙ্গে যৌন আকর্ষণ।

(৪) নির্জ্ঞান মনঃ—ফ্রয়েডের আরও একটি বড় অবদান হ'ল নির্জ্ঞান মনের ধারণা। আমাদের মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে—চেতন (Conscious), অবচেতন (Pre-conscious) এবং নির্জ্ঞান (Unconscious)। চেতন অংশ আমাদের মনের ক্ষুদ্রতম অংশ। ধরা যাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটি লোক কথাবার্ত্তা বলছে। এখানে একে অন্যের কথাবার্ত্তা সম্বন্ধেই শুধুমাত্র চেতন, একথা আমরা বলতে পারি না। কারণ কথাবার্ত্তা শুনতে শুনতেই একে অন্যের চোখমুখ, পোশাক, হাবভাব, ইত্যাদি অবশ্য লক্ষ্য করছে। তবে কি আমরা বলব যে প্রত্যেকে একই সঙ্গে কথাবার্ত্তা, হাবভাব, পোশাক, ইত্যাদি সবকিছুর সম্বন্ধে সচেতন? আসলে তা'নয়। কারণ চেতনাকে ভাগ করা যায় না—চেতনা এক এবং পূর্ণ। তাই যখন লোকটি অপরের কথার দিকে তার চেতনমনকে তুলে ধরছে তখন অন্য কোনকিছু, যেমন পোশাক, হাবভাব, ইত্যাদি সম্বন্ধে সে চেতন নয়। আসলে ব্যাপারটি হল এই যে একজন হয়তো অপরের কথাবার্ত্তার দিকে কিছুক্ষণ চেতনমন নিবন্ধ রেখেই ঠিক পরক্ষণেই পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে। আবার হয়তো তার ঠিক পরক্ষণেই কথাবার্ত্তার দিকে চেতনমনকে ফিরিয়ে নিচ্ছে। এবং এটা এত তাড়াতাড়ি ঘটছে যে আগে শোনা কথাবার্ত্তা ও পরে শোনা কথাবার্ত্তার মধ্যে যোগসূত্র রাখতে কোনরূপ অসুবিধা হচ্ছে না। চেতনাকে খুব অল্প সময়ের জন্যই একবস্তুর ওপর নিবন্ধ রাখা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আমরা চেতনাকে এক দেড় মিনিটের বেশী একই জিনিসের ওপর সমানভাবে ধরে রাখতে পারি না। আর সাধারণতঃ আমরা চেতনাকে একই জিনিষের ওপর ৪/৫ সেকেন্ডের বেশী ধরে রাখতে পারি না।

অবচেতন মন বা Preconscious হ'ল মনের দ্বিতীয়স্তর। অবচেতন মন পূর্বে চেতন ছিল, এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। চেতনমন বা Conscious-এর পরিধি থেকে এর পরিধি অনেক বড়। যেসব জিনিস আগে চেতন মনে ছিল, এখন নাই, অথচ যেগুলো একটু চেষ্টা করলেই আবার চেতনমনে আনা যায়, সেসব জিনিস অবচেতন মনে আছে। অবচেতনমনের জিনিসগুলোকে চেতনমনে আনাকেই আমরা স্মৃতি (memory) বলি। কিন্তু অবচেতনমনের সবজিনিসই যে অতি সহজে চেতন মনে আনা যাবে তা' ঠিক নয়। অনেক সময় একাজটি সহজ হ'তে পারে।

যেমন একটি লোক আগের দিন সে কি কি কাজ করেছে তা' হয়তো সহজেই মনে করতে পারে। কিন্তু যদি কখনো কখনো অবচেতন মন থেকে অনেক সময় একটি জিনিস আমরা কোথায় রেখেছি অথবা নবপরিচিত ভদ্রলোকটির কি নাম ইত্যাদি তা' অবচেতনমন থেকে আমরা সহজে চেতনমনে আনতে পারি না।

নির্জ্ঞানমন বা Unconcious মনের প্রশস্ততম প্রকোষ্ঠ। আমাদের মনের যেসব জিনিষ বিস্মৃতিরর অতলতলে ডুবে গেছে বলে মনে করি, সেগুলো আসলে এই নির্জ্ঞান মনে থাকে। মনে যে জিনিস একদা ছিল তা' কোনদিনই একেবারে চলেযেতে পারে না। এ-গুলো নির্জ্ঞান মনে থাকে এবং এ-গুলোর খোঁজ আমরা আর রাখিনা বলেই আমরা মনে করি যে এ-গুলো আমাদের মন থেকে একেবারে চলে গেছে। নির্জ্ঞানমনের অস্তিত্ব অনেকভাবে প্রমাণ করা যায়। আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি যুক্তি বুঝতে চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ; আমরা যেসব জিনিস একেবারে ভুলে গেছি বলে মনে করি, সম্মোহনের মধ্যে অভিভাবন (suggestion) দিলে সেসব জিনিস আমাদের মনে আবার আসতে পারে। এ-সব জিনিস অবচেতন মনে ছিল না, কেননা তা'হলে আমরা চেষ্টা করলে অবশ্যই একবার না হয় একবার মনে করতে পারতাম। এ-গুলো ছিল নির্জ্ঞানমনে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কোনকাজ অনেকসময় অভ্যাসগত হয়ে পড়ে। প্রথমে হয়তো এই কাজগুলো আমরা আমাদের চেতনমন দিয়ে অর্থাৎ সচেতন অবস্থায় শিখেছি, কিন্তু যখন ঐ কাজটি আমাদের অভ্যাসে পরিণত হ'ল তখন কিন্তু আমাদের চেতনমন অন্য কোথায় নিবদ্ধ করেও আমরা অনায়াসেই কাজটি করতে পারি। এটা এই জন্যই সম্ভব যে কাজটি পরবর্ত্তী কালে করার সময় চেতমমন অন্য কোথায়ও থাকলেও অচেতনমন ঐ কাজটিকে চালনা করছে।

তৃতীয়তঃ, আমরা অনেক সময় হয়তো 'ক'-এর কথা ভাবতে ভাবতে দেখতে পাই যে 'গ'-এর কথা মনে এল। আসলে হয়তো 'ক'-এবং 'গ'-এর মধ্যে 'খ' ছিল যোগসূত্র। অর্থাৎ সচেতনভাবে সম্পূর্ণ ভাবনাটি হলে এমন হ'ত ঃ 'ক'-এর কথায় 'খ'-এর কথা মনে আসত ; এবং 'খ'-এর কথায় 'গ'-এর কথা মনে হ'ত। কিন্তু আমরা 'খ'-এর কথা না ভেবেই সোজাসুজি 'ক'-

থেকে 'গ'-এ উপনীত হ'লাম। এটাও সম্ভব হ'ল এইজন্য যে আমরা নির্জ্জান-মনে 'ক' এবং 'গ'-এর মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে 'খ'-এর কথা ভেবেছি।

চতুর্থতঃ, এমন অনেক সময় হয় যে আমরা কোন সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি এবং যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন হয়তো দেখলাম যে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নির্জ্জানমনে আমরা সমস্যাটির সমাধানের কথা নিশ্চয় ভেবেছি, না হলে এমন হ'তে পারতো না।

পঞ্চমতঃ, স্বপ্নচারিগণ (somnambulists) অর্থাৎ যারা ঘুমের ঘোরে কাজকর্ম করে তারা ঘুমের মধ্যেও যুক্তিসম্মত কাজ করে থাকে। এরূপ স্বপ্নচারিতায় চেতন এবং অবচেতনমন নিশ্চয় কাজ করে না। সুতরাং এ-অবস্থায় কাজগুলো নিশ্চয় নির্জ্জান মনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, আমরা আমাদের বন্ধুকে দূরে আবছামত দেখলেও হঠাৎ ঠিক তাকে চিনতে পারি। আমাদের বন্ধুর কি কি বিশেষ চিহ্ন দেখে তাকে চিনতে পারলাম তা' হয়তো বলতে পারব না। এর কারণ এই যে আমাদের চেতনমনে হয়তো আমরা এসব ভাবি নাই। কিন্তু নির্জ্জানমনে নিশ্চয় ভেবেছি, তা না হলে বন্ধুকে চিনতে পারতাম না।

সপ্তমতঃ, যখন কেউ বাদ্যযন্ত্রে ঐক্যতান শোনে তখন সে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলো পরস্পর কেমন সংগতি রাখছে তা' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভেবে দেখে না, অথচ ঐক্যতানটি তার ভাল লাগে। আবার কোথায়ও তাল কেটে গেলে সে ঠিক বুঝতে পারে। এটা সম্ভব এইজন্য যে চেতনমনে সে ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলোর পারস্পরিক সংগতির কথা না ভাবলেও তার নির্জ্জান মন নিশ্চয় সেদিকে খেয়াল রেখেছিল।

অষ্টমতঃ, সহজাত প্রবৃত্তিগুলো নির্জ্জানমনের সাহায্যেই কাজ করে থাকে। মৌমাছির মৌচাক গড়া, বাবুই পাখীর বাসা বাঁধা—এ-সবই প্রবৃত্তি-গত এবং এ-সব কাজ করতে চেতনমনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এ-গুলোর মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধিমত্তা আছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এ-বুদ্ধি সচেতনমনের নয়, অচেতন মনের পরিচালনাধীন।

নবমতঃ, আমরা জানি যে আমাদের চোখের পর্দ্দায় (retina) কোন বস্তুর ছবি থেকেই আমরা সে বস্তুকে চিনতে পারি। কিন্তু কোন বস্তুর অনুপাতে আমাদের চোখের পর্দ্দায় তার ছবি অনেক ক্ষুদ্র হয়। এই

ক্ষুদ্র ছবি থেকে চেতনমনের যুক্তি দিয়ে আসলে বস্তুটি কত বড় সেকথা আমরা ভাবিনা। ঐ ক্ষুদ্র ছবি থেকে সহজেই আসল বস্তুটির পরিমাণ সঠিকভাবে ধরে নিতে পারি। নির্জ্জান মনের দ্বারাই এটা আমরা করে থাকি। (Chrichton Miller, H: Psychoanalysis and Its Derivatives)।

ফ্রয়েড কিন্তু এতসব যুক্তি থেকে নির্জ্জানমনের সন্ধান পান নি। তিনি নির্জ্জান মনের সন্ধান পেয়েছেন প্যারাপ্রাক্সিস (parapraxis) বা আমাদের লিখতে, পড়তে, বলতে নানারকম ভুল থাকে। তিনি বেশ ভালভাবে প্রমাণ করেছেন সে আমরা একরকম ভাবি, কিন্তু নির্জ্ঞানমনে ভাবি অন্যরকম। চেতনমন যেমন তার ইচ্ছা সফল হোক তাই চায়, নির্জ্জানমনও তেমনি তার ইচ্ছা সফল হোক তাই চায়। তাই কখন কখন অচেতনমনের ইচ্ছাই বড় হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা তারই কথামত কাজ করি। আর চেতনমনে আমরা যা' করতে চেয়েছিলাম তার সঙ্গে এই কাজের মিল নাই বলেই এটাকে আমরা 'ভুল' বলে থাকি। আসলে 'ভুল' এবং 'নির্ভুল' উভয়ই আমাদের মনের ইচ্ছা। কেউ হয়তো বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে ভুলে আসবার সময় বন্ধুর বাড়ীতে ছাতা ফেলে এসেছে। ফ্রয়েডের মতে এর অর্থ হ'ল এই যে বন্ধুর বাড়ী থেকে ঐ লোকটির চলে আসার ইচ্ছা ছিল না, অথবা বন্ধুর সঙ্গে কোন কথা বলার বাকী ছিল, ইত্যাদি। পরে 'মনের গঠন' অধ্যায়ে আমরা নির্জ্জান মন সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা করব। কি করে ফ্রয়েড নির্জ্জান মনের সন্ধান পেলেন প্যারাপ্র্যাকসিস্ থেকে তাকে জানতে পারব। স্বপ্নরহস্য উদ্ঘাটন করার সময়ে তিনি নির্জ্জানমন সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হ'ন।

কেউ কেউ 'নির্জ্জানমন' এই নামকরণে আপত্তি তুলেছেন। তাঁদের মতে যে মন চেতন নয় তার কোন ক্রিয়া থাকতে পারে না। অথচ ফ্রয়েডের মতে নির্জ্জানমনের ক্রিয়া আছে। ফ্রয়েডের মতে নির্জ্জানমন নিষ্ক্রিয় অর্থে অচেতন নয়। এটাকে নির্জ্জান বলা হয় এইজন্য যে এটা অবচেতন মন থেকে অধিকতর অচেতন। 'নির্জ্জানমন' বলায় কা'রো আপত্তি থাকলে সেটা ভাষাগত আপত্তি মাত্র। কিন্তু এ-থেকে এ-কথা বলা যায় না যে 'নির্জ্জানমন' বলতে ফ্রয়েড যে জিনিসটি বোঝাতে চেয়েছেন তেমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই।

মন বলে আমাদের দেহ ভিন্ন আলাদা কোন জিনিসের অস্তিত্ব আছে কিনা অথবা আমাদের দেহের বিশেষ কতকগুলো ক্রিয়াকে একত্রে আমরা মন বলি কিনা এ নিয়ে বহুকাল ধরে দার্শনিকদের মধ্যে বিবাদ হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। শুধু দার্শনিকরা নন, শরীরবিদরাও এখনো মনের সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারেন নি। William James তাঁর The Principles of Psychology গ্রন্থে মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা' এই যে আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্য. এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অনেকগুলি উপায় থেকে একটি উপায় বেছে হল নেয়া মানসিক ক্রিয়ার লক্ষণ। চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদি হলো মনের বিভিন্ন বৃত্তি।

মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন দার্শনিক তর্কবিতর্কে ফ্রয়েড যোগ দেন নি। কোনরূপ তর্কবিতর্কে না গিয়েও সাধারণ ভাবে আমরা বেশ বুঝতে পারি মন কি। চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিগুলো আলাদা আলাদা হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্র না থাকলে একটি মানসিক বৃত্তি অন্য একটি মানসিক বৃত্তিকে প্রভাবিত করতে পারত না। মানসিক বৃত্তিগুলোর একটি অপর একটিকে অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের স্মৃতি অনেক সময় আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে থাকে অথবা আমাদের অনুভূতি আমাদের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে থাকে। এইভাবে প্রতিটি মানসিক বৃত্তি অপর মানসিক বৃত্তিগুলোকে সদাসর্বদা প্রভাবিত করছে। এই মানসিক বৃত্তিগুলোর মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র না থাকলে একটি বৃত্তি অপর বৃত্তিগুলোকে প্রভাবিত করতে পারত না। এই মানসিক বৃত্তিগুলোকে একত্রে আমরা মন বলতে পারি। অর্থাৎ বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিগুলোকে আমরা একই মনের বিভিন্ন প্রকাশ বলতে পারি।

ফ্রয়েড মনের উদ্দেশ্যগুলোর উৎসকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন—অদস্ (Id), অহং (Ego) এবং অধিশাস্তা (Super-ego)। আসলে অহং এবং অধিশাস্তা অদস্-স্তর থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে। বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা

পরিচালিত হয়ে পরবর্তী কালে অদস্-এর কিছু অংশই অহং এবং অধিশাস্তাতে পরিণত হয়। ফ্রয়েড বলেছেন ঃ 'অহং শেষ পর্যন্ত অদসেরই একটি অংশ ; বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিবন্ধকের মুখে অদসের এক উদ্দেশ্য-মূলক পরিণত অংশ।'

জি. গ্রডেক-এর প্রস্তাব অনুযায়ী ফ্রয়েড দার্শনিক নীৎসে-এর কাছ থেকে এই 'অদস' শব্দটি ধার করেছেন। অদস্ হল আমাদের ব্যক্তিত্বের বা আমরা বলতে পারি আমাদের মনের সবচেয়ে নিগূঢ়তম স্তর। স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং মানসিক রোগের কারণ খুঁজতে গিয়েই তিনি এই অদস্-এর সন্ধান পান। অদস্-কে আমাদের দেহ থেকে আলাদা করা যায় না। অর্থাৎ দেহের ইচ্ছা, ক্ষুধা ইত্যাদিই অদস্-এর ইচ্ছা এবং ক্ষুধা। আমরা যাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলি সেগুলোও এই অদ্স-এর মধ্যেই অবস্থিত। অদস্-এর মধ্যে যা আছে তাকে আমরা নঞ অর্থে প্রকাশ করতে পারি। অহং যা নয় অদস্ তাই-ই। অদস্-এর মধ্যে যুক্তি বলে কোন জিনিষ নাই এবং পরস্পর বিরোধিতা বলেও কোন জিনিষ নাই। পরস্পরবিরোধী দুটো জিনিস পাশা-পাশি থাকতে পারে অদস্-এর মধ্যে। অনেক সময় পরস্পরবিরোধী দুটো জিনিস যখন নিজেদের প্রকাশ করতে চায় তখন উভয়েই একটা মীমাংসার চেষ্টা করে। আমাদের সচেতন মনে স্থান এবং কাল এই দুটি ধারণার ভূমিকা আছে। দার্শনিক কাণ্ট-এর মতে বহির্জগত থেকে আমরা যে বিক্ষিপ্ত অনুভূতি পেয়ে থাকি সেগুলোকে আমাদের মনের স্থান এবং কালের ধারণা দিয়ে সুসংবন্ধ করে থাকি ; যাকে বলা হয় জ্ঞান। কিন্তু অদস্-এর মধ্যে স্থান এবং কাল বলে কোন জিনিস নাই। কোন অনুভূতি একবার অদস্-এর মধ্যে প্রবেশ করলে সেখানে, যতদিন অদ্স থাকবে ততদিন, অবস্থিত থাকবে এবং সে অনুভূতি একযুগ আগে ঘটে থাকলেও অদস্-এর কাছে মনে হবে যে সেটা এই একটুক্ষণ আগে ঘটেছে। সে অনুভূতি যদি কখনো চেতন মনে এসে পড়ে তখনি শুধুমাত্র বোঝা যাবে যে সেই অনুভূতি অনেকদিন আগের।

অদস্-এর মধ্যে মূল্যবোধ বা ভালমন্দ বলে কোন জিনিস নাই। অদস্ নীতি বোঝে না। অদস্-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সুখভোগ। এই সুখ-নীতির (Pleasure principle) দ্বারা অদস্-এর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরি-চালিত হয়। এই সুখের কেন্দ্র হল দেহ। তবে কাল্পনিকভাবে দেহাতিরিক্ত জিনিসেও অদস্ সুখ পেতে পারে। যেমন স্বপ্নে অদস্ কাল্পনিকভাবে সুখ

উপলব্ধি করে থাকে। অদস্‌-এর আরও একটি নীতি হ'ল মিতব্যয়িতা। কম শক্তি খরচ করে বেশী সুখ পাওয়াই তার নীতি। এই নীতির জন্যই আমাদের কোন কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়। স্বপ্নের মধ্যেও অদস্‌ এই নীতি অনুসরণ করে চলে। চেতন মন যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন এই অদস্‌ কাল্পনিকভাবে তার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চায়। কিন্তু তার এই ইচ্ছাপূরণ অহং-এর ইচ্ছার পরিপন্থীও হতে পারে এবং যদি পরিপন্থী হয়, তবে অহং আঘাত পাবে, শঙ্কিত হয়ে উঠবে; কারণ অহং বাস্তবতাকে (reality) মেনে চলে, আর অদস্‌ বাস্তবতার ধার ধারে না। কিন্তু বাস্তবতার পরিপন্থী কোন কাজ করলে, অহং তথা সমস্ত ব্যক্তিত্বের বিপর্য্যয় হতে পারে। তাই ঘুমের ঘোরে অদস্‌-এর অহং-অসমর্থিত কোন ইচ্ছা চরিতার্থ করতে দেখলে অহং সুপ্তোত্থিত হতে পারে (কারণ নিদ্রিতাবস্থায় অহং স্বপ্নকেও বাস্তবতা বলে ভুল করে। কেননা এ অবস্থায় সে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে) বলে, অদস্‌ তার মিতব্যয়িতা নীতি অনুসারে অহংকে ফাঁকি দেবার জন্য বিভিন্ন মুখোশ পরিধান করে। 'স্বপ্নতত্ত্ব' অধ্যায়ে আমরা এ জিনিসটিকে আরও ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করব।

আগেই দেখেছি অহং-এর উৎপত্তি অদস্‌ থেকেই। অহং তার শক্তি অদস্‌ থেকেই ধার করে থাকে। অদস্‌ যেমন সুখভোগনীতি মেনে চলে অর্থাৎ সুখভোগই এর একমাত্র উদ্দেশ্য তেমনি অহং বাস্তবতাকে মেনে চলে। অদস্‌-এর শক্তিকে ফ্রয়েড কামপ্রেরণা বা Libido বলেছেন। অদস্‌ তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য তার কামপ্রেরণার দ্বারা বহির্জগতের বস্তুকে আকর্ষণ করে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় Object-cathexis বা বিষয়াকর্ষণ। কিন্তু তার সুখ উপভোগ করবার জন্য অদস্‌ যখন বিষয়াকর্ষণ করে থাকে তখন সে বাস্তবতার ধার ধারে না। বাস্তবতা থাকা বা না থাকা বলতে এখানে বুঝতে হবে যে, যে বস্তুতে অদস্‌ বিষয়াকর্ষণ করেছে সেটা পাওয়া সম্ভব কি না। বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকলেই সে বস্তু লাভ করা সবসময় সম্ভব নয়। আবার হয়ত যে বস্তু পাওয়া সম্ভব সে বস্তুর প্রতি অদস্‌ আকর্ষণ নাও দেখাতে পারে। তাছাড়া সামাজিক এবং নৈতিক অনেক বাধা থাকতে পারে। অদস্‌ অন্ধ, সে তার ঈপ্সিত বস্তুই শুধু চায়, নিরপেক্ষ বাস্তবতাকে সে বোঝে না। অদস্‌-এর শুধুমাত্র প্রবৃত্তিগত তাগিদেই এই বিষয়াকর্ষণ হয়ে থাকে। অহং-এর প্রথম

কাজ হলো এই তাগিদ এবং বিষয়াকর্ষণকে বোঝা। Ego-কে তখনই সফল বলা যাবে যখন নাকি সে অদস্-এর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারে। একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হতে পারে। কোন জুলিয়েটকে দেখে হয়তো কোন রোমিওর যৌন আকর্ষণ অনুভব হ'ল। এই যৌন আকর্ষণ নিছক প্রবৃত্তিগত, অর্থাৎ ফ্রয়েডের ভাষায় বলতে পারি, রোমিওর অদস্ জুলিয়েটের মধ্যে বিষয়তা খুঁজে পেল। অদস্ অন্ধ, সে না বোঝে বাস্তবতা, না বোঝে নৈতিকতা। এবং এক্ষেত্রে জুলিয়েটকে অধিকার করাই রোমিওর একমাত্র উদ্দেশ্য, তা' সে যেমন করেই হোক। কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে, নানারকম সামাজিক বাধানিষেধ তাকে মানতে হয়। শুধু তাই নয়, জুলিয়েটের অদস্ এর রোমিওর প্রতি অনুরূপ বিষয়াকর্ষণ নাও থাকতে পারে। অদস্ শুধু জুলিয়েটকে কামনা করেই ক্ষান্ত : কি করে তাকে পাওয়া যেতে পারে, সামাজিক এবং অন্যান্য বাধানিষেধ ডিঙ্গিয়ে কি করে জুলিয়েটকে লাভ করা যেতে পারে সে ভাবনা এবং সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ অহং-এর উপর ন্যস্ত। অহং হয়তো এক্ষেত্রে সব দিক বাঁচিয়ে ঠিক করল একমাত্র প্রেম নিবেদন করেই জুলিয়েটকে লাভ করা (অধিকার করা) সম্ভব এবং তাই পূর্বরাগ-মধ্যরাগ ইত্যাদি বিভিন্ন সনাতন প্রেমলীলার ক্রম উত্তীর্ণ হয়ে জুলিয়েটকে তার অদস্-এর যৌন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বলা যেতে পারে ধরে এনে দিল তার অদস্-এর কাছে।

কিন্তু এতসব কৌশল করে অদস্-এর উদ্দেশ্য সফল করবার ফন্দি বের করতে যে শক্তির প্রয়োজন অহং তা পাবে কোথেকে ? অহং-এর নিজস্ব কোন শক্তি নাই। আগেই দেখেছি অহং অদস্-এর থেকেই এই শক্তি ধার করে। অহং, এবং অদস্-এর এই সম্পর্ককে ফ্রয়েড অশ্ব এবং অশ্বারোহীর সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অশ্বারোহীর চলৎশক্তি এখানে অশ্বই জোগায়, কিন্তু যাত্রাপথের নির্দেশ দেয় অশ্বারোহী। অশ্বারোহী যেমন শুধু অশ্বের উদ্দেশ্য সফলের (হতে পারে, আহার, পানীয় ইত্যাদি) জন্যই যাত্রাপথের নির্দেশ দেয় না, অনেক সময় তার নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য (যেমন সৈন্য পরিচালনা করার জন্য) অশ্বের চলৎশক্তিকে কাজে লাগায়, তেমনি অনেক সময় অহং তার নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্যও অদস্-এর শক্তিকে কাজে ব্যবহার করে থাকে।

অবদমন ও প্রতিবন্ধক (Repression-resistance) পদ্ধতিতে

অদস্ থেকে অহং-এর জন্ম হয়। মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রে, বিশেষ করে ফ্রয়েডের মতবাদে 'অবদমন' কথাটির বিশেষ অর্থ আছে। 'অবদমনের' অর্থ পৃথকীকরণ নয়। সুখভোগ-নীতি এবং বাস্তবতা-নীতি এ দুটির মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব থেকেই অবদমনের জন্ম। আবেগ বা ইচ্ছা যদি বাস্তবতা বা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির পরিপন্থী হয় তাহলে ঐ আবেগ বা ইচ্ছা এবং তৎসঙ্গে সহগামী অন্যান্য স্মৃতি এবং এই সংঘাতজনিত অনুভূতি আমরা বল- পূর্বক অবদমিত করে থাকি এবং অবদমিত করে চেতনস্তর থেকে নির্জ্ঞানস্তরে এই বেদনাদায়ক জিনিসগুলোকে ঠেলে দেই। অবদমিত হলেও এগুলো নির্জ্ঞানস্তরে গিয়ে একেবারে মুছে যায় না। নির্জ্ঞান-এ এগুলো জীবন্দশা পর্যন্ত থেকে যায় এবং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমাদের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। নির্জ্ঞান-এ অবস্থিত এইসব অবদমিত আবেগ বা ইচ্ছা দ্বারা আমাদের ক্রিয়া প্রভাবিত হলে তাকে স্বাভাবিক ক্রিয়া বলা চলে না। এই সব ক্রিয়া-কলাকেই আমরা বায়ুরোগের লক্ষণাবলি বলে থাকি। আর আমাদের ঘুমের মধ্যে এইসব অবদমিত আবেগ বা ইচ্ছা মুখোশ পরে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করলে সেগুলোকে আমরা স্বপ্ন বলে থাকি।

'প্রতিবন্ধক' শব্দটি 'অবদমন' শব্দটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। নির্জ্ঞানে অবদমিত করা হয়েছে এমন জিনিস অনেক সময় আপনা থেকেই বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কারণ এসব অবদমিত ইচ্ছা অদস্-এর ইচ্ছা। এগুলো অবদমিত হলেও অদস্ এগুলোকে পুনরায় চেতনস্তরে পাঠাতে চায় সজ্ঞানে এ-সব ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য। নিরবচ্ছিন্নভাবে অদস্ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জাগ্রতস্তর সদা সচেতন। সে যখনই অদসের এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করবে তখনই পুনরায় সেসব বাইরে আসা অবদমিত ইচ্ছাগুলোকে নির্জ্ঞানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঠেলে দেবে। অবদমিত ইচ্ছাগুলোর নির্জ্ঞান থেকে বাইরে এসে চেতন স্তরে আসার পথে অহং-এর এই প্রকার বাধা সৃষ্টি করাকেই প্রতিবন্ধক বলা হয়।

বহির্জগতের সংস্পর্শে এলেই কেবল অদস্ তার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ বাস্তবতা তার ইচ্ছার সবটাই এবং সবসময় চরিতার্থ করতে দেয় না। বহির্জগত বা বাস্তবতার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলেই অদস্ থেকে অহং বেরিয়ে আসে। তখন অদস্ বেশ বুঝতে পারে যে তার যা

ইচ্ছা তাই-ই করা চলবেনা, তার অনেক ইচ্ছাকে অবদমিত করতে হবে। আর তা' না হ'লে বাস্তবতা তাকে শাস্তি দেবে, ভয় জাগাবে। জন্মের পর শিশুর মধ্যে শুধু অদস্ থাকে। সে তার নিজের দেহ এবং আশেপাশের জিনিসপত্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ লক্ষ্য করে না। মা বা ধাইমার স্তন এবং তার নিজের হাতের মধ্যে সে কোন তফাৎ দেখতে পায় না। সে ভাবে উভয়ই তার নিজের, কারণ তার হাত সে তখন ইচ্ছানুযায়ী চালনা করে না, সে তখন জানে না কিভাবে তার হাত পা ইত্যাদি চালিত হচ্ছে। একটু বড় হলে শিশু লক্ষ্য করে যে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদলেই সঙ্গে সঙ্গে স্তন্য পাওয়া যায় না। এবং এই সময় থেকেই সে তার নিজের থেকে অন্যান্য জিনিসের (যেমন আসবাবপত্র, পরিচারিকা ইত্যাদি) তফাৎ বুঝতে পারে। নিজেকে এভাবে আলাদা করে ভাবতে আরম্ভ করা থেকেই জন্ম নেয় অহং। সে তখন দু'রকম বিষয়ের ভেদ দেখতে পায় —সে নিজে এবং বহির্জগত বা বাস্তবতা।

বহির্জগতের সঙ্গে সংঘাতে এসে অহং আবার আর একটি জিনিস গঠন করে। এটাকে ফ্রয়েড বলেছেন অধিশাস্তা Super ego আমরা যাকে সাধারণতঃ নৈতিকতা বলে থাকি। তার অন্ধশক্তির সঙ্গে এই অধিশাস্তার কোন পার্থক্য নাই। এটাও বহির্জগতেরই একটা অংশ, কিন্তু তবুও বহির্জগত থেকে এটাকে ফ্রয়েড আলাদা করে দেখেছেন। অধিশাস্তা অহং-এর কাজের সমালোচনা করে এবং অহং-এর কাজ মনঃপূত না হলে তার মধ্যে অপরাধ-বোধ বা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। অহং যখন অদসের প্রাগৈতিহাসিক বা নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে চায় তখনই অধিশাস্তা তার মধ্যে এই সব অনুভূতির সৃষ্টি করে থাকে। অধিশাস্তাকে একরকমের বিবেক বলা যেতে পারে। অধিশাস্তা নির্জ্ঞান স্তরেই থাকে বেশীর ভাগ। মা-বাবার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক থেকেই শিশুর মধ্যে অধিশাস্তার আবির্ভাব হয়ে থাকে। কাজেই অধিশাস্তাও অহং-এর মতই অভিজ্ঞতালব্ধ। অধিশাস্তাকে অহং-এর সঙ্গে এক করে দেখলে ভুল করা হবে। কারণে অহং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বিচক্ষণতা আর অধিশাস্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বিবেক। আবার অহং-এর জন্ম হয় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা, আর অধিশাস্তার আবির্ভাব হয় বাবা-মা ইত্যাদি যখন সমাজকতৃক গৃহীত কতকগুলো রীতিনীতি শিশুকে শেখায়।

অহং-এর কাজ অদস্ বা অধিশাস্তার কাজের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। অহংকে তিন মনিবের কাজ করতে হয়—বহির্জগত বা বাস্তবতা, অদস্ এবং

অধিশাস্তা এই তিন মনিবকে একই সঙ্গে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন। তাছাড়া অদস্ এবং অধিশাস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাই বাধ্য হয়ে অহংকে অনেক সময় বিচক্ষণ কূটনীতিবিদদের মত অসৎপথ অবলম্বন করতে হয়। তাকে অদস্-এর অবচেতন ইচ্ছাগুলোকে তার সচেতন যুক্তিবাদ দিয়ে ঢাকতে হয় এবং এইভাবে সে অদস্-এর অগ্রহণযোগ্য ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবতার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে পরিবেশিত করে। একটি দৃষ্টান্ত নিলে বিষয়টি স্বচ্ছ হতে পারে। ঈডিপাশ এষণা (মায়ের প্রতি ছেলের যৌন আকর্ষণ) সম্বন্ধে আমরা অনেকেই শুনেছি। অদস্, অহং-এর কাছে এ দাবী তুলতে পারে। কিন্তু অধিশাস্তার সমর্থন এক্ষেত্রে কিছুতেই থাকতে পারে না। এমন জটিল অবস্থায় অহং (অর্থৎ ব্যক্তিটি) হয়তো এমন মেয়েকে বিয়ে করল যার মধ্যে সে তার মায়ের প্রতিচ্ছবি অংশত খুঁজে পেল।

অহং এর কাজ এমন জটিল বলেই আমরা বলে থাকি 'জীবন বড় কঠিন'। অহং কখনো যদি বাধ্য হয়ে এই তিন মনিবের কাছে তার দুর্বলতা প্রকাশ করে থাকে তবে তাকে বিভিন্নরকমের উৎকণ্ঠার যন্ত্রণাভোগ করতে হবে। অহং এবং মনিবের সম্পর্ক অদ্ভুত রকমের। অহং-এর কাছে দুটি পথ খোলা আছে—হয় সে মনিবের নির্দেশমত কাজ করবে অথবা মনিবের কথায় বিন্দু-মাত্র কর্ণপাত করবে না। এই দুপ্রকার ব্যবহারে অহং-এর জয়। মনিবের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করাকে ফ্রয়েড সাফল্যজনক অবদমন বলেছেন। কিন্তু এই দুই পন্থার একটিতেও অহং সফল না হলে মনিবের কাছে তার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। মনিব তাকে তখন ভয় দেখায়, চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে বলে, 'আমার ইচ্ছা পূরণ করতে হবেই।' অহং তাই ভয় পায় এবং উদ্বেগ অনুভব করে। বহির্জগত তাকে ভয় দেখালে তাকে বলি বাস্তব উৎকণ্ঠা। অধিশাস্তা ভয় দেখালে তাকে বলি নৈতিক উৎকণ্ঠা এবং অদস্ তাকে ভয় দেখালে তাকে বলি স্নায়বিক উৎকণ্ঠা।

ফ্রয়েড সম্মত প্রত্যক্ষচেতনা অবচেতন এবং নির্জ্ঞান এই তিনটি মনের স্তরের সঙ্গে আমরা 'উপক্রমণিকা'তে পরিচিত হয়েছি। এখন অদস্, অহং এবং অধিশাস্তার সঙ্গে চেতন, অবচেতন এবং নির্জ্ঞান-এর কি সম্পর্ক তা দেখব। কিন্তু তার আগে ফ্রয়েড নির্জ্ঞানের সন্ধান কি করে পেলেন তা একটু ভাল করে দেখা যাক। প্রধানতঃ আমাদের বিভিন্ন রকম ভ্রান্তি থেকেই তিনি এই নির্জ্ঞানের সন্ধান পান। পরে স্বপ্নের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি তাঁর নির্জ্ঞান-

এর ধারণার আরও সমর্থন পান। স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনার সময় আমরা নির্জ্ঞানকে আরও ভালভাবে জানতে পারব। এখানে শুধু বিভিন্ন ভ্রান্তির মধ্যে নির্জ্ঞানের অস্তিত্বের যুক্তি খুঁজে দেখব।

আমরা বিভিন্ন প্রকার ভুল করে থাকি, যেমন 'বলার ভুল'; 'লেখার ভুল', 'পড়ার ভুল', কোন জিনিস ভুলে যাই আর মনে করতে পারি না ইত্যাদি। কিন্তু কেন এমন ভুল হয়? অনেকে বলে থাকেন যে এসব ভুলের শারীরতাত্ত্বিক যুক্তি আছে। আমরা যদি ক্লান্ত থাকি অথবা উত্তেজিত থাকি অথবা অন্য কোন জিনিস দ্বারা মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে তবেই আমাদের ভুল হয়। এ সব কারণে যে ভুল হতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু সমস্ত ভুলকেই এভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ক্লান্তি না থাকলেও অথবা উত্তেজিত না হলেও অথবা অন্য কোন জিনিস দ্বারা বিভ্রান্ত না হলেও মানুষ ভুল করে। মনোযোগের অভাব থাকলে ভুল হতে পারে এটাও সবসময় ঠিক নয় বরং মনোযোগ থাকলেই অনেক সময় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। পটু পিয়ানোবাদক মনোযোগ ব্যতিরেকেই ভাল বাজিয়ে যেতে পারে এবং মনোযোগ দিয়ে বাজাতে গেলেই তার ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। আবার মনোযোগ ছাড়াই আমরা সঠিক পথ ধরে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারি। বক্তৃতার সময় শব্দগুলো পরপর আসতে থাকে, কোনরূপ মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং শুধু শারীরতাত্ত্বিক কারণেই আমরা ভুল করি, এটা ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, শারীরতাত্ত্বিক কারণে যদি আমরা ভুল করে থাকি তবে প্রশ্ন ওঠে একটি বিশেষ শব্দ বলতে গিয়ে ভুল করে হাজার রকম শব্দ উচ্চারণ করতে পারতাম, কিন্তু তা না করে সেগুলো থেকে বাছাই করে একটি বিশেষ ভুল শব্দ উচ্চারণ করলাম কেন? কেউ বলতে পারেন, এটা 'অনিশ্চয়তা' দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু কতকগুলো ভুল বিশ্লেষণ করলে আমাদের কোন সন্দেহই থাকে না যে আমাদের ভুলের পেছনে নির্জ্ঞান মনের কোন কোন ইচ্ছা নিশ্চয় আছে। তাই কয়েকটি ভুলের বিশ্লেষণ করা যাক। উদাহরণগুলো সবই ফ্রয়েডের 'A General Introduction to Psychoanlysis' থেকে নেয়া। তাঁর 'Psychopathology of Everyday Life'-এ ভুলের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

মেরিঙ্গার (Meringer) এবং মেয়ার (Mayer)-এর বই থেকে ফ্রয়েড অনেক ভুলের দৃষ্টান্ত নিয়েছেন। মেরিঙ্গার ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ

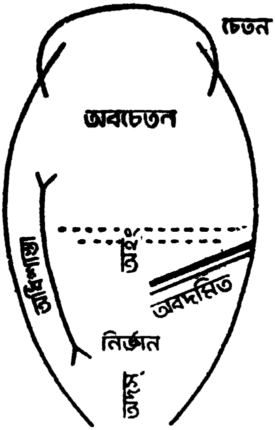
আর মেয়ার সাইকিয়াট্রিস্ট। একবার এক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক খবরের কাগজে ছাপা হল: "Among those present was his Highness, the clown Prince" পরের দিন ভুল সংশোধন করা হ'ল "clown Prince" ভাঁড় রাজপুত্র নয় "crown Prince" যুব-রাজ। রাজকুমারের প্রতি ঐ খবরের কাগজের বিরূপ মনোভাব ছিল বলেই এমন ভুল হয়েছিল। নির্জ্ঞান মনে ভাঁড় Prince-ই বলার ইচ্ছা ছিল, তাই এমন হয়েছিল। একবার এক যুদ্ধের বর্ণনায় এক জেনারেল সম্পর্কে লেখা হয়েছিল: "This battle-scared veteran". পরে ভুল সংশোধন করা হল "battle-scared" নয় "bottle-scared"। যারা বার্নার্ড শ-র 'সিজার ও ক্লিওপেট্রা' নাটক পড়েছেন তারা দেখে থাকবেন শেষ দৃশ্যে সিজার যখন প্রস্থান করেন সেখানে তার কি যেন বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। শেষকালে তিনি ঘুরে এসে ক্লিওপেট্রার কাছে বিদায় নিলেন। এইভাবে শ' সিজারের মধ্যে প্রাধান্য (superiority আরোপ করেছেন, যেটা নাকি সিজারের মধ্যে আদৌ ছিল না।

লিক্টেনবার্গ (Lichtenberg) সম্পর্কে গ্যাঠে বলেছেন, "তাঁর প্রত্যেকটি ঠাট্টার মধ্যে একটি সমস্যা লুকিয়ে আছে।" আর কখনো কখনো সমাস্যার সমাধান তার ঠাট্টার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। তাঁর 'Notes'-এ লিকটেনবার্গ লিখেছেন: "তিনি সবসময়ই angenommen পড়তে গিয়ে Agamemnon পড়েন, তিনি হোমার সম্পর্কে এতবড় পণ্ডিত ছিলেন।"

কেন ভুল হয়? আমরা কেন ভুল বলি? ফ্রয়েড বলেন আমাদের মনে যদি এমন কতকগুলো ধারণা থাকে যেগুলোকে আমরা কথায় প্রকাশ করতে চাই না, তাহলে সেইসব ধারণাগুলো যেসব কথা আমরা বলতে যাই সেগুলোকে পরিবর্ত্তিত করে দেয় অথবা যে কথা বলি সে কথার সঙ্গে ঐসব ধারণার বাহক কোন শব্দ জুড়ে দেয় অথবা যে কথা বলতে চাই তার সবটাই ছুঁড়ে ফেলে নিয়ে ঐসব ধারণার বাহক কথাগুলো নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। পূর্বে আমরা কোন কথা অবশ্য বলব না বলে জোর করে অবদমিত করেছিলাম। তা না হ'লে আমরা ভুল বলতাম না। যে কাজে আমরা ভুল করি তার পেছনে অবশ্যই দুটি ভিন্ন অর্থ এবং উদ্দেশ্য থাকবে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে চেষ্টা করবে। ভুলের মধ্যে আছে এই দুই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের মীমাংসার চেষ্টা। উভয় উদ্দেশ্যই অংশতঃ

সফল এবং অংশতঃ ব্যর্থ হয়। এই দুই প্রকার উদ্দেশ্যের একটি হ'ল সচেতন মনের আর অপরটি হ'ল নির্জ্ঞান মনের। এই ভাবে ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনের সন্ধান পান।

ফ্রয়েড তাঁর New Introductory Lectures on Psycho-analysis বই-এ অদস্-অহম-অধিশাস্তা চেতন অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনের (Ucs) মধ্যে সম্পর্ক যেভাবে দেখিয়েছেন তা' নিম্নরূপ ঃ

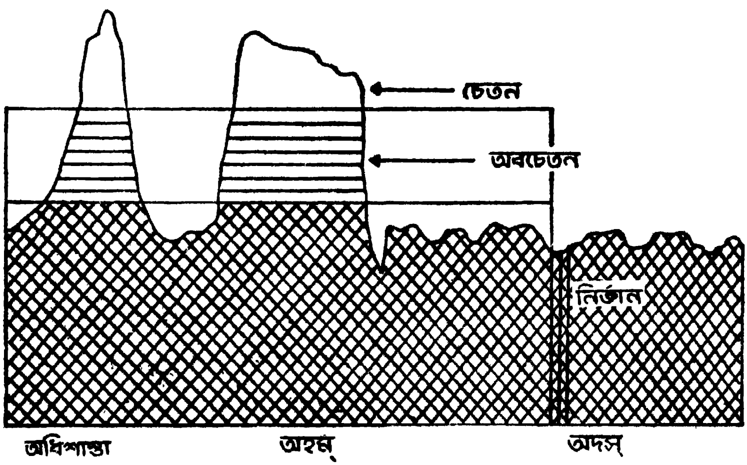


১নং নকশা

মন এমন জিনিস নয় যা'কে ছবি এঁকে বোঝানো যায়। তবে মন সম্পর্কে কতকগুলো ধারণার মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে ছবি এঁকে বোঝালে সুবিধা হতে পারে। এই ভেবেই সম্ভবতঃ ফ্রয়েড এই নকশা এঁকেছিলেন। এই অঙ্কন কতদূর সঠিক সে সম্পর্কে ফ্রয়েড নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন। তার কারণ মনকে রেখিত করে কতকগুলো কোঠায় ভাগ করা যায় না। যা'হোক. এই রেখা-চিত্র থেকে বোঝা যাবে যে অধিশাস্তা অহং-এর চেয়েও চেতন থেকে দূরে থাকে এবং এটা নির্জ্ঞান পর্য্যন্ত তলিয়ে আছে। ঈডিপাস্ এষণা মায়ের প্রতি ছেলের যৌন আকর্ষণ থেকেই শুরু হয় অধিশাস্তা। যখন শিশুর বল্গাহীন যৌনতাকে মা-বাবা বাধা দিতে আরম্ভ করেন তখন থেকেই অধিশাস্তার আবির্ভাব হয়। তাই অধিশাস্তা নির্জ্ঞান পর্য্যন্ত তলিয়ে আছে। অদসের পুরোটাই নির্জ্ঞানে, বহির্জগতের সঙ্গে অদস্ শুধুমাত্র অহং-এর মাধ্যমেই সংযোগ

রাখতে পারে। চেতন অথবা অবচেতনের আয়তন থেকে অনেক অনেক বেশী আয়তন হ'ল নির্জ্ঞানের। অবদমিত যা কিছু তাই-ই নির্জ্ঞানে চলে যায়। অহং-এর কিছুটা নির্জ্ঞানে এবং বাকীটুকু অবচেতনে। নির্জ্ঞান এবং অবচেতনের মধ্যে কোন কঠিন বাধা নাই, নির্জ্ঞানের-এর কোন কোন জিনিস অনেক সময় অবচেতনে এসে যেতে পারে।

এইচ্. সি. মিলার তাঁর Psychoanalysis and Its Derivatives গ্রন্থে অদস্, অহম্, অধিশাস্তা এবং চেতন, অবচেতন, নির্জ্ঞান-এর সম্পর্ক দেখাতে অন্য রকম রেখাচিত্র এঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। ফ্রয়েডের রেখাচিত্রের পাশাপাশি তাঁর নকশা রাখলে বিষয়টি আরও বোধগম্য হতে পারে বলে মিলার-এর নকশাও নীচে দেওয়া হ'ল। মিলার অদস্ অহম্ অধিশাস্তাকে পাহাড়ের তিনটি চূড়া ভাবতে বলেছেন। সূর্য্যের আলোতে অধিশাস্তা এবং অহং-এর সুউচ্চ চূড়াদ্বয় সবচেয়ে বেশী আলোকিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশ অপেক্ষাকৃত কম আলোকিত। সর্বনিম্ন অংশে সূর্যালোক আদৌ পেঁৗছে না। অদস্ নামক চূড়া খুবই নীচু বলে সেখানে সূর্য্যালোক একেবারেই পেঁৗছে না। চিত্রটি নিম্নরূপ :



২নং নকশা

ফ্রয়েডের নকশা থেকে মিলারের নকশা অনেক সহজ এবং স্পষ্ট। ২নং নকশা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অধিশাস্তা, অহম্ এবং অদস্-এর প্রত্যেকেরই ভিত্তি হল নির্জ্ঞান। নির্জ্ঞানের ওপর ফ্রয়েড যথেষ্ট গুরুত্ব

আরোপ করেছেন। মিলারের মতে ফ্রয়েড যে সব কারণে নির্জ্ঞানের এর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন সেগুলো হ'ল ঃ

(১) চেতন মনে অবস্থিত জিনিসের চেয়ে নির্জ্ঞানে অবস্থিত জিনিসের পরিমাণ এবং সংখ্যা ঢের বেশী।

(২) চেতন এবং নির্জ্ঞানের উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।

(৩) কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে যদি বলা হয় যে সম্মোহন শেষ হয়ে গেলেও স্বাভাবিক অবস্থাতেও সে বিশেষ একটি কাজ করবে, তাহলে দেখা যায় যে স্বভাবিক অবস্থাতেও সে ব্যক্তি ঠিক ঠিক সেই বিশেষ কাজটি করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ বিশেষ কাজটি করার জন্য লোকটিকে পুনরায় আদেশ দেবার প্রয়োজন হয় না। নির্জ্ঞান না থাকলে এটা সম্ভব হতে পারতো না। ঐ বিশেষ কাজটি করার কথা তার চেতনে না থাকলেও নির্জ্ঞানে-এ ছিল।

(৪) অনেকসময় দেখা যায় আমাদের সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই হয়তো কোন ধারণা অথবা স্মৃতি আমাদের মনে এসে হাজির হ'ল অথবা দেখা গেল কোন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল কোন প্রকার প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই। চেতনে না হলেও নির্জ্ঞানে আমরা নিশ্চয় সেই সমস্যার কথা ভাবছিলাম। ধারণা অথবা স্মৃতিও নির্জ্ঞানে ছিল এবং নির্জ্ঞানের বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের জন্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে এইসব ধারণা বা স্মৃতি চেতনে এসে হাজির হয়েছে।

(৫) নির্জ্ঞানকে না মেনে নিলে স্বপ্ন-ব্যাখ্যাই সম্ভব হ'ত না।

(৬) আমাদের বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা করতেও নির্জ্ঞানকে মেনে নিতে হবে। এ বিষয় আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

(৭) নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করে যে চিকিৎসা পদ্ধতি ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন তার সাফল্যও নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

মিলার ফ্রয়েডের নির্জ্ঞাণের ৮-টি বৈশিষ্ট্য বর্ণণা করেছেন। এগুলো হ'ল ঃ

(১) এটা সম্পূর্ণ অনৈতিক জিনিস এবং সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক।

(২) এর কোনরূপ কালজ্ঞান নাই। আগেই দেখেছি ঘটনা পরম্পরা এর মধ্যে নাই। এর কাছে সবই একই সময়ের এবং সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।

(৩) এটা সুখভোগনীতি দ্বারা পরিচালিত। সুখভোগই এর এক-মাত্র উদ্দেশ্য।

(৪) একটি ধারণা থেকে অন্য একটি ধারনায় এর শক্তি অনায়াসে পরি-চালিত হতে পারে।

(৫) নির্জ্ঞানের কোন কিছুই ভাষায় প্রকাশিত নয়। ভাষায় প্রকাশিত না হলে এর কোন কিছুই এমনকি অবচেতনেও পেঁছুতে পারে না।

(৬) এর কোন ইচ্ছা অহং অথবা বহির্জগত দ্বারা নিষেধিত হলে কিছু যায় আসে না। নির্জ্ঞান আবার তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

(৭) এর কোন যুক্তিবোধ নাই।

(৮) এটা শিশুসুলভ এবং বেশীর ভাগই যৌনকেন্দ্রিক।

প্রথমদিকে ফ্রয়েড ভেবেছিলেন যে নির্জ্ঞানের বিষয়াবলী আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তিনি স্বীকার করেছেন যে এর মধ্যে জন্মের পূর্বের বিষয়াবলীও (যেমন জাতিগত উপাদানও) থাকতে পারে। অবদমিত অদসের ইচ্ছাগুলোও এই নির্জ্ঞানে অবস্থান করে। নির্জ্ঞানের এই জাতিগত বিষয়গুলোর পরিমাণ ব্যক্তির অবদমিত অভিজ্ঞতাগুলোর চেয়ে ঢের বেশী।

ফ্রয়েড অদস্-এর যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন মিলার তার একটি তালিকা রচনা করেছেন ঃ

(১) অদস্ নির্জ্ঞান।

(২) এটা অনৈতিক।

(৩) সুখভোগনীতির দ্বারা পরিচালিত।

(৪) যুক্তিতে বিশ্বাসী নয়।

(৫) সমস্ত অবদমিত ধারণাগুলো এতে থাকে।

(৬) জাতিগত বিবর্ত্তনের সমস্ত সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা এতে সঞ্চিত থাকে।

(৭) যৌনপ্রবৃত্তির সমস্ত শক্তি এতে জমা আছে।

(৮) জীবনমুখী এবং মৃত্যুমুখী সমস্ত প্রবৃত্তিগুলো এর মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

(৯) সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোর উৎস এ।

(১০) প্রাগৈতিহাসিক অভ্যাস গঠনে এ-সাহায্য করে থাকে।

অদস্ এবং নির্জ্ঞানের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল থাকলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ-দুটি কখনই এক জিনিস নয়। নির্জ্ঞানের কিছু অংশে অহম্ এবং অধিশাস্তা আছে। অহম্কে একদিক দিকে অদসের বিপরীতধর্মী বলা যেতে পারে, যদিও অদ্স থেকেই অহমের উৎপত্তি। শৈশব এবং বাল্যে অদস্ যখন অবচেতনের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে তখন মনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়ে তার কিছু অংশ থেকে অহম্ সৃষ্টি করে। অহমের বৈশিষ্ট্যগুলো এই ঃ

(১) এর বেশীর ভাগই সচেতন।

(২) যুক্তি সম্মত।

(৩) জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বহির্জগত এর কর্মস্থল।

(৪) বেশীর ভাগই স্বায়ত্বশাসিত ; কখনো কখনো অধিশাস্তা এর ওপর রাজত্ব করে থাকে।

(৫) তিন রকম শক্তির মধ্যে একে মধ্যস্থতা করতে হয়—অদশ্, অধিশাস্তা এবং বহির্জগত।

(৬) নৈতিক নির্দেশগুলো অহম্ মেনে চলতে চায়।

(৭) স্থান এবং কাল একমাত্র অহম্ বুঝতে পারে।

(৮) এর সমস্ত চিন্তা ভাষায় প্রকাশিত, কিন্তু সে ভাষা কথিত অথবা অকথিত হতে পারে।

(৯) আমাদের ঘুমের মধ্যে এ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন অদস্ যাতে তার খেয়াল-খুশীমত তার ইচ্ছা চরিতার্থ (কাল্পনিকভাবেও, যেমন স্বপ্নে) করতে না পারে তার জন্য প্রহরী (সেনসর) রেখে দেয়।

মিলার অধিশাস্তার বৈশিষ্ট্য গুলোর-ও একটি তালিকা তৈরী করেছেন ঃ

(১) অহম্ থেকে এর উৎপত্তি।

(২) কিন্তু তথাপি অহমের সমালোচনা করে থাকে এবং সময় সময় তাকে পরিচালনাও করে।

(৩) অহম সাধারণতঃ এখানে আসতে পারে না।

(৪) এর খুব কম অংশই চেতনে আছে।

(৫) অদস্-এর বিপরীতধর্মী হলেও তার সঙ্গে এর সংযোগ আছে।

(৬) জাতিগত এবং জাতির বিবর্ত্তনগত বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গেও এর নিবিড় সম্পর্ক আছে।

(৭) ঈডিপাস এষণা এবং জীবনের গোড়ার দিকের আবেগপূর্ণ ক্রিয়া ও তৎসহ সেগুলোর প্রতিক্রিয়ারাজিও অধিশাস্তার মধ্যে থাকে।

(৮) অধিশাস্তার জন্যই অহং নীতিবিগর্হিত কাজ করলে নিজেকে অপরাধী অনুভব করে।

(৯) আমাদের বিবেককেই অনেকে অধিশাস্তা বলে থাকেন। কিন্তু অধিশাস্তা বিবেক থেকেও বেশী নীতিবান। এ নৈতিকতা আবেগ ও অন্ধ।

সবশেষে, আমাদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে মন এমন জিনিস নয় যাকে ছুরি দিয়ে আপেল কাটার মত ভাগ করা যায়। চেতন, অবচেতন এবং নির্জ্ঞান এমন তিনটে প্রকোষ্ঠ নয় যাদের মধ্যে যাতায়াত নাই। তেমনি অহম্, অদস্ এবং অধিশাস্তা এমন নয় যে একের সঙ্গে অপরের কোন সম্পর্ক নাই। আঁক কষে মনকে এমন বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে মন একক, একই মনের বিভিন্ন দিকগুলো বোঝাবার জন্যই কেবলমাত্র বিভিন্ন দিকগুলোকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং আঁক কষে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

জন্মের পর থেকে ক্রমে ক্রমে কি করে শিশু পূর্ণ ব্যক্তিত্ব (personality)-সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে ফ্রয়েডের নিজস্ব এক মতবাদ আছে। মনোবিজ্ঞানে আমরা সাধারণতঃ জানি যে জন্মগত গুণাবলি[1] এবং পরিবেশ এই দুটির সংঘাতে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু এ দুটির মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশী অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব গঠনে কোনটির অবদান বেশী—এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। যা'হোক, ব্যক্তিত্বের প্রচয়[2] সম্পর্কে যতগুলো মতবাদ আছে সে গুলো থেকে ফ্রয়েড, এ্যাডলার, প্রমুখ কতিপয় মনস্তাত্ত্বিকদের মতবাদের পার্থক্য এই যে এঁদের মতে ব্যক্তিত্ব খুব অল্প বয়সেই পূর্ণ প্রকাশ পায়। ফ্রয়েড যেমন বলেছেন যে ৫ বছরেই আমাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রচয় হয়ে যায়। পরবর্তীকালে আমাদের ব্যক্তিত্বের যে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায় সেগুলো আসলে মৌল কোন পরিবর্তন নয়। ৫ বছরের শিশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এবং ঐ শিশু যখন ৫০ বছরের প্রৌঢ় হবে তখন তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে মৌল কোন পার্থক্য নাই। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিত্ব স্থবির। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীলতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না, কারণ একবার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রচয় হয়ে গেলে তার মধ্যে আর পরিবর্তন আসে না ; ৫ বছর বয়েস থেকে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

বংশগত যে জিনিসটির সঙ্গে পরিবেশের সংঘাতের ফলে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রচয় হয়ে থাকে ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন কামপ্রবৃত্তি বা লিবিডো। তিনি সকলপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একপ্রকার শক্তি আছে বলে মনে করতেন। এই শক্তিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—একদিকে এই শক্তি আমাদের আত্মরক্ষা এবং প্রজজন করছে, অন্যদিকে এই শক্তি যে অচৈতন্য জগৎ থেকে সৃষ্ট হয়েছি সেই অচৈতন্য জগতে আমাদের ধ্বংসের মাধ্যমে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রক্রিয়াকে প্রগতিপন্থী এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়াকে

1. Endowments
2, Development

প্রগতিবিরোধী বলা যেত পারে। প্রগতিপন্থী প্রক্রিয়ার শক্তিকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন কামশক্তি। কামকে ফ্রয়েড এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : 'Love.' যেসব সহজাত প্রবৃত্তিকে আমরা সাধারণভাবে 'ভালবাসা'র প্রবৃত্তি বলতে পারি সেসব প্রবৃত্তির একত্রিত শক্তিকেই কাম বলা যায়।[3] সুতরাং ফ্রয়েডের ভাষায় কাম বলতে শুধু যৌন-ক্ষুধা বোঝায় না। অবশ্য যৌন-ক্ষুধা থেকে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, বাবা-মায়ের প্রতি ভালবাসা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, বন্ধুত্ব অথবা মানব সমাজের প্রতি ভালবাসা, এমন কি জড় পদার্থ এবং কাল্পনিক ধারণাকেও আলাদা করা যায় না। ফ্রয়েডের মতে এ-সবকিছুর অন্তরালেই ঐ একই কাম নিহিত আছে। পরিবেশের দ্বারা মার্জিত বা পরিবর্তিত হয়ে এগুলো এখন এমন হয়ে গেছে যে এ-গুলোর মধ্যে সাধারণতঃ আমরা কামের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করি না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এ-সবকিছুর মধ্যে আমরা সাধারণতঃ কাম অর্থে যা বুঝে থাকি অর্থাৎ যৌন-ক্ষুধা, তা' নিহিত আছে—একথা ফ্রয়েড কখনোই বলেন নাই।[4]

ফ্রয়েড-এর এই কাম সম্পর্কে মতবাদ মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল আলোড়নসৃষ্টি করেছে। তাঁর এই সর্ব-কাম-বাদের জন্যই তাঁর শিষ্য এ্যাড্‌লার এবং ইয়ুং তাঁর থেকে সরে পড়েন। ইয়ুং-এর মতে libido হল ব্যক্তির সকল প্রকার প্রচেষ্টার মূল শক্তি, শুধু যৌন আকাঙ্খার নয়। ইয়ুং-এর এই মতবাদের সঙ্গে দার্শনিক বার্গস-এর প্রাণশক্তিবাদ এবং ম্যাক্‌ডুগাল-এর সজীবতাবাদ-এর মিল আছে। এ্যাড্‌লার (Adler), কারেন হোরনে (Karen Horney), এরিক ফ্রোম্ (Eric Fromm), সুলিভান (Sullivan), ওটো র‍্যাংক (Otto Rank) এবং বিনস্‌ওয়াংগারের (Binswanger) মত অস্তিত্ববাদী মনঃসমীক্ষকগণ ফ্রয়েডের কামবাদের দারুণভাবে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এ্যাড্‌লারের মতে শিশুর হীন-মন্যতার (inferiority feeling) মধ্যে তার বিশেষ এবং অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে সে নিজেকে হীন মনে করে—কায়িকশক্তি, বুদ্ধি, ইত্যাদি দিক দিয়ে এবং এই হীনমন্যতা দূর করার জন্য তার উত্তরকালের সকল রকম প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্ব গড়ে

3. The energy of those instincts which have to do with all that may be comprised under the word Love.

4. J.A.C. Brown—Freud and the Post Freudians, P—22.

ওঠে। কারেন হোরনে বলেন যে শিশু পরিবার পরিজন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলেও নিজেকে খুব অসহায় ভাবে। হোরনে একে 'মৌল-উৎকণ্ঠা' আখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তি কালে শিশু তাই ভালবাসা, স্বাধীনতা অথবা ক্ষমতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাতে করে সে এগুলোর দ্বারা তার 'মৌল-উৎকণ্ঠা' দূর করতে পারে। ওটো র‍্যাঙ্কের মতে জন্মের সময় শিশু হঠাৎ এক অতি বিচিত্র জগতে অবতীর্ণ হয়, যেখানে সবকিছুই বলতে গেলে একেবারে অচেনা। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই তার 'মৌল-উৎকণ্ঠা'[5] হয়ে থাকে। সুলিভানও ব্যক্তিত্ব গঠনে কামের ওপর অতটা গুরুত্ব আরোপ করেন নি। সামাজিক সম্পর্ক থেকেই তাঁর মতে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। অন্যদিকে বিন্স-ওয়াংগার হলেন অস্তিত্ববাদী[6] মনঃ সমীক্ষক। হাইডেগার (Heideggar), হুসের্ল (Husserl) প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিক এবং বার্গস ও মিন্কা-উস্কি দ্বারা তিনি প্রভূত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর মতে জাগতিক-শূন্যতা[7] এবং ব্যক্তিগত একাকিত্বই আমাদের উদ্বেগের কারণ। আমরা বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই উদ্বেগ দূর করতে অথবা ভুলে থাকতে চাই। ব্যক্তিত্ব গঠনেও তাই এগুলোই মূল নির্দ্ধারক।

সুতরাং বোঝা গেল যে ফ্রয়েডের কামবাদ এঁদের কেউই পুরোপুরি স্বীকার করেন নি। অপরদিকে কামবাদকে হাজার হাজার মনোবিজ্ঞানী সাদরে গ্রহণ করেছেন। শিল্প, সাহিত্য, ইত্যাদিতেও কামবাদ এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। যাঁরা কামবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি-গুলোর মধ্যে যৌন আকাঙ্খাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এবং যৌন-আকাঙ্খার সঙ্গে ফ্রয়েডের কামবাদ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব এবং তাঁর মনঃবিশ্লেষণের সার্থকতা তাঁর কামবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ফ্রয়েডের কামবাদকে সহজে উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাদের ভুললে চলবে না যে মানুষের আদি বংশধরেরা পশু ছিল। আমরা যাকে মানবিক গুণ বা আধ্যাত্মিক গুণ বলি সে সবই মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোর বেদীর ওপর ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। এবং সেজন্য পাশবিক বা জৈবিক

5. Basic anxiety
6. Existentialist
7. Nothingness

গুণাবলি এগুলোর মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে দৃশ্যতঃ বা অদৃশ্যতঃ বর্তমান থাকবে, এতে আর অবাক হবার কি আছে? ফ্রয়েড, উচ্চাঙ্গ প্রবৃত্তি-গুলোর জৈবিক উৎস আছে এ-কথা বলে উচ্চাঙ্গ প্রবৃত্তিগুলোর অবমূল্যায়ন করেন নি। নিরপরাধ, নিষ্পাপ শিশুকে তিনি পরিপূর্ণ কামের আধার বলেছেন ঠিকই, কিন্তু এই সত্য উদ্ঘাটনের ফলে শিশুর অবমূল্যায়ন নিশ্চয় করা হয় নি। ক্রাইকটনমিলার তাঁর 'Phychoanalyysis গ্রন্থে ঠিকই বলেছেন: পঙ্কে জন্মালেও পঙ্কজ কুসুমের মূল্য কিছু কম নয়।

ক্রাইকটনমিলার ফ্রয়েডের মতানুসারে কামের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন:

(১) কাম ব্যক্তির মধ্যে সর্বদাই বর্তমান। শিশুর মধ্যেও কাম পূর্ণ-ভাবে বিরাজমান। আমরা যাকে যৌন-আকাঙ্খা বলি তা' কামের একটা অংশমাত্র।

(২) বিভিন্ন বয়েসে এবং বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় কামের তীব্রতার তারতম্য হতে পারে।

(৩) শরীরের বিভিন্ন স্থানের মাধ্যমে কামকে উত্তেজিত করা যেতে পারে। যে সব স্থানের মাধ্যমে কামকে উত্তেজিত করা যায় সেগুলোকে কামুত্তেজক স্থান বলা হয়। এই স্থানগুলো আহার, মলমূত্র ত্যাগ এবং প্রজজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিশুর বিভিন্ন বয়সে স্বাভাবিক ভাবেই এই স্থানগুলোর পরিবর্তন হয়ে থাকে। শেষে এই স্থানগুলোর একটিতে কাম স্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধ হয়। এই পদ্ধতিকে প্রদেশীকরন বলা হয়। ৫ বছর বয়সেই এই প্রদেশীকরন শেষ হয়ে যায়।

(৪) কাম সম্পূর্ণ স্বার্থপর এবং শারীরিক সুখের ওপর নির্ভর করে।

(৫) বাস্তবতা বা বহির্জগত যদি কামের প্রকাশকে বাধা দেয় তা'হলে ব্যক্তি কল্প-সৃষ্টির[৮] স্মরনাপন্ন হয়। কল্পণায় সে কামের তুষ্টি সাধন করে।

(৬) অহং যদি বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কামকে প্রকাশিত হতে না দেয় তা'হ'লে অহং কামকে নির্জ্ঞানমনে অবদমিত করে পাঠিয়ে দেয়। কাম তখন নির্জ্ঞান মনে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু সেখান থেকেও সে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হতে চেষ্টা করে, ফলে বায়ুরোগ দেখা দিতে পারে।[৯]

8. Phantasy
9. Neurosis

তাহলে প্রশ্ন জাগে, আমাদের স্বাভাবিক জীবন কোনটি ? ফ্রয়েড বলেছেন যে অদস্-এর প্রকাশিত হবার প্রচেষ্টা এবং অধিশাস্তা ও বাস্তবতার কাছে অহং-এর আত্মসমর্পন, এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্যই স্বভাবিক লক্ষণ।

এখন জন্মের পর থেকে বিভিন্ন বয়েসের স্তরে কাম কোন্ কোন্ স্থানে থাকে তা' এবং তার বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলো অনুধাবন করা যাক। জন্মের সময় শিশুর কামের বিশেষ কোন স্থান থাকে না। মিলার বলেন : জন্মের সময় শিশুর সর্বশরীরে কাম ছড়িয়ে থাকে। অল্প পরেই প্রথম কামুদ্দীপক কেন্দ্র গড়ে ওঠে তার অধর-ওষ্ঠে। স্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে শিশু তার কামের তুষ্টি উপভোগ করে ; শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সে স্তন্য পান করে না। তাই আমরা দেখতে পাই যে সে হাতের কাছে যা কিছু পায় তাই-ই প্রথমে মুখে দিতে চায়। তখন অধরোষ্ঠই একমাত্র কামুদ্দীপক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। ৬ মাসের মধ্যেই শিশু এই কামুদ্দীপক কেন্দ্র ত্যাগ করে এবং অন্য কামুদ্দীপক কেন্দ্র গ্রহণ করে। এটাই স্বাভাবিক। কেন একটি কামুদ্দীপক কেন্দ্র ত্যাগ করে অন্য কামুদ্দীপক কেন্দ্র শিশু গ্রহণ করে সে সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। তবে আমরা বলতে পারি যে এটা শারীর-তাত্ত্বিক কারণেই সম্ভবতঃ হয়ে থাকে। কিন্তু একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে একটি কামুদ্দীপক কেন্দ্র ত্যাগ কর অপর একটি কামু-দ্দীপক কেন্দ্র শিশু গ্রহণ করলেও পূর্বের কেন্দ্রটিকে সে একেবারে পরিত্যাগ করে না। অর্থাৎ অধরোষ্ঠরূপ কামুদ্দীপক কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে পায়ুকেন্দ্র গ্রহণ করলেও শিশু তখনও অধরোষ্ঠের দ্বারা কামের কিয়ৎ পরিমাণে তুষ্টি সাধন করতে পারে। এই দুটি কামুদ্দীপক কেন্দ্রের মধ্যে থাকে শুধু তীব্র-তার বা গুরুত্বের তফাৎ। তাই যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি যৌন-আকাঙ্খার জন্য চুম্বন করে তখন তার প্রথম কামুদ্দীপক কেন্দ্রের মাধ্যমেই কিয়ৎ পরিমানে কামের তুষ্টি সাধন করে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পরও যদি প্রথম কামুদ্দীপক কেন্দ্রই তীব্রতম থাকে তাহলে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। সংবন্ধতা[10] এবং পশ্চাদ্গমনের[11] আলোচনার সময় এ-জিনিসটি আরও স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাবে।

যাহোক, পরবর্তী কামুদ্দীপক কেন্দ্র হ'ল পায়ু। শিশু তখন মলত্যাগের

10. Fixation
11- Regression

মাধ্যমে কামের তুষ্টি করে থাকে। মিলার বলেছেন যে, মানবশিশুর যে তার মলের মধ্যে একটা স্পষ্ট ঔৎসুক্য, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। পশুদের মধ্যেও অনুরূপ ঔৎসুক্য বা আনন্দ লক্ষ্য করা যায়। মলত্যাগের সময় শিশু পায়ুতে একপ্রকার দৈহিক সুখ অনুভব করে। এই সুখকে কামতুষ্টি-জনিত সুখ ভিন্ন আর কিছু বলা যেতে পারে না।

অধরোষ্ঠ কামুদ্দীপক স্তরকে মুখকামী স্তর[12] এবং পায়ু কামুদ্দীপক স্তরকে পায়ুকামীস্তর[13] বলা যেতে পারে। মুখকামীস্তরকে ফ্রয়েড দুভাগে ভাগ করেছেন। কোন কোন শিশু এই সময় অবাধে স্তন্য পান করে থাকে। এরা পরবর্তীকালে আশাবাদী হয় এবং চিন্তামুক্ত অবস্থায় জীবন যাপন করে। অপরকে কিছু দে'য়ার চেয়ে অপরের কাছ থেকে গ্রহণে এদের আনন্দ বেশী। আবার যে শিশু এই স্তরে স্তন্য পানে নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হয় তারা উত্তরকালে দুঃখবাদী হয়ে থাকে। তারা অস্থিরচিত্ত হয় এবং অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়। পায়ুকামীস্তরকেও আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে পড়ে সেই সব শিশুরা যারা মলত্যাগেই বেশী আনন্দ পায় আর দ্বিতীয়ভাগে আছে সেই সব শিশুরা যারা মলত্যাগের চেয়ে মল ধরে রাখতেই আনন্দ পায় বেশী। ফ্রয়েডের মতে পায়ুকামীস্তরে কোন কোন শিশুর চরিত্রে তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) শৃঙ্খলা—যথা শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, নির্ভরশীলতা, ছোট ছোট কাজে বিবেচনা, ইত্যাদি।

(২) মিতব্যায়িতা, যা' নাকি গৃধ্নুতাতেও পর্যবসিত হতে পারে।

(৩) একগুয়েমী, যা নাকি ঔদ্ধত্যেও পৌঁছুতে পারে।

এই তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে একই শিশুর মধ্যে থাকতে পারে। সুতরাং এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে থাকতে দেখা যায়। এই স্তরেই মনের অদস্-অহং-অধিশাস্তা গঠন শুরু হয়। অদস্ প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মলত্যাগ করতে চায়, কিন্তু মা (অধিশাস্তা) হয়তো যেখানে সেখানে এবং যখন তখন মলত্যাগ পছন্দ করেন না। এই অবস্থায় অহং অসময়ে এবং যেখানে সেখানে মলত্যাগ না করে মল চেপে রাখে। মাকে খুশী

12. Oral stage

13. Anal stage

করার জন্যই সে মল চেপে রাখে। কিন্তু মল চেপে রাখলেও সে একপ্রকার সুখ অনুভূতি (স্নায়ুগত) পায়ুদেশে অনুভব করে। এটা একপ্রকার অতি সাধারণ বায়ুরোগ বিশেষ। অহং এখানে দেখতে পেল যে সে অধি-শাস্তাকে (এখানে মাকে) খুশী রেখেও সে স্নায়বিক সুখ অনুভব করতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার বিশিষ্ট্য হ'ল এই যে এখানে মা হয়তো শিশুকে মল-ত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু শিশু সহজে মলত্যাগ করছে না। এখানে মলত্যাগ করার জন্য মাকে পীড়াপীড়ি করতে দেখে শিশু তার আত্ম-গরিমা অনুভব করছে এবং একই সঙ্গে চেপে রাখা মল থেকে সে এক প্রকার স্নায়বিক সুখ অনুভব করছে। শিশু এখানে বুঝতে পেরেছে যে তার সহজাত প্রবৃত্তিকে চেপে রেখে বা অবদমিত করে রেখে সে মায়ের ওপর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। কারণ সে মলত্যাগ না করা পর্য্যন্ত মা তাকে পীড়াপীড়ি করবেনই।

তৃতীয় প্রকার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পায়ুস্তরের একগুয়েমীভাব পরবর্তীকালে তিন ভাবে প্রকাশ পেতে পারে—অত্যধিক গর্ব, অধিকার দাবী করা, এবং অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। মলত্যাগে বাধাপ্রাপ্ত হলে শিশু মনে করতে পারে যে সে এক অমূল্য সম্পদের (মল) অধিকারী। তাই সে অহমিকা অনুভব করতে পারে। আবার শিশু ভাবতে পারে যে বড় হলে তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। শিশু মায়ের এই বাধা দেওয়াকে কিছু-তেই সহ্য করতে পারে না। অথবা শিশু ভাবতে পারে যে তাকে যেমন যেখানে সেখানে মলত্যাগ করতে দেওয়া হয় নি, তেমনি সে-ও কাউকে যা খুশী তাই-ই করতে দেবে না। এ-সব জিনিস আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও আমাদের এ-কথা ভুললে চলবে না যে প্রাপ্তবয়স্কদের চিন্তাধারা বা যুক্তি এবং শিশুদের যুক্তি অথবা চিন্তাধারার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তাই শিশুর এই প্রকার যুক্তি আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না। আবার আমাদের শৈশবে-ও যে এ-সব ঘটেছিল এবং আমরাও যে এমন অদ্ভুত চিন্তা করেছিলাম—এ-সব ভাবতে আমাদের অদ্ভুত লাগে। আমরা ভাবি যে আমরা শৈশবে এমনতর কোনদিনই ভাবি নি। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের দ্বারা ফ্রয়েড স্পষ্ট করে ছেন যে প্রত্যেকের শৈশব জীবনেই এমনতর অদ্ভুত যুক্তিধারা ছিল।

বড় হয়ে আমরা সে-সব জিনিসকে আমাদের নির্জ্ঞান মনে পাঠিয়ে দিয়েছি, তাই এসব এখন আমাদের অদ্ভুত লাগে।

আরও একটি বিষয় স্পষ্ট ভাবে বোঝা উচিত, মিতব্যয়িতার সঙ্গে পায়ু-স্তরের কি করে সম্পর্ক থাকতে পারে। মলই শিশুর মতে তার একমাত্র সম্পত্তি। তাই সে পরিণত বয়েসে ধন-দৌলত ইত্যাদির সংগে মলের একটা সম্পর্ক খুঁজে পায়। এটা এক প্রকার বাতুলতা মনে হতে পারে, কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে আমরা কথাবার্তায় মলের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কের কথা ব্যবহার করে থাকি। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা না করে মাত্র কিছু উদা-হরণ নেয়া যাক। ইংরেজীতে (টাকা নিয়ে নোংরামি করা[14]; কর্দমাক্ত লোভনীয় বস্তু[15]; নোংরা জিনিসে গড়াগড়ি যাওয়া[16]; নালায় টাকা ছুঁড়ে ফেলে দে'য়া)[17]; ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[18] আমরা বলে থাকি হাঁসে সোনার ডিম দেয়। এখানে মলের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যেতে পারে। ব্যাবিলনিয়াতে বিশ্বাস ছিল যে সোনা হ'ল নরকের মল। ব্যাবিলনিয়ার ভাষায় অর্থের অধিপতি হ'ল মেমন (Mammon) আর নরকের অধিপতি হ'ল মন্‌মন্ (Manman)। সুতরাং এদুটি শব্দের মধ্যেও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। উপকথায় আমরা জানি যে দৈত্যরা তাদের প্রিয়জনদেরকে অর্থ দিয়ে যায়, কিন্তু পরক্ষনেই অর্থাৎ তার চলে যাবার পরই সে অর্থ মলে পরিণত হয়। মলের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক এখানে সুস্পষ্ট[19]। বাংলা ভাষাতেও অনেক সময় টাকাকে "হাতের ময়লা" বলা হয়।

পায়ুস্তরের পরে আসে উপস্থস্তর[20]। কিন্তু উপস্থস্তর আলোচনা করার আগে আমাদের দুটি জিনিস সংবন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রথমটি হ'ল কামের বিবর্তন। কাম প্রথমে অধর-ওষ্ঠে থাকে, পরে আসে পায়ুতে এবং তারও পরে উপস্থতে। অবশ্য এক স্তর থেকে অন্য স্তরে কাম যায় একথা

14. Stinking with money.
15. Filthy lucre.
16. Rolling in the stuff.
17. Throwing money down the drain.
18. J. A. C. Brown : Freud and the Post-Freudians.
19. Collected Papers of Sigmund Freud, Vol. II : 'Character and Anal Erotism.'
20. Phallic stage.

বলাতে আমরা অবশ্যই বুঝব না যে, যে স্তর থেকে কাম চলে অন্য স্তরে গেল সে স্তরের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সে স্তরের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে গেল মাত্র, তার কাজ একেবারে ফুরিয়ে গেল না—একথা আগে বলা হয়েছে। স্বাভাবিক যৌন-জীবন শুরু হলেও তাই আমরা দেখি যে মুখকামীতার রেশ হিসেবে ব্যক্তি চুম্বন করতে ভালবাসে, সিগারেট খেতে ভালবাসে অথবা বক্তৃতা করতে ভালবাসে। পায়ুকামও কিছুটা থেকে যায়। পায়ুদেশে উত্তেজনা জনিত সুখ তখনও ব্যক্তি উপভোগ করতে পারে। আর উপস্থ-কামের রেশতো থাকেই, কারণ আমরা জানি যে ঈডিপাস এষণার (Oedipus complex) রেশ পরিণত বয়সেও থাকে। কিন্তু একটি স্তর থেকে কাম অন্যস্তরে যায় কেন তা' ফ্রয়েড পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে পারেন নি। শারীরতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে গুরুত্বের দিক থেকে এর তিনটি স্তরকে পর পর এভাবে সাজানো যায়—মুখ, পায়ু এবং উপস্থ। মুখ এবং পায়ু উভয়ই ব্যক্তির নিজের আত্মরক্ষা এবং পরিবর্ধনের সহায়তা করে। যৌবন এলে এদের কাজ গৌণ হয়ে পড়ে। উপস্থের কাজই তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ব্যক্তি তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রকারান্তরে বংশ বৃদ্ধির দিকে ঝোঁকে। মুখ এবং পায়ু এখন উপস্থের কাজের সহায়তা করে এবং তাকে শক্তি যোগান দেয়। এটাই বোধহয় বিবর্তনের অনুশাসন। ক্রাইক্-টনমিলার বলেছেন: যে এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির নানাবিধ সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর চরিতার্থ করার ধারা হ'ল ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যগত কার্য্যকলাপকে তার জাতিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যগত ক্রিয়াকর্ম-দ্বারা ক্রমান্বয়ে অবদমিত করে।[21]

আমাদের দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল এই যে কাম শুধুমাত্র মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই তিনটি কেন্দ্রই থাকে না, বিভিন্ন সময়ে কামের বিভিন্ন দিকেও প্রবাহিত থাকে। যেমন মুখ-কামী স্বকামী (auto-erotic)-ও বটে। অর্থাৎ মুখকামী শিশুর কাম শুধুমাত্র অধর-ওষ্ঠেই থাকে না, শিশু এই সময় স্বকামীও বটে। এখানে স্বকামী বলতে আমরা এই বুঝব যে শিশু প্রেমিকও বটে আবার সে নিজেকেই নিজে ভালবাসে। অদস্-এর তাড়নাতেই শিশু এমন হয়ে থাকে। শিশুর মধ্যে এই সময় অহং জন্মায় না। সুতরাং সে নিজেকে অদস্ থেকে আলাদা করে দেখতে পারে না। সে

21. Crichton Miller : Psychonalysis.

নিজেই নিজেকে ভালবাসছে অথবা নিজের দেহকে নিজেই উত্তেজিত করে নিজে সুখ অনুভব করছে তা সে বুঝতে পারে না—শুধু সুখানুভূতি-টুকুই তার হয়ে থাকে।

পায়ুস্তরে শিশুর মধ্যে আত্ম-রতি বা নারসিসিজম্ থাকে। এই সময় সে নিজেকে ভালবাসে। কিন্তু স্ব-কামীতার থেকে এটা ভিন্ন প্রকৃতির। পায়ুস্তরে অহং জন্মায়, তাই অহং তখন কামকে নিজের দিকে চালিত করে থাকে। আর স্ব-কামীতায় অহং না থাকায় শিশুর মধ্যে শুধু অদস্ বর্ত-মান থাকে, এবং সেইজন্যই সেখানে কামকে চালিত করার প্রশ্নই ওঠে না। বলা যেতে পারে, স্ব-কামীতায় অদস্ নিজের মধ্যে থেকে নিজেকে ভালবাসে, কেননা সেখানে তখনও অহং নেই। আর আত্মরতিতে অদস্ থেকে অহং বেরিয়ে এসে নিজেকে তার ভালবাসার পাত্র করে নেয়। আত্মরতিতে অহং দুভাগে ভাগ হয়ে (বিষয়ী ও বিষয়) একে অপরকে ভালবাসে। গ্রীক্ পুরাণে নারসিসাস্ ছিলেন নদীদেবতা সেফিসাস্-এর পুত্র। দেখতে তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। ইকো দেবী তাঁর প্রেমে পড়লেন, কিন্তু নারসিসাস্ তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন। দেবী ভেনাস নারসিসাসের অহমিকা দেখে তাঁকে অভিশাপ দেন। ফলে, নারসিসাস ঝর্ণার জলে তাঁর নিজের ছায়া দেখে সেই ছায়ার প্রতি প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং বিলাপ করতে করতে মারা যান ও একটি ফুলে পরিণত হন।

উপস্থকামে কাম নিজের দিকে চালিত হয় না। কাম তখন বহির্জগতের বস্তুর প্রতি চালিত হয়। শিশু তখন বহির্জগত থেকে শুধু স্নেহ ও আদর চায় না, তার অচেতনমনে কামের অনুভূতিও থাকে। এই সময় শিশুর বয়স মাত্র ৩/৪ বছর থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই মা-ই হ'ন শিশু-ছেলের প্রথম প্রিয়তমা। কারণ মা-ই তখন সাধারণতঃ সবচেয়ে কাছের মানুষ। এটাকেই ফ্রয়েড ঈডিপাস্ এষণা (Oedipus Complex) বলেছেন। শিশু-মেয়েও অনুরূপভাবে বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটাকে বলা হয় আবর্তিত ঈডিপাস্ এষণা (Inverted Oedipus Complex). ৩/৪ বছর বয়সেই কাম মুখ এবং পায়ু থেকে সরে এসে উপস্থে অবস্থান করে। শিশু তখন উপস্থ উত্তেজিত করে সুখ অনুভব করে। শিশু-ছেলে তার পুং-জননেন্দ্রিয় এবং শিশু-মেয়ে তার স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়স্থ ক্লাইটরিস*

*স্ত্রী-যোনিস্থ পুরুষের লিঙ্গসদৃশ যন্ত্রবিশেষ।

(clitoris) উত্তেজিত করে সুখ অনুভব করে। পুং-জননেন্দ্রিয় থেকে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়গত ক্লাইটরিস (স্ত্রী-যোনিস্থ পুরুষের লিঙ্গ সদৃশ যন্ত্র বিশেষ) আকারে ছোট হলেও শিশু-মেয়ে ভাবে যে এ-দুটো আসলে একই জিনিস, তফাৎ শুধু এই যে ক্লাইটরিস তখনও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নি। এবং সেই জন্য শিশু-ছেলে এবং শিশু-মেয়ে উভয়েই মায়ের প্রতি কাম পরিচালিত করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিশু-মেয়ে ভাবে যে তার স্বাভাবিক উপস্থ (পুং-জননেন্দ্রিয়) সম্ভবতঃ মা কেটে ফেলে দিয়েছেন। তাই সে তখন মায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখানে লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন যে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই প্রথমে মায়ের প্রতি কাম পরিচালিত করে। এবং এই কারণেই ফ্রয়েড ইলেকট্রা কম্প্লেক্স কথাটিকে পরবর্তিকালে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে আবর্তিত ঈডিপাস্ এষণা কথাটি ব্যবহার করেছেন। প্রথমে ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে ছেলে যেমন মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি মেয়ে বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি বলেন যে উভয়েই প্রথমে মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু মেয়ে যখন ভাবতে আরম্ভ করে যে মা তার লিঙ্গ কেটে ফেলেছেন তখন সে মায়ের থেকে কাম সরিয়ে এনে বাবার প্রতি চালিত করে। এই জন্যই ফ্রয়েড মেয়েদের কামকে আবর্তিত ঈডিপাস্ এষণা কলেছেন। সাধারণভাবে ঈডিপাস এষণা এবং আবর্তিত ঈদিপাশ এষণা এ-দুটোকে আলাদা করে বলা যায় না, কারণ এ-দুটো মূলতঃ একই। সাধারণ ভাবে বলবার সময় আমরা দুটোকেই ঈডিপাস্ বলে থাকি।

মনঃসমীক্ষণে ঈডিপাস্ এষণার গুরুত্ব বাড়িয়ে বলা যায় না। আর্ণেষ্ট জোনস্ বলেছেন ঃ "নির্জ্ঞানমনের মধ্যে এই এষণাকেই ফ্রয়েড মূলকেন্দ্র বলেছেন। এই এষণার সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ওপরই সবকিছুর চেয়ে বেশী নির্ভর করে শিশর ভবিষ্যৎ চরিত্র এবং আবেগজতান এবং যদি কখনো মনোরোগ হয়, তা-ও। এটা হ'ল মনঃসমীক্ষণের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যগত এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই এষণার বিরুদ্ধেই ব্যক্তির সমস্ত বাধা এবং বাইরে থেকে মনঃসমীক্ষণের বিরূপ সমালোচনা পরিচালিত হয়েছে। এই বাধা যতরকম বহুধা রূপেই পরিগ্রহ করুক না কেন এবং মনঃসমীক্ষণকে যতদিক দিয়েই সমালোচনা করা হোক না কেন—সে সবকিছুই যে শেষ-

পর্য্যন্ত এই ঈডিপাস্ এষণার জন্য হয়ে থাকে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এই এষণাকে ঘিরেই মনঃসমীক্ষণের অপরাপর সিদ্ধান্ত দানা বেঁধেছে এবং এর সত্যাসত্যের ওপরই মনঃসমীক্ষণের বৃদ্ধি অথবা লয় নির্ভর করে।"[22] এ-উদ্ধৃতি থেকে ঈডিপাস্ এষনার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

অতি শৈশব কাল থেকেই মায়ের প্রতি ছেলের এবং বাবার প্রতি মেয়ের আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, এইরূপ আকর্ষণের আধিক্য পরিলক্ষিত হলে তাকে মনোরোগ বলা যেতে পারে। শৈশবেই ছেলে বাবা থেকে এবং মেয়ে মা থেকে একটু আলাদা হয়ে যায়। ছেলে মাকে ভালবাসে এবং সে মনে করে যে মায়ের প্রতি তার ভালবাসায় বাবা বাধা দিচ্ছেন। অথবা ছেলে মাকে পুরোপুরি পেতে চায়, কিন্তু সে লক্ষ্য করে যে মায়ের ওপর বাবারও অধিকার আছে—এটা সে সহ্য করতে পারে না। তাই সে বাবা থেকে যেন একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাবার প্রতি বিরূপ মনোভাবও থাকে। অনুরূপ ভাবে মেয়ে বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সে মনে করে মা তার ভালবাসায় বাধা-স্বরূপ। তাই সেও মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই ছেলে মনে মনে বাবাকে সরিয়ে ফেলতে চায় আর মেয়ে চায় মাকে সরিয়ে ফেলতে। স্বপ্ন বিশ্লেষণের দ্বারা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নেও এই ইচ্ছা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। সচেতন অবস্থায় ছেলে বা মেয়ে এই ইচ্ছাকে অবদমিত করে রাখে, কিন্তু স্বপ্নে মাঝে মাঝে এই ইচ্ছা প্রকাশিত হতে চেষ্টা করে।

ঈডিপাস্ এষণার সঙ্গে আরও একটি ধারণা ঘণিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই ধারণাটি হল 'লিঙ্গচ্ছেদ-আশঙ্কা' (castration complex)। উপস্থস্তরে শিশু উপস্থ উত্তেজিত করে অথবা উপস্থ নিয়ে খেলা করে সুখ অনুভব করে। কিন্তু অধিশাস্তা হিসেবে মা বা অন্য কেউ, শিশু উপস্থ উত্তেজিত করলে অথবা ওটা নিয়ে খেলা করলে, তার উপস্থ ছেদন করে দেবেন এমন ভয় অনেক সময় দেখিয়ে থাকেন। মা বা অন্য কোন স্ত্রীলোক এই ভয় দেখানোর সময় তাঁরা নিজেরা একাজ করবেন এ-কথা বলেন না। তাঁরা বলেন বাবা অথবা ডাক্তার বা অন্য কোন পুরুষ এ-কাজ করবেন। পুরুষদের কাছে থেকে এই সময় শিশু-ছেলের নিজেকে বিচ্ছিন্ন[23] করে

22. Crichton Miller-এর Psychoanalysis গ্রন্থে উদ্ধৃতি থেকে
23. Alienated

আনার পেছনে এটাও একটি কারণ। কিন্তু উপস্থ-ছেদনের ধারণা মা অথবা সন্তানের মধ্যে এল কেন? ফ্রয়েড বলেছেন: "আমার বিশ্বাস এই সমস্ত প্রাথমিক কল্পসৃষ্টি-গুলো জাতিগত বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার কাছে এটা খুবই সম্ভব বলে মনে হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের পরিবারে উপস্থ-ছেদন প্রথা বাস্তবিকপক্ষেই ছিল।"

শিশু-মেয়ে তার লিঙ্গ না থাকায় নিজেকে একপ্রকারভাবে হীন মনে করে। সেও লিঙ্গ পেতে চায়, কিন্তু তার এটা নেই বলে তার মধ্যে লিঙ্গ-ঈর্ষা জন্মায়। এ-থেকেই পুরুষের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব জন্মাতে পারে। সে মনে মনে ভাবে কি করে পুরুষের সমতুল্য হওয়া যায়। বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকই এই হীনমন্যতাকে দূর করে নিজেদেরকে বিশেষভাবে নারী-সুলভ করে এবং পুরুষকে আকর্ষণ করে। এ-দ্বারা তারা ভাবে যে তারা পুরুষের সমান মূল্যবান। আবার অনেক স্ত্রীলোক, পুরুষ সন্তানের মা হয়েও তাদের লিঙ্গবিহীনতাজনিত হীনমন্যতা দূর করে। তারা ভাবে যে তাদের না থাকলেও তারা যে সন্তানের মা তাদের লিঙ্গ আছে। অর্থাৎ তারা লিঙ্গ জন্মাতে পারে। কোন কোন স্ত্রীলোক আবার বিয়ে করে এই হীনমন্যতা দূর করে। তারা ভাবে যে তাদের লিঙ্গ না থাকলেও প্রকারান্তরে তাদের (অর্থাৎ তাদের স্বামীদের) লিঙ্গ আছে। অর্থাৎ তারাও প্রকারান্তরে লিঙ্গের অধিকারিণী। মনস্তাত্ত্বিকদের অনেকেই স্ত্রীলোকের মধ্যে এই ধরণের হীনমন্যতার অবস্থিতির কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে স্ত্রীলোকের ধারণা এই যে প্রকৃতি তাকে হীন করে তৈরী করেছে। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে স্ত্রীলোকের ধারণা এই যে তার এই হীনতা প্রকৃতিগত নয় বরং জন্মের পর তাকে এমন হীন করা হয়েছে। এজন্য ফ্রয়েড ছেলেদের এবং মেয়েদের লিঙ্গ ছেদনবোধকে (castration complex) এক করে দেখেছেন। শুধু তফাৎ এই যে মেয়েরা ভাবে যে তাদের লিঙ্গ-ছেদন করা হয়ে গেছে এবং সেইজন্য তাদের লজ্জা এবং হীনমন্যতা। আর ছেলেরা ভাবে যে তাদের লিঙ্গ-ছেদন করা হতে পারে এবং সেইজন্য তাদের একটা উৎকণ্ঠা থাকে। কিন্তু মেয়েদের লিঙ্গ-ছেদনবোধ (castration complex) সম্পর্কে ফ্রয়েডের কখনোই খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আগেই বলা হয়েছে যে ফ্রয়েডের মতে উপস্থ-স্তরেই শিশুর ব্যক্তিত্বের

পূর্ণবিকাশ হয়ে থাকে। পরবর্তী জীবনে শিশুর বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তা' সবই নির্ভর করে এই তিন স্তরের ওপর, অর্থাৎ মুখ, পায়ু এবং উপস্থ স্তরের ওপর। আমরা সাধারণতঃ ভাবি যে ৩/৪ বছরের শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি বিকশিত হয় নাই। আমাদের এই ভুল ধারণার কারণ এই যে ৩।৪ বছর বয়েসে শিশুর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকশিত হলেও পরবর্তিকালে তার প্রতিক্রিয়াগুলো সমাজ, শিক্ষা, ইত্যাদির দ্বারা পরিমার্জিত অথবা পরিবর্তিতভবে দেখা দেয় এবং তাই আমরা এই পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত প্রতিক্রিয়াগুলোকে শৈশবের প্রতিক্রিয়াগুলো থেকে আলাদা মনে করি। আসলে একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যাবে যে এই দুপ্রকার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মৌল কোন পার্থক্য নাই। শৈশবে মুখকামী কোন শিশু দুঃখবাদী হলে পরবর্তী জীবনে সে পরিবেশের জন্য পরিবর্তিত হয়ে আশাবাদী হয়েছে বলে মনে হতে পারে কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে তার এই আশাবাদ ভাসা-ভাসা বাইরের জিনিস বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে ঠিকই সেই দুঃখবাদী শিশুটিই রয়ে গেছে। উত্তপ্ত লোহাতে একবার যে আকৃতি দে'য়া হয়ে গেছে তা' পরে কিছুতেই বদলানো যায় না।

উপস্থস্তরে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়ে গেলেও এর পর একটি অদ্ভুত স্তর আছে সেটাও ঠিক স্বভাবিক যৌন স্তর নয়। এই স্তরের নাম সুপ্ত স্তর[24]। উপস্থস্তরে শিশু উপস্থ উত্তেজিত করে যৌন সুখ উপভোগ করতে চায়, কিন্তু মা-বাবা এঁরা তার এই এচেষ্টাকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়, এমনকি লিঙ্গ-ছেদন করা হবে এমন ভয়ও দেখান। এর ফলে শিশুর অধিশাস্তার যথেষ্ট প্রচয় হয়। অবশেষে সে তার যৌন সুখ উপভোগকে একেবারে অবদমিত করে ফেলে। এবং তাই এই সময় থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শিশুর মধ্যে আর কোন প্রকার যৌন সুখ উপভোগের ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায় না।। বাইরে থেকে মনে হয় তার পূর্বেকার তিনটি স্তর, অর্থাৎ মুখ, পায়ু এবং উপস্থ স্তর একেবারে বিলীন হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটি তেমন নয়। তিনটি স্তরই তখনও বর্তমান থাকে, তবে সে সব স্তরের ইচ্ছাকে শিশু বাইরের মা-বাবার শাসনের জন্য, অথবা এর ফলে তার মধ্যে যে অধিশাস্তা গড়ে ওঠে তার ভয়ে, অবদমিত করে ফেলে। তাই-ই এই স্তরের নামকরণ হয়েছে সুপ্ত-স্তর।

24. Latency Period

৪।৫ বছর বয়েস থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই সুপ্তস্তর বর্তমান থাকে। যৌবনের শুরুতে যৌনাঙ্গগুলোর পরিবর্ধন শুরু হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পূর্ণ যৌনস্তরে পদার্পণ করে। এটাই স্বাভাবিক যৌন-স্তর। এইস্তরেও কাম-কেন্দ্র হ'ল উপস্থ। কিন্তু উপস্থস্তরের সঙ্গে এই স্তরের অনেক পার্থক্য আছে। কারণ উপস্থস্তরে বিপরীত লিঙ্গে যৌনাকার্ষণ থাকলেও যৌনসংক্রান্ত সকল শারীরিক পরিবর্ধন না হওয়াতে এই স্তরকে স্বাভাবিক যৌনস্তর বলা যেতে পারে না। এটাকে বড়জোর অপূর্ণ যৌন-স্তর বলা যেতে পারে। বাইরে থেকে এই দুই স্তরের ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উপস্থস্তরের ছেলেরা সাধারণতঃ ছেলেদের সঙ্গেই বেশী মেলামেশা করে এবং এমন মেলামেশা করতেই ভালবাসে; আবার এই স্তরের মেয়েরাও মেয়েদের সঙ্গেই বেশী মেলামেশা করে এবং বরং এমন মেলামেশা করতেই ভালবাসে। কিন্তু পূর্ণ যৌনস্তরে বিপরীত লিঙ্গে আকর্ষণ বেশী হয়ে থাকে।

উপস্থস্তরের পর সুপ্তস্তর আরম্ভ হলে উপস্থস্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো কিছুটা ম্লান হয়ে আসে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে সুপ্তস্তরের আগের তিনটি স্তরের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই সুপ্তস্তরে বর্তমান থাকে। শুধু লক্ষ্য করতে হবে এই যে পূর্বেকার তিনটি স্তরের স্বভাবিক প্রকাশ-ভঙ্গি এখানে থাকে না—প্রকাশভঙ্গি একটু আলাদা হয়; বলা যেতে পারে, বিকল্প প্রকাশভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে মুখকামীস্তরের বিকল্প প্রকাশ নখকামড়ানো, পায়ুস্তরের বিকল্প প্রকাশ ঝগড়াটে স্বভাব বা অন্য কিছুতে হতে পারে। উপস্থস্তরের ঈডিপাস্ এষণা মনের চেতন স্তরে এই সময় বর্তমান থাকে। সুপ্তস্তরে পূর্বের তিনটি স্তরের পুণঃপ্রকাশ ঘটে বলে এই স্তরের ওপর ব্যক্তির ভালবাসার পাত্র কি হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে। মায়ের প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকলে ছেলেরা সাধারণতঃ ছেলে-দের সঙ্গেই বেশী মিশতে চায়, কারণ তাতে মায়ের প্রতি তার আকর্ষণে আঘাত লাগেনা। যৌবনের পরও আত্মরতির নতুন এক ঢেউ আসে এবং এটা দীর্ঘদিন থাকলে ব্যক্তি বিয়ের জন্য এমন ব্যক্তি গ্রহণ করে যে নাকি নিজের মত অনেকটাই। বিয়ের ব্যাপারে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্যটিকে বলা হয় এ্যানাক্লিটিক[২৫]। পূর্বের ভালবাসার পাত্রের অনু-

25. Anaclitic

করণে ভালবাসার পাত্র গ্রহণ করাকে এ্যানাক্লিটিক্যাল বলা হয়। ব্যক্তি বিয়ের জন্য দু'প্রকার ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে—প্রথমতঃ. সে ব্যক্তি তাকে মায়ের মত লালনপালন করবে, অথবা দ্বিতীয়তঃ, সে ব্যক্তি বাবার মত তাকে রক্ষা করবে।

যা হোক কামের পরিণতি নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার হতে পারে ঃ—

(১) বহির্দেশে ঃ ভালবাসার পাত্রে (বাইরের)।

(২) অন্তর্দেশে ঃ আত্মরতিতে (নারসিসিজম্)।

(৩) গতিরোধ ঃ অপূর্ণ কামস্তরের কোন জিনিসের বা ব্যক্তির ওপর সংবন্ধ হওয়া। যে স্তরে সংবন্ধ হবে সেই স্তরেই সংবন্ধ থাকবে।

(৪) পশ্চাদ্‌গতি ঃ পূর্বের কোন স্তরে কাম সংবন্ধ হতে পারে।

(৫) পুঞ্জিভূত ঃ অপ্রকাশিত ও অবদমিত।

(৬) ভিন্ন পথে প্রবাহিত ঃ সমাজ সমর্থিত পথে কাম পরিচালিত হতে পারে, যেমন শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, সংগীত. ইত্যাদি। কামের উদ্গতি[২৬] বলা হয় একে।

উপরোল্লিখিত প্রণালীগুলো ভাল করে বোঝা যাক। বহির্দেশে ভালবাসার পাত্রে কাম কি করে প্রকাশিত হতে পারে তা' আমরা জানি। একেই আগে স্বাভাবিক যৌনতা বলা হয়েছে। আত্মরতি বা নারসিসিজম্‌ও আগে দেখেছি। নারসিসিজম্ সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় জানবার আছে। ফ্রয়েড গৌণ একপ্রকার (secondary) আত্মরতির কথা বলেছেন। অহং যখন তার ঈপ্সিত বস্তুতে কাম প্রকাশ না করতে পারে তখন সে তার নিজের মধ্যেই ঐ ঈপ্সিত বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো কল্পনা করে এবং কামকে তখন নিজের প্রতিই প্রবাহিত করে। এই প্রণালীকেই গৌণ-আত্মরতি (secondary narcissism) বলা হয়।

বস্তুর প্রতি কাম যখন আকৃষ্ট হয় তখন তাকে বলা হয় বিষয়যোগ বা ক্যাথেক্‌সিস্। কামের পরিণতির বিভিন্ন স্তরে কাম যদি কোন একটি বিশেষ স্তরে বিশেষ একটি বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে স্তর থেকে অন্য কোন স্তরে কাম না যায় তাহলে তাকে বলা হয় সংবন্ধতা (fixation)। এই সংবন্ধতাজনিত কামের স্থবিরতাকেই কামের গতিরোধ বলা হয়। কিন্তু কোন স্তরে কাম যদি সেই স্তরের কোন বস্তুতে স্বাভাবিক ভাবে নানা কারণে পরিচালিত না হতে পারে তাহলে কাম তখন হতাশ হয়ে

26. **Sublimation**

পূর্বের কোন স্তরের কোন বস্তুতে পরিচালিত হয়, এবং সেখানেই সংবদ্ধ থাকে। এই প্রণালীকেই বলা হয় কামের পশ্চাদ্‌গতি (regression)। আবার পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য অহং কামকে একেবারে অবদমিত করে নির্জ্ঞানস্তরে পেঁছে দিতে পারে—একে বলা হয় নিষ্পেষণ বা অবদমন। কাম এখানে নির্জ্ঞান মনে পুঞ্জিভূত অবস্থায় থাকে এবং স্বপ্নে এবং নানাভাবে নিজেকে সর্বদা প্রকাশিত করার প্রচেষ্টায় থাকে।

কাম যখন সমাজ অনুমোদিত কোন ক্রিয়াতে প্রকাশিত হয় তখন তাকে কামের উর্দ্ধগতি বলা হয়। কামের বিষয়যোগ সব সময় সমাজ-অনুমোদিত নয়। কাম যখন তার স্বাভাবিক গতি সমাজে খুঁজে পায় না তখন সে বিকল্প পথ খুঁজে বেড়ায়। শিল্প, সাহিত্য, ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস সমাজ-অনুমোদিত। এই সমস্ত সমাজ-অনুমোদিত পথেই অহং তখন কামকে পরিচালিত করে। ফ্রয়েড বলেন: "আমরা বিশ্বাস করি যে, অস্তিত্বের দ্বন্দ্বের ওপর এবং মৌল প্রেরণাগুলোর দাবী বিসর্জনের ওপরেই সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং এই সভ্যতা বেশ খানিকটা নিরবছিন্ন ভাবে পুনঃ পুনঃ রচিত হচ্ছে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই পরম্পরায় গোষ্ঠীতে যোগ দিচ্ছে এবং ঐ একইভাবে সে-ও তার সহজাত প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিচ্ছে সাধারণের কল্যাণে"।[27] যৌন-প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তাকেও ব্যক্তি এই ভাবে সভ্যতার দাবীতে বিসর্জন দিচ্ছে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে কামের উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি চারভাবে ঘটতে পারে। প্রথমতঃ, কাম বহির্জগতের কোন বস্তুতে বিষয় খুঁজে পেতে পারে, তা সে পরিণত বা অপরিণত (যেমন মুখ, পায়ু বা উপস্থস্তরের সংবদ্ধ) যাই হোক। দ্বিতীয়তঃ, কাম অহং-এর মধ্যেও পথ খুঁজে পেতে পারে (যেমন, আত্মরতি)। তৃতীয়তঃ, নির্জ্ঞানমনে কাম অবদমিত হতে পারে এবং চতুর্থতঃ, কাম যৌনতা বর্জিত হয়ে অযৌন বিষয়ে পরিচালিত হতে পারে (যেমন, শিল্প, কলা, ইত্যাদি)।

সামাজিক জীবনে প্রতিকূল পরিবেশে অহং সব সময় অদস্‌-এর হুকুম তামিল করতে পারে না। সমাজ-বিগর্হিত অদস্‌-এর দাবী যদি অহং মেনে নিতে চায় তা'হলে সমাজ অহংকে সমাজের পরিপন্থী বলবে ও ব্যক্তিকে সমাজ বর্জন করতে হবে অথবা সমাজ অহংকে বিনাশ করতে পারে—এমন ভয় অহং-এর সব সময় আছে। তাই অদস্‌-এর নিদারুণ দাবী যখন অহং

27. মিলারের Psychoanalysis and Its Derivatives এ উদ্ধৃতি থেকে

সমাজ-অনুমোদিত পথে পরিচালিত করতে পারে না তখন সে বিশেষ কয়েকটি বিশেষ প্রণালীতে অদস্-এর এই দাবী মেটাতে চেষ্টা করে অর্থাৎ কামকে বিশেষ কয়েকটি প্রণালীতে পরিচালিত করে থাকে। এই প্রণালীগুলোকে মানসিক প্রক্রিয়া বলা[২৮] যায়। কয়েকটি মানসিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যাক ঃ

১। অবদমন ঃ এটা আমরা আগেও দেখেছি। অবদমন দু'প্রকারের হতে পারে। প্রথমতঃ, চেতনমনে যে সব জিনিস পূর্ণ চেতনতার মধ্যে ছিল না সেগুলোকে চেতনা থেকে বের করে দে'য়া। দ্বিতীয়তঃ, চেতন অথবা অবচেতনমনের যে সমস্ত প্রেরণা সমাজ-অনুমোদিত নয় সেগুলোকে হয় অদস্-এ অথবা নির্জ্ঞান অহং-এ পাঠিয়ে দে'য়া। প্রথম প্রকারে ব্যাপারটি হয় এই ঃ আমরা জানি যে চেতন এবং অবচেতন মনেই ধারণাগুলো থাকে। এই ধারণাগুলোর সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তি সংযোজিত হলেই কেবল সেগুলো চেতন অথবা অবচেতনমনে থাকতে পারে। তাই ব্যক্তি এই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোকে আগে থেকেই ধারণাগুলোর সঙ্গে সংযোজিত হতে দেয় না। এই কারণেই এই প্রচেষ্টাকে প্রাথমিক বলা হয় আর দ্বিতীয় প্রকার অবদমনকে 'বহিষ্কার' বলা হয়। মনঃসমীক্ষণে শেষোক্ত অবদমন নিয়েই বেশীরভাগ প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রধানতঃ এইভাবেই অহং অদস্ এবং অধিশাস্তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। কিন্তু অদস্ও নাছোড়বান্দা, সেও নানাকৌশলে অবদমনকে প্রতিহত করে। যেমন, কোন প্রবৃত্তি যদি কোন ধারণার সঙ্গে যুক্ত হলে অহং তাকে অবদমিত করবে এমন ভয় থাকে তা'হলে অদ্স সেই প্রবৃত্তিকে এমন ধারণার মাধ্যমে চেতনমনে উপস্থাপিত করবে যে ধারণা নাকি সমাজের কাছে গ্রাহ্য। যেমন, যৌন অপরাধ করার হয়তো কারো ইচ্ছা আছে, কিন্তু তার অহং কিছুতেই সেটাকে চেতনমনে আধিপত্য স্থাপন করতে দেবে না। এমত অবস্থায় হয়তো যৌন অপরাধ বিজ্ঞান অনুশীলনে তার খুব উৎসাহ দেখা দিল।

অবদমন শুধুমাত্র যে অদস্-এর ক্ষেত্রেই হয় তা' নয় অধিশাস্তাও অনেক সময় অহং কর্তৃক অবদমিত হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় বাস্তবতাকেও আমরা অবদমিত করে থাকি। যেমন কোন অতি দুঃখপূর্ণ অভিজ্ঞতাকে আমরা অবদমিত করে থাকি, অর্থাৎ ভুলে থাকি। আবার শুধুমাত্র প্রবৃত্তিগত প্রেরণাগুলোকেই আমরা অবদমিত করি না। অনেক সময় অহং-এর উচ্চতম

28. Mental Mechanism

মহত্তম ধারণাগুলোও আমরা অবদমিত করে থাকি। কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হবে যে অহং এই সব অবদমন করে তার সুখভোগ নীতি অনুসারে এবং অদস্ এবং অধিশাস্তার মধ্যে ভারসাম্য রাখার জন্য। অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞানমনে গেলে উচ্চ এবং নীচ প্রবৃত্তি সবই এক হয়ে যায়, কারণ সেখানে সামাজিকতা, নৈতিকতা, সৌন্দর্যবোধ, ইত্যাদি বলে কিছু নাই।

২। অনেক সময় আবার দেখা যায় যে যে প্রবৃত্তিটি অহং-এর দ্বারা অনুমোদিত হ'ল না তার ঠিক বিপরীত একটি প্রবৃত্তি অহং উপস্থিত করল। যেমন কারো প্রতি অত্যধিক ভালবাসা তার প্রতি অত্যধিক ঘৃণায় পরিণত হ'ল। এখানে নির্জ্ঞানমন বিকল্পভাবে তার ইচ্ছা চরিতার্থ করে আর অহং অধিশাস্তার হুকুম তামিল করে। এই প্রক্রিয়াকে প্রতিক্রিয়া গঠন(reaction formation) বলা হয়। তেমনি নির্জ্ঞানে হীনমন্যতা থাকলে হয়তো সজ্ঞানে মানুষটি নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জাহির করে।

৩। অভিক্ষেপ (projection) বলে একটি মানসিক প্রক্রিয়া আছে। এখানে অহং তার নিজের প্রবৃত্তিটিকে ঢেকে রেখে ঠিক সেই প্রবৃত্তিটিকে অন্য কারো মধ্যে খুঁজে বেড়ায়। এ-ভাবে কোন অসৎ লোক অপরের অসদতার প্রতি কড়া নজর দিতে পারে। নিজের মনের পঙ্কজনিত অপরাধবোধ সমগ্র বহির্জগতকে এই উপায়ে পঙ্কিল করে তোলে ও শুচিবায়ু দেখা দেয়।

৪। একাত্মকরণ (identification) এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে এক ভাবে। এবং তার নিজের প্রবৃত্তিগুলো যেহেতু সে নিজেই চরিতার্থ করতে পারে না সেই জন্য সে সেই ব্যক্তির মাধ্যমে সেই প্রবৃত্তি-গুলো চরিতার্থ করছে ভাবে। যেমন, কারো হয়তো বড় খেলোয়াড় হবার ইচ্ছা, কিন্তু নিজে ভাল খেলতে পারে না। তখন সে কোন ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে নিজেকে এক করে ভাবে। সেই ভাল খেলোয়াড়ের বিজয়ে তখন তার গৌরব এবং অসাফল্যে অগৌরব হয়। সিনেমা জগতে 'ফ্যান' বলে একটা কথা আছে। সাধারণ দর্শকেরা শিল্পীদের কারও সঙ্গে নিজেদেরকে এক করে ভাবে এবং তাঁর ভাল মন্দে তারও খুশী-অখুশী হয়। এটাই একাত্মকরণ। গোষ্ঠী প্রবৃত্তির সঙ্গে একে তুলনা করা চলে।

৫। যুক্ত্যাভাস প্রয়োগ (rationalization) আর একটি মানসিক প্রক্রিয়া। এখানে অহং তার কৃত কাজের জন্য নানারকম উদ্ভট যুক্তি তৈরী করে থাকে এবং এইগুলো দিয়ে সেই কৃত কাজকে সমর্থন করে। কোন

ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সে দোষ আর নিজের ওপর না চাপিয়ে সে শিক্ষানীতির দোষ, শিক্ষকের দায়িত্বহীনতা, পরীক্ষকের অবহেলা এই সব ভেবে অহংকে সন্তুষ্ট করতে চায়।

৬। অপর একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে ফ্রয়েড অন্তর্বৃতি (introversion) বলেছেন। ইয়ুং-এর অন্তর্বৃতি থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। অহং বহির্জগতের কোন বস্তুতে কামের বিষয় যোগ না ঘটাতে পারলে ভেতরের দিকে কামকে পরিচালিত করে। কিন্তু আত্মরতির বেলায় কাম যেমন অহং-এ বিষয় যোগ করে থাকে এখানে তেমন নয়। এখানে অহং বহির্জগতের কোন বস্তুর কল্প সৃষ্টির (phantasy) মধ্যে কাম পরিচালিত করে। এইভাবে দুঃখময় বাস্তবতা (reality) থেকে প্রত্যাহৃত করে অহং বিকল্পভাবে সুখ খুঁজে পায়।

এইভাবে অদ্স থেকে সৃষ্ট হয়ে অহং সারাজীবন এক গুরুদায়িত্ব বয়ে বেড়ায়। সুখই তার এক মাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু তাকে অধিশাস্তা এবং বাস্তবতাকে মেনে চলতেই হবে। তাই তাকে অদ্স এবং বাস্তবতার মধ্যে সবসময় ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। তার কাজ নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক। তাকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার স্মরণাপন্ন হতে হয়। এই হ'ল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ধারা। এইভাবে অদ্স, অধিশাস্তা এবং বাস্তবতা, এই তিনটি প্রভুকে কূটনৈতিক ভাবে সন্তুষ্ট রেখে অহংকে সারাজীবন এগোতে হয়। প্রয়োজন হলে অহং সমাজ বিগর্হিত প্রবৃত্তিগুলো অবদমিত করে। কখনো কখনো এমন অবদমনের ফলে কোন ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ব্যক্তি মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ থাকে। কিন্তু কখনো কখনো এই অবদমনের ফলে ব্যক্তি উন্মায়ু-রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের প্রচয়ের মতবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক। এই মতবাদের বিশেষত্ব এই যে ব্যক্তিত্বের সবকিছুরই উৎস হচ্ছে অদস্ এবং অতি অল্প বয়েসেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং বাকী জীবনে তার কোন মৌল পরিবর্তন হয় না।

স্বপ্ন-ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডের অন্যতম অবদান। অতীত কাল থেকে অনেকে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে-সব ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। বলা যেতে পারে ১৯০০ সালে প্রকাশিত ফ্রয়েডের 'The Interpretation of Dreams' বা 'স্বপ্ন-ব্যাখ্যাই' সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক স্বপ্ন-ব্যাখ্যা। এই বই-এ ফ্রয়েড স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত বিস্তারিত আলোচনা করেন। স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতামত আলোচনা ভিন্নভাবে করার চেয়ে তাঁর 'The Interpretation of Dreams' বা স্বপ্ন-ব্যাখ্যার সারসংক্ষেপ আলোচনাই বোধহয় উৎকৃষ্ট পন্থা। তাই এই অধ্যায়ে তাঁর স্বপ্নব্যাখ্যার অতি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ দে'য়া হ'ল মাত্র।

১

অতীতে বিশ্বাস ছিল যে স্বপ্ন কোন অতি মানবিক জগতের বস্তু এবং দেবতা ও দানবদের দ্বারা স্বপ্ন মানুষের কাছে প্রেরিত হয়ে থাকে। দার্শনিক এ্যারিষ্টটল তাঁর দু'খানি রচনাতে স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে স্বপ্ন অপ্রাকৃত জগতের বস্তু নয় বরং স্বপ্ন মানবিক। এ্যারিষ্টটলের মতে স্বপ্ন হ'ল ঘুমিয়ে থাকা মানুষের মানসিক-কাজ। তিনি স্বপ্নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যেমন তিনি জানতেন যে ঘুমিয়ে থাকাকালীন কোন ক্ষুদ্র উদ্দীপককে স্বপ্নে আমরা বিকৃত করে দেখি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোন ব্যক্তি ঘুমে শরীরের কোন অংশে উত্তাপ অনুভব করলে স্বপ্নে দেখতে পারে যে সে আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ম্যাক্রোবায়াস (Macrobius) এবং আর্টেমিডোরাস (Artemidorus)-এর মতে স্বপ্নকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—কতকগুলো স্বপ্ন শুধু অতীত এবং বর্তমানকে প্রতিফলিত করে আর কতকগুলো স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে।

জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে স্বপ্নাবিষ্ট মুহূর্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে বার্ডাক (Burdach) বলেছেন যে স্বপ্নে আমরা সারাদিনের কৃতকর্মের হিসেব দেখি

না, সারাদিনের সুখ-দুঃখের ছবি দেখি না বরং সারাদিনের এইসব সুখ-দুঃখের থেকে কি করে নিস্তার পাওয়া যায় তারই পথ খুঁজে বেড়ানোই হল স্বপ্নের উদ্দেশ্য। ষ্ট্রাম্পেলও (Strumpell) একই মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরও মত এই যে স্বপ্ন দেখার সময় একজন লোক জাগ্রত চেতনার জগত থেকে দূরে চলে যায়। আবার মরি (Maury) বলেছেন যে আমরা যা দেখেছি বলেছি, করেছি বা যাকে পাবার আশা করেছি তাই স্বপ্নে দেখি। দার্শনিক মাস (Maass) এর মতামত আরও উন্নত। তিনি বলেছেন: আমাদের অতি আবেগময় ভাব নিয়েই আমরা বেশীর ভাগ স্বপ্ন দেখে থাকি এবং এ-থেকে বোঝা যায় যে আমাদের স্বপ্নের পেছনে আবেগগুলোর প্রভাব আছে। লুক্রেসিয়াস (Lucretius) তাঁর 'De rerum natura' কবিতায় বলেছেন যে আমরা যে সব জিনিসের প্রতি আসক্ত বা যে সব জিনিস নিয়ে অতীতে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সব জিনিসগুলোই স্বপ্নে দেখি। যেমন আইনজ্ঞরা দেখেন আইন সম্পর্কে স্বপ্ন এবং সামরিক নায়করা দেখেন যুদ্ধ সম্পর্কে স্বপ্ন। সিসেরো (Cicero) বলেছেন যে সচেতন জীবনের অবশিষ্ট কার্য্যাবলী এবং চিন্তাধারাই ঘুমন্ত আত্মাকে জাগরিত করে রাখে। ফ্রয়েড বাল্য কালের এবং শৈশবের অভিজ্ঞতার কথা বার বার বলেছেন। স্বপ্নে একেবারে শৈশবের স্মৃতিও আমরা দেখতে পাই। ভল্‌কেল্ট (Volkelt)-ও অনুরূপ কথা বলেছেন। ১৮৭৫ সালে তিনি বলেছেন: 'বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিভাবে সহসা শৈশবের এবং যৌবনের স্মৃতিরাশি স্বপ্নে দেখা দেয়। আমরা যেসব জিনিস সম্বন্ধে আর ভাবিনা এবং যেসব জিনিস আর এখন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের স্বপ্ন সেই সব জিনিসগুলো সম্বন্ধেই আমাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।" রবার্ট-এরও (Robert) একই রকম ধারণা ছিল। তাঁর মতে কিছুদিন আগের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিই আমরা স্বপ্নে দেখি। হিলডেব্রাণ্ট (Hildebrandt), হ্যাভ্‌লক এলিস্ (Havelock Ellis) এবং বিন্‌জ (Binz) এর ধারণা ছিল অতীতের তুচ্ছ জিনিসই স্বপ্নের বিষয়বস্তু।

বাইরের উদ্দীপক বস্তুর সংগে স্বপ্নের সম্পর্ক সম্বন্ধেও ফ্রয়েডের আগে অনেক আলোচনা এবং পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে গেছে। মরি (Maury) তাঁর নিজের ওপর এ-সম্পর্কে পরীক্ষা চালান। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পরীক্ষার কথা মাত্র উল্লেখ করা গেল:

(ক) ঘুমন্ত অবস্থায় পালক দিয়ে ঠোঁট এবং নাশিকার অগ্রভাগ বার বার স্পর্শ করা হয়েছিল বলে তিনি ভয়ংকর পরিস্থিতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে পিচের তৈরী একটি মুখোশ তাঁর মুখে একবার বসিয়ে সরিয়ে নে'য়া হচ্ছে এবং ফলে তাঁর মুখের চামড়া ঐ মুখোশের সংগে উঠে আসছে।

(খ) ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর নাকের কাছে ওডিকোলন দে'য়া হয়েছিল। স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে তিনি কায়রোতে কোন আতরের দোকানে গেছেন।

(গ) ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর কপালে এক ফোঁটা জল ফেলা হ'ল এবং তিনি দেখলেন যে তিনি ইতালীতে আছেন এবং প্রচুর ঘাম হচ্ছে তাঁর আর তিনি সুরা পান করছেন।

এ-সব পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মরির ধারণা হ'ল যে বাইরের যে সব উদ্দীপক জিনিস থেকে আমাদের স্বপ্নের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আমরা স্বপ্নে ঠিক ঠিক সেই সব জিনিস দেখি না, অন্য জিনিস দেখি। কিন্তু এই দু'প্রকারের জিনিসের মধ্যে একপ্রকার যোগসূত্র আছে, তবে এই যোগসূত্র নির্দ্দিষ্ট কোন যোগসূত্র নয়, অর্থাৎ সবসময় এবং সবার বেলাতেই একই রকম যোগসূত্র থাকবে এমন নয়।

কিন্তু বাইরের উদ্দীপককে ঘুমন্ত মানুষ অন্যভাবে দেখে কেন? এব্যাপারে ষ্ট্রাম্পেল্ এবং ভুন্ড্ (Wundt) এর একই মত। তাঁরা বলেন যে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা এমন থাকে যে আমরা সহজেই ভ্রম করি। চেতন অবস্থায় আমরা সাধারণতঃ ভুল করি না তার কারণ বাইরে থেকে আসা উদ্দীপনা থেকে আমাদের যে ধারণা হয় তাকে আমাদের সচেতন অবস্থার অন্যান্য ধারণা ও স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি এবং তারপর তাকে উপলব্ধি করি, অর্থাৎ চিনতে পারি। আর যদি তা' না করি তা'হলেই আমাদের ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা বাইরে থেকে আসা উদ্দীপনার সঙ্গে অন্যান্য ধারণা ও স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি না। কাজেই স্বপ্নে আমরা ভ্রম করে থাকি।

বাইরের উদ্দীপনা সংবন্ধে যা বলা হ'ল ভেতরের জৈব উদ্দীপনা সংবন্ধেও তাই বলা যেতে পারে। ষ্ট্রাম্পেল্ বলেন যে চেতন অবস্থার চেয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় আভ্যন্তরীণ জৈব উদ্দীপনা সম্পর্কে আমরা বেশী সচেতন থাকি।

আর্টিগেস্ (Artigues) তাঁর রচনাতে এক ভদ্রমহিলার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ভদ্রমহিলা বহুদিন উৎকণ্ঠা উদ্দীপক স্বপ্ন দেখতেন। পরে দেখা গেল যে তিনি হৃদরোগে ভুগছেন।

দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের স্বপ্নসম্বন্ধে মতবাদ অনেক লেখকের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি বলেছেন যে বাইরে থেকে আসা অনুভূতিকে আমাদের বুদ্ধি দেশ, কাল এবং কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক এই তিনটি বিষয়ের ওপর রেখে বিচার করেই কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা বাস্তবিক দেশ, কাল এবং কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। অথচ আমাদের বুদ্ধি এগুলো ছাড়া কোন জিনিস ভাবতেই পারে না। তাই ঘুমন্ত অবস্থায় যে কোন উদ্দীপনাকে আমরা আমাদের বুদ্ধিদ্বারা তৈরী নকল দেশ, কাল এবং কার্য্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে রেখে বিচার করি। তাই আমাদের অভিজ্ঞতা হয় ভ্রমাত্মক।

স্বপ্নের মানসিক (Psychical) কারণ সম্বন্ধেও ফ্রয়েডের আগে অনেকের ধারণা ছিল। কিন্তু ভুণ্ড প্রভৃতি মনীষীরা মানসিক কারনে বিশ্বাস করতেন না।

ঘুমের থেকে উঠলেই আমরা কেন স্বপ্ন ভুলে যাই তার কারণ ঃ—

(১) স্বপ্নের ঘটনাগুলি আমাদের মনে খুব কম রেখাপাত করে। অনুভূতিগুলো থাকে অতি অস্পষ্ট।

(২) স্বপ্নে আমরা যা' দেখি তা হ'ল অনুপম এবং অদ্ভুত। মনের অনুসঙ্গ নীতি (Law of association) অনুযায়ী কোন নতুন জিনিসের সঙ্গে যদি আমাদের পূর্বে মনে থাকা কোন জিনিসের মিল না থাকে, তা'হলে সে জিনিস মনে রাখতে পারি না। কাজেই স্বপ্ন আমরা অচিরেই ভুলে যাই।

(৩) যে সমস্ত জিনিস স্বপ্নে দেখি সে সব জিনিস এলোমেলো, শৃঙ্খলাবিহীন। তাই মনের অনুসঙ্গ নীতি অনুযায়ী আমরা সে সব জিনিস তাড়াতাড়ি ভুলে যাই।

(৪) তাছাড়া স্বপ্নে যা'দেখি সে সব জিনিসের মধ্যে আমাদের সাধারনতঃ কোন ঔৎসুক্য থাকে না। এজন্য সহজেই তা' আমরা ভুলে যাই।

বেনিনি (Benini) আরও দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন।

(৫) ঘুমন্ত এবং জাগ্রত অবস্থার মধ্যবর্ত্তি অবস্থায় অনুভূতিগুলো

অস্পষ্ট থাকার জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখি জাগ্রত অবস্থায় তা' আমরা সহজে মনে করতে পারি না।

(৬) স্বপ্নে যা'দেখি তা' আমাদের কল্পনা প্রসূত; তাই জাগ্রত অবস্থায় বাস্তবের জগতে সেগুলোকে আমরা ভাষা দিতে পারি না।

স্বপ্নের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কি সে সম্পর্কে জি. টি. ফেকনার বলেছেন যে স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থার পটভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্লেয়ার-ম্যাকার (Schleiermacher)-এর মতে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের চিন্তা ধারনার (concept) মাধ্যমে প্রকাশ পায় প্রতিমূর্তির (image) মাধ্যমে। সাধারণতঃ প্রতিমূর্তির মাধ্যমে স্বপ্নে আমাদের কল্পনা প্রকাশিত হলেও স্বপ্নে আমরা অনেক সময় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারও দেখতে পাই—যেমন কর্ণ এবং অন্যান্য আর সব ইন্দ্রিয়গুলো। স্বপ্ন এই সব প্রতিমূর্তি-গুলোকে নাটকীয়তা প্রদান করে। আমরা প্রতিমূর্তিগুলোর কথা চিন্তা করি না, স্বপ্নে আমরা অভিজ্ঞতা অনুভব করি। বার্ডাক (Burdach) বলেছেন যে (১) স্বপ্নে আমাদের মন্ময় জিনিসগুলো বস্তুময় জিনিসে রূপান্তরিত হয় এবং (২) ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মার কর্তৃত্ব হ্রাস পায় এবং সেই জন্য আমরা সক্রিয় অবস্থা থেকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকি। ডেল্‌বিউফ (Delboeuf) বলেছেন যে স্বপ্নের ঘটনাবলীতে আস্থা থাকে এইজন্য যে আমরা এইসব ঘটনাকে অন্যকোন ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে সত্যাসত্য বিচার করতে পারি না। কারণ বহির্জগত থেকে আমরা তখন বিচ্ছিন্ন থাকি। হাফনার (Haffner)-এর মতে স্বপ্নের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে স্বপ্ন দেশ এবং কালের গন্ডি থেকে মুক্ত। বাস্তবে সব কিছু দেশ-কালের দ্বারা নির্দ্ধারিত। হাফনারের মতে স্বপ্নের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে স্বপ্নে আমরা আমাদের মনশ্চিত্র, প্রতিচ্ছবি, কল্পসৃষ্টি এবং ভ্রমের সঙ্গে বাস্তব-জগতের অভিজ্ঞতাগুলোকে গুলিয়ে ফেলি। মরির মতে অনৈচ্ছিক কম্পন রোগে কম্পন যেমন বুদ্ধি ব্যতিরেকেই হয়ে থাকে তেমনি স্বপ্নে এই প্রতি-মূর্তিগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদের মনে আসতে থাকে। র‍্যাডষ্টক্ (Radestock)-এর মতে স্বপ্নের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে বিচার এবং সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পায়। তবে স্বপ্নে বিচার বুদ্ধি বা যুক্তি একদম চলে যায় না।

এ-সম্পর্কে হ্যাভলক্ এলিসের মত প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন যে

স্বপ্ন হচ্ছে শক্তিশালী আবেগ এবং অপূর্ণ চিন্তার প্রাচীনতম জগৎ। তার মতে এইসব আবেগ ও চিন্তাধারাকে জানতে পারলে মানুষের মানসিক বিকাশের প্রাথমিক ধাপগুলো জানা যেতে পারে। সালি (Sully)-ও একই কথা বলেন। তিনি বলেন যে ঘুমে আমরা সেই আদিম জগতে চলে যাই।

স্বপ্নে নৈতিকতা থাকে কিনা এ-প্রশ্নের উত্তরে র‍্যাডেষ্টক্ বলেছেন যে স্বপ্নে নৈতিকতা এবং ললিতকলার অবকাশ নাই। ভলকেল্ট-এর মতে স্বপ্নে যৌনতা বল্গাহীন অশ্বের মত ছোটে। আমরা তখন লজ্জাহীন হয়ে পড়ি, নৈতিকতা বলে কিছু থাকে না। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছেন ঠিক উল্টো কথা। তিনি বলেছেন যে যার চরিত্র যেমন সে ঠিক তেমনি স্বপ্ন দেখে। শোলজ্ (Scholz) বলেছেন যে স্বপ্নেই সত্য প্রকাশ পায়, স্বপ্নেই আমরা নিজেদেরকে সঠিকভাবে জানতে পারি। হিলডেব্রান্ড-এর মত শোপেনহাওয়ারের মতের মত।

পুরাকালে ধারণা ছিল যে দেবতারা স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে। ডেল্‌বিউফ (Delboeuf) বলেছেন স্বপ্ন দেবতাদের পাঠানো কোন জিনিস নয়। জাগ্রত অবস্থায় যে সব মানসিক ক্রিয়া হয়ে থাকে স্বপ্নে তারই নিরবচ্ছিন্ন সূত্র দেখতে পাই। অপরদিকে আর এক মতে জাগ্রত অবস্থার মানসিক ক্রিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় হ্রাস পায় এবং এলোমেলো হয়ে যায়। রবার্ট বলেছেন স্বপ্নে আমাদের বন্ধ চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়। তাই কেউ যদি স্বপ্ন না দেখে তা'হলে তার পাগল হবার সম্ভাবনা থাকে। শার্নার (Scherner)-এর অভিমত প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন স্বপ্ন এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া যা' সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে। স্বপ্নে প্রতীক সম্বন্ধে শার্নার সচেতন ছিলেন। যেমন, তিনি বলেছেন যে মানবদেহকে আমরা স্বপ্নে সাধারণতঃ বাড়ীঘরের প্রতীকে দেখি। শার্ণারের মতে স্বপ্ন কোন উপযোগীতা যোগায় না; ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের দেহের ওপর উদ্দীপক জিনিসগুলো নিয়েই আমাদের মন স্বপ্ন গড়ে তোলে।

স্বপ্নের সঙ্গে মানসিক রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ-নিয়েও ফ্রয়েডের আগে অনেকেই আলোচনা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। হোনবাউম (Hohnbaum)-এর মতে ভ্রমাত্মক বাতুলতার পূর্বলক্ষণ হ'ল উৎকণ্ঠামূলক এবং ভয়ানক স্বপ্ন। মানসিক রোগের নিরাময় কালে দেখা যায় যে জাগ্রত অবস্থায় রোগী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবহার করলেও তার স্বপ্নে

মানসিক রোগের লক্ষণ বর্তমান থাকে। দার্শনিক কাণ্ট বলেছেন: "বায়ু-গ্রস্তরোগী জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে। একই কথা বলেছেন ক্রস্ (Krauss)। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছেন: স্বপ্ন হ'ল ক্ষণিকের বাতুলতা আর বাতুলতা হ'ল দীর্ঘ স্বপ্ন। এ বিষয়ে র‍্যাডষ্টকের মতবাদ উল্লেখ্য। তিনি বলেন যে মানুষ যখন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে জর্জরিত হয় তখন সে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে যা' পাওয়া যায় নাই তাই পেয়ে থাকে। তেমনি আবার মানসিক রোগে রোগী সুখ, ঐশ্বর্য্য, ইত্যাদি তার করায়ত্ব হয়েছে, ভাবে। সুতরাং র‍্যাডষ্টকের মতবাদ অনেকটা ফ্রয়েডের মতবাদের মত। র‍্যাড্ষ্টকও ফ্রয়েডের মত বলেন যে স্বপ্ন হ'ল অভিপ্সার চরিতার্থতা (fulfilment of wishes)।

২

প্রথম অধ্যায়ে ফ্রয়েড স্বপ্নব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর পূর্বের চিন্তানায়কদের মতামত বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তিনি তাঁর নিজের গবেষণা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপ্নব্যাখ্যার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বপ্ন-ব্যাখ্যার দুপ্রকার পদ্ধতি হতে পারে। প্রথমতঃ, সমগ্র স্বপ্নটিকে একটি প্রতীক হিসেবে নেয়া যেতে পারে। বাইবেলে ফ্যারাও-এর স্বপ্ন-ব্যাখ্যার একটি দৃষ্টান্ত আছে। ফ্যারাও স্বপ্নে দেখলেন সাতটি কৃশকায় গরু পূর্বগামী সাতটি স্থূলকায় গরুকে খেয়ে ফেলল। জোসেফ এ-স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে যে সাত বছরের প্রাচুর্যের পর সাত বছর অপ্রাচুর্য্য বা দুর্ভিক্ষ আসবে এবং তখন পূর্বের সাতবছরের প্রাচুর্য্য শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় প্রকার পদ্ধতিতে স্বপ্নটিকে সমগ্রভাবে না নিয়ে তার অংশগুলোকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ধরা যাক কেউ একটা চিঠি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কোন একটি বই দেখে হয়তো জানা গেল যে 'চিঠি' হ'ল 'ঝামেলার' প্রতীক এবং 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া' হ'ল 'পাণিগ্রহণের' প্রতীক, এই ভাবে স্বপ্নটিকে ব্যাখ্যা করা গেল যে পাণিগ্রহণে ঝামেলা হবে। এমন একটি স্বপ্নব্যাখ্যার বই লিখেছিলেন আর্টেমিডোরাস অব ডালডিস্ (Artemidorus of Daldis)। প্রতীকবাদী হ'লেও আর্টেমিডোরাস-এর মতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা কিছুটা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। যেমন একই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ধনী-দরিদ্র, বিবাহিত-অবিবাহিতদের মধ্যে ভিন্নরূপের হয়ে থাকে।

এই দুটি পদ্ধতিকেই ফ্রয়েড সমালোচনা করেছেন। প্রথম পদ্ধতির ব্যবহার সীমিত আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রতীকগুলোর ওপর বিশ্বাসই বড় কথা। তাই এ-সব পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে গণ্য করা যায় না। ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব। মৃগীরোগ, ইত্যাদি বায়ুরোগর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়েই স্বপ্ন-ব্যাখ্যার প্রতি ফ্রয়েড উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁর পথপ্রদর্শক জোসেফ ব্রয়ারের উক্তি থেকেও তিনি অনুপ্রাণিত হন। ব্রয়ারেরও ধারণা ছিল যে স্বপ্নের সঙ্গে বায়ুরোগের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ফ্রয়েড তার বায়ুরোগীদেরকে তাদের স্বপ্ন খোলাখুলিভাবে বলতে অনুরোধ করেন। রোগীদেরকে চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে শুয়ে স্বপ্নটির ওপর মনোযোগ রাখতে বলা হ'ত। এমন কি অনেক খুঁটিনাটি এবং তুচ্ছ জিনিস যা নাকি স্বপ্নটির ওপর মনোযোগ নিবন্ধ করলে মনে আসত তাও রোগীকে বলতে অনুরোধ করা হ'ত। ফ্রয়েড রোগীর পাশে বসে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রোগীর সবকিছু মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং সময় সময় প্রয়োজন হলে কোন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করতে বলতেন। রোগীকে অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতিতে স্বপ্নের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো আলোচনা করতে বলা হ'ত। অবাধ ভাবানুষঙ্গ একটি অভিনব পদ্ধতি। আমাদের মনের প্রত্যেকটি ধারণা অপর একটি বা একাধিক ধারণার সঙ্গে যোগসূত্রে গ্রথিত। তাই একটি ধারণা মনে আসলে ঐ সূত্রে গাঁথা অপর ধারণাটিও মনে আসে। কোনরূপ যুক্তিবাদের অবকাশ না রেখে মনটিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে একটি ধারণা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সূত্রে-গাঁথা অপর ধারণাটি মনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে। এটাকেই অবাধ ভাবানুষঙ্গ বলা হয়। এর জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন আমাদের যুক্তিপ্রবণতাকে দূরে সরিয়ে রাখা। কবি দার্শনিক শিলারের মতে যুক্তি-প্রবণতাকে দূরে সরিয়ে না রাখলে কোনরূপ অভিনব সৃষ্টি সম্ভব নয়।

ফ্রয়েডের স্বপ্নব্যাখ্যা পদ্ধতি ওপরে বর্ণিত দুপ্রকার পদ্ধতির শেষ প্রকারের মত অর্থাৎ স্বপ্নকে তিনি টুকরো টুকরোভাবে বিশ্লেষণ করতেন। এভাবে প্রায় হাজার খানেক স্বপ্ন তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 'স্বপ্নব্যাখ্যা'র (The Interpretation of Dreams) দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি একটি স্বপ্নের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের কথা উল্লেখ করেছেন। অতি, সংক্ষেপে এই স্বপ্নব্যাখা দেয়া হ'ল। পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য স্বপ্নব্যাখ্যার উল্লেখ না

করলেও আমরা ফ্রয়েডের স্বপ্নসম্বন্ধে প্রায় সমস্ত মতবাদ এই স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারব। তা ছাড়া তাঁর স্বপ্নব্যাখ্যা পদ্ধতিও এ-থেকেই বুঝতে পারা যাবে। ১৮৯৫ সালে ফ্রয়েড একটি স্বপ্ন দেখেন ঃ

"একটি বড় হলঘর—অনেক অতিথিকে আমরা অভ্যর্থনা করছি।—অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আরমা (Irma)। তৎক্ষণাৎ আমি তাঁকে একদিকে নিয়ে গেলাম ঃ আর মনে হ'ল তাঁর চিঠির জবাব দেবার জন্য এবং আমার 'দ্রবন' তখনও পর্য্যন্ত গ্রহণ না করার জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করতে তাঁকে একদিকে নিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম ঃ 'এখনো যদি আপনার ব্যথা থাকে, তা'হলে সেজন্য আপনিই দায়ী।' তিনি বললেন ঃ 'আমার গলায়, পাকস্থলীতে এবং পেটে যে কি ব্যথা তা যদি আপনি জানতেন—আমার গলা ধরে আসছে।' আমার ভয় হ'ল এবং আমি অন্য দিকে তাকালাম। তাঁকে রক্তশূন্য এবং ফোলা ফোলা মনে হল। মনে মনে ভাবলাম, আমি বুঝি কোন জৈবিক ব্যথাকে লক্ষ্য করি নি। আমি তাঁকে জানালার ধারে নিয়ে গেলাম এবং তার গলার ভেতর দেখলাম। তিনি কৃত্রিম দাঁত-লাগানো মেয়েদের মত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেন। আমি ভাবলাম তাঁকে এমন না করলেও হ'ত। —তিনি তখন তাঁর মুখ স্বাভাবিক ভাবে খুললেন এবং মুখের ডানদিকে আমি বড় সাদা একটি জায়গা দেখতে পেলাম। অপরস্থানে নাকের গোলাকৃতি হাড়ের মত কোঁকড়ানো জিনিসের ওপর বিস্তৃত ধূসরবর্ণের দাগ দেখতে পেলাম। —সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডাঃ 'ম'-কে ডাকলাম এবং তিনি অনুরূপ পরীক্ষা করে একই মন্তব্য করলেন।...ডাঃ 'ম'-কে সম্পূর্ণ অন্য-রকম দেখাচ্ছিল ঃ পাণ্ডুর বর্ণ ; গোঁফ দাড়ি সম্পূর্ণ কামানো মুখে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। ...আমার বন্ধু ওটো-ও (Otto) রোগিণীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বন্ধু লিওপোল্ড (Leopold) রোগিণীর কাঁচুলীর মধ্যদিয়ে দেখে বললেন ঃ 'এঁর বাঁদিকের নীচে একটি নীরস জায়গা আছে।' তিনি আরও নির্দেশ করলেন তাঁর বাঁ কাঁধের ওপর আক্রমণ হয়েছে। (তাঁর পোষাক থাকা সত্ত্বেও লিওপোল্ডের মত আমিও তা' দেখলাম) ...'ম' বললেন ঃ 'কোন সন্দেহ নাই যে এটা একটা সংক্রমণ, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমাশয় হবে এবং তার বিষ চলে যাবে।' ...আমরাও সংক্রমণের উৎপত্তি সম্বন্ধে সোজাসুজি অবহিত ছিলাম। বেশী দিন আগে নয়, যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন তখন আমার বন্ধু ওটো তাঁকে একটি ইন্‌জেকশন

দিয়েছিলেন যা'তে ছিল প্রোপিল, প্রোপিল...প্রোপিনিক এসিড...ট্রাই-মিথাইল এ্যামাইন (এবং আমি এর ফরমূলা বড় হরফে আমার সামনে ছাপা দেখলাম)...এসব ইন্‌জেকশন চিন্তা না করে দে'য়া ঠিক নয়...এবং সম্ভবতঃ ইনজেকশনের নলটি পরিষ্কার ছিল না।"

এই স্বপ্ন দেখার পূর্বদিন ফ্রয়েড এক চিকিৎসাধীন রোগিণীর সম্বন্ধে এক কনিষ্ঠ সহকর্মীর কাছে থেকে অবহিত হ'ন। রোগিণীটি তার পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ; কাজেই চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর একটু অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ ফ্রয়েড যে চিকিৎসাবিধান দিতেন তিনি তা' গ্রহণ করতেন না, অথচ ফ্রয়েডকে আশ্বাস দিতেই হয়েছিল যে রোগিণী সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন। কিন্তু কিছুদিন চিকিৎসাব পরও রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হ'ন নি। যা হোক, স্বপ্নের আগের দিন ঐ কনিষ্ঠ সহকর্মীর (ওটো) কাছ থেকে ফ্রয়েড রোগিণীর সম্পর্কে অবহিত হ'ন। ফ্রয়েডের বার বার মনে হচ্ছিল ওটো যেন এই রোগিণীর ভুল চিকিৎসার জন্য তাঁকে মনে মনে ভর্ৎসনা করছেন। এদিন বিকেলেই ফ্রয়েড তাই এই রোগিনীব রোগের ইতিহাস লিখে ফেলেন। উদ্দেশ্য যেন এই ছিল যে তিনি এই ইতিহাস ডাঃ 'ম'-এর কাছে পাঠাবেন যাতে ডাঃ 'ম' বুঝতে পারেন ফ্রয়েড ভুল চিকিৎসা করেন নি। এই রোগিণীর নাম ছিল আরমা (Irma)। ফ্রয়েড স্বপ্নটিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ

(ক) "একটি বড় হলঘর—অনেক অতিথিকে আমরা অভ্যর্থনা করছি" —কয়েকদিন আগে ফ্রয়েডের স্ত্রীর জন্মবার্ষিকী ছিল এবং তাঁর স্ত্রী তাই অনেক অতিথি আশা করেছিলেন। আরমারও আসবার কথাছিল।

(খ) "আমার দুবন···সেজন্য আপনিই দায়ী"—ফ্রয়েড বোধহয় আরমাকে একথা বলেছিলেন।

(গ) তিনি বললেন,···'আমার গলা ধরে আসছে।'—আরমার কোনরকম পেটের ব্যথা ছিল না। তাই স্বপ্নে আরমার পেটে ব্যথা দেখে ফ্রয়েডের অদ্ভুত লাগল।

(ঘ) "তাঁকে রক্তশূন্য এবং ফোলাফোলা মনে হলো।" আরমা কখনোই রক্তশূন্য এবং ফোলা ফোলা ছিলেন না। তাই ফ্রয়েড সন্দেহ করলেন যে অন্য কোন লোকের পরিবর্তে হয়তো তিনি আরমাকে স্বপ্নে দেখেছেন।

(ঙ) "মনে মনে ভাবলাম······লক্ষ্য করি নাই"—বায়ুরোগের

চিকিৎসকদের এমন একটা সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। যেটা বায়ুরোগ বলে মনে হচ্ছে সেটা জৈবিক কারণেও হ'তে পারে, এমন সন্দেহ বায়ুরোগের চিকিৎসকদের থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

(চ) "আমি তাঁকে জানালার ধারে···এমন না করলেও হ'ত।"—ফ্রয়েড কোন দিনই আরমার গলা পরীক্ষা করেন নাই। একবার তিনি এক ভদ্র-মহিলার গলা পরীক্ষা করেছিলেন বটে এবং তিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলেন। আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম। আরমার এক জানাশোনা ভদ্রমহিলা ছিলেন। এই ভদ্রমহিলাকে ফ্রয়েড প্রথমদিন স্বপ্নের মতই জানালার ধারে দেখেছিলেন এবং ডাঃ 'ম' তখন তাঁকে দেখে বলেছিলেন যে তাঁর ডিফ্‌থেরিয়া হয়েছিল। আরমার মতই এই ভদ্রমহিলাও মূর্ছারোগে ভুগছিলেন। স্বপ্নে আরমাকে রক্তশূন্য এবং ফোলা ফোলা মনে হচ্ছিল এজন্য যে ফ্রয়েডের এক রোগিণী দেখতে অনেক-টা ঐ-রকম ছিল। আরমা মাঝে মাঝে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেন, তাই তার পরিবর্তে স্বপ্নে ফ্রয়েড যাকে দেখলেন তিনিও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে-ছিলেন।

(ছ) "তিনি তখন···ধূসর বর্ণের দাগ দেখতে পেলাম।"—সাদা সাদা দাগ ডিফ্‌থেরিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল এবং ফলে আরমার বন্ধুর কথা মনে হচ্ছিল, কারণ আসলে তাঁরই এই রোগ হয়েছিল। নাকের গোলাকৃতি হাড় স্বপ্নে ফ্রয়েডকে তাঁর সত্যিকারের নাসিকার যন্ত্রণার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

(জ) "সঙ্গে সঙ্গেই···একই মন্তব্য করলেন।"—একবার ফ্রয়েড ভুলক্রমে এক রোগীকে ভুল ঔষধ দেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য পরে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ 'ম'-এর শরণাপন্ন হন। এ-ঘটনাই তিনি স্বপ্নে দেখলেন।

(ঝ) "ডাঃ 'ম'-কে···খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।"—ডাঃ 'ম' সত্যিকারেই এমন ছিলেন।

(ঞ) "আমার বন্ধু···নীরস জায়গা আছে।"—ফ্রয়েডের বন্ধু লিও-পোল্ড এবং ওটো চিকিৎসাবিজ্ঞানের একই শাখায় বিশেষজ্ঞ ছিলেণ। তাই তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা স্বাভাবিক ছিল। দু'জনেই ফ্রয়েডের অধীনে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। স্বপ্নের মত ঘটনা তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঘটত। এক রোগী দেখার সময় ফ্রয়েডকে লিওপোল্ড তার নীরস ক্ষয়রোগ-গ্রস্ত জায়গা দেখান।

(ট) "তিনি আরও···আক্রমণ হয়েছে।"—ফ্রয়েডের নিজের কাঁধে বাত ছিল। 'বাঁমকাধে আক্রমণ'—এ-কথা থেকে ক্ষয়রোগের সন্দেহ হতে পারে। এবং এ-থেকে উক্ত রোগিণীর ক্ষয়রোগের কথা মনে হতে পারে।

(ঠ) "(তাঁর পোষাক···তা' দেখলাম)"—এটা একটা লেজুড়ের মত স্বপ্নে সংযোজিত হয়েছে। হাসপাতালে শিশুদেরকে ফ্রয়েড উলঙ্গ অবস্থায় পরীক্ষা করতেন। তাই আরমার বন্ধুকে স্বপ্নে পরীক্ষা করার সময়ও এই কথা মনে হয়েছিল।

(ড) "ম বললেন ঃ '···বিষ চলে যাবে।' ডাঃ 'ম' বললেন ঃ 'তাতে কিছু না।' " এটা একটা স্বস্তির কথা। আরমাকে চিকিৎসা করার সময় আরমা দৈহিক ব্যথার কথা বলেন, তাই ফ্রয়েডের একটু খুঁৎখুঁতে ভাব ছিল। কেউ তাঁকে আশ্বস্ত করুক তাই তিনি মনে মনে তখন কামনা করতেন। স্বপ্নে ডাঃ 'ম'-কে এই স্বস্তির বাণী শুনাতে দেখলেন এই জন্যই। 'আমাশয় হবে এবং বিষ চলে যাবে' এ-ধারণার কারণ এই যে আমাশয়ে শরীরের অসুস্থকর জিনিস বেরিয়ে যায় বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পূর্বে একপ্রকার ধারণা ছিল। তাছাড়া, কিছুদিন আগে এক রোগীকে ফ্রয়েড স্বাস্থ্যের জন্য সমুদ্র-ভ্রমণে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু সমুদ্র-ভ্রমণেও অসুখ সেরে যায় নি এবং সেখানে এক ডাক্তার অনুমান করেন যে তার আমাশয় হয়েছে। এ-কথা শুনে ফ্রয়েডের ধারণা হয় যে সেই ডাক্তার ভুল বুঝেছেন। এতদ্ব্যতীত জার্মান ভাষায় আমাশয় এবং ডিফ্‌থেরিয়া শব্দদুটির প্রতিশব্দ দুটিও উচ্চারণের দিক থেকে অনেকটা একপ্রকার (Dysenterie এবং Diptherie)। সুতরাং আমাশয় অর্থে এই স্বপ্নে ডিফ্‌থেরিয়া বুঝতে হবে।

(ঢ) "আমরাও······অবহিত ছিলাম।"—লিওপোল্ডই এ-তথ্য আবিষ্কার করেন।

(ণ) "যখন তিনি···ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিয়েছিলেন"—ওটো ফ্রয়েডকে বলেছিলেন যে তিনি যখন আরমার পরিবারের সঙ্গে ছিলেন তখন একদিন একজন লোককে ইন্‌জেকশন দেবার জন্য তাঁকে ডাকা হয়।

(ত) "তাতে ছিল···প্রোপিনিক্‌ এসিড"—এই স্বপ্নের পূর্বের দিন ফ্রয়েডের স্ত্রী একটি মদের বোতল খুলেছিলেন তাতে লেখাছিল 'আনানাস'

(Ananas)। আরমার ডাকনামের উচ্চারণের সঙ্গে 'আনানাস' শব্দটির উচ্চারণের যথেষ্ট মিল আছে। এই মদের গন্ধ ছিল অনেকটা ফিউসেল তেলের মত। তাই তিনি এ-মদ খান নি। এই ফিউসেল তেলের গন্ধ থেকেই তাঁর মাথায় প্রোপাইল. মিথাইল. প্রোপিনিক এসিড ইত্যাদির কথা মনে হচ্ছিল। আর তাই স্বপ্নে তিনি এসব নাম দেখতে পান।

(থ) "ট্রাইমিথাইলএ্যামাইন"—ফ্রয়েডের এক বন্ধু যৌনচেতনার রাসায়নিক ভিত্তি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একবার তিনি তাঁকে বলেন যে যৌনচেতনার জৈবিক কারণগুলোর মধ্যে একটি হ'ল ট্রাইমিথাইলএ্যামাইন। এ-থেকে স্বপ্নে যৌনতার অবতারণা হ'ল। ফ্রয়েডের আবার ধারণা ছিল যে যৌনকারণেই বায়ুরোগ হয়ে থাকে। আরমা ছিলেন অল্পবয়স্কা বিধবা। তাই মনে মনে ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে যৌন অতৃপ্তার জন্যই তিনি বায়ুরোগে ভুগছেন। এখানে ট্রাইমিথাইলএ্যামাইনের সঙ্গে আরমার মিল আছে।

(দ) "এ-সব ইনজেক্শন···ঠিক নয়।"—অনেকটা ওটোর প্রতি তাঁর ভর্ৎসনা করার মনোভাব ছিল।

(ধ) "এবং সম্ভবতঃ···পরিষ্কার ছিল না।"—ওটোর প্রতি এটা আরও একটা অভিযোগ। স্বপ্নে পূর্বের দিন ফ্রয়েডের এক বৃদ্ধার ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই বৃদ্ধা ফ্লেবাইটিস-এ ভুগছিলেন। শুনেই তিনি অনুমান করেছিলেন যে এটা সম্ভবতঃ অপরিষ্কার নল দিয়ে ইন্‌জেকশন দে'য়ার ফলে হয়েছিল।

এইভাবে ফ্রয়েড স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করেছেন। স্বপ্নটি ফ্রয়েডের কয়েকটি ইচ্ছা চরিতার্থ করেছিল। একটি ইচ্ছা ছিল এই যে আরমার অসম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না, বরং ওটো দায়ী ছিলেন—এই ভাব প্রকাশ করা। এবং ফ্রয়েডের প্রতিটি অভিযোগ স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়েছিল। আরমার ঔদ্ধত্য ফ্রয়েডের ভাল লাগে নি, তাই তিনি স্বপ্নে তাঁর বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনি ওটোর প্রতি অভিযোগ থাকার দরুণ লিওপোল্ডের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। আরমার দৈহিক ব্যথার জন্য ফ্রয়েড দায়ী—এই ছিল ওটোর মনোভাব। ফ্রয়েড তা' মানতে রাজী নন। তাই তিনি বৃদ্ধার ফ্লেবাইটিস দেখলেন, কারণ এ-ফ্লেবাইটিসের জন্য ওটো দায়ী।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ফ্রয়েডের অন্যান্য স্বপ্ন-ব্যাখ্যা উল্লেখ না করে

এই স্বপ্নব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার সমস্ত মতবাদ বুঝতে চেষ্টা করলেই চলবে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে অন্যান্য স্বপ্নের উল্লেখ থাকবে।

৩

তৃতীয় অধ্যায়ের সারমর্ম ফ্রয়েড এই অধ্যায়ের শুরুতেই দিয়েছেন: "শিল্পীর হাতে শিঞ্জিত না হয়ে বাইরের কোন শক্তির দ্বারা আহত হয়ে বাদ্যযন্ত্র যেমন অনিয়মিতভাবে বেজে ওঠে, স্বপ্ন তেমন জিনিস নয়; স্বপ্ন অর্থহীন নয় বা উদ্ভট নয়; স্বপ্নের অর্থ এই নয় যে আমাদের চিন্তার ভাণ্ডারের একাংশ ঘুমিয়ে আছে এবং অপর অংশ জেগে উঠছে। পরন্তু, স্বপ্ন সম্পূর্ণ খাঁটি মানসিক ঘটনা—স্বপ্ন ইচ্ছার চরিতার্থতা। বোধগম্য, জাগ্রত মানসিক প্রক্রিয়ার শৃংখলে স্বপ্নকে জুড়ে দে'য়া যেতে পারে এবং স্বপ্ন অতি জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।" এই উদ্ধৃতির মধ্যে স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের অভিমত অনেকখানি ব্যক্ত হয়েছে। স্বপ্ন-ব্যাখ্যা পুস্তকে এমন গুরুত্ব পূর্ণ কথা খুব বেশী নেই।

স্বপ্নে আমরা যে ইচ্ছাপূরণ করে থাক এটা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। বিকেলে জলপাই জাতীয় ফল, ইত্যাদি যাতে লবণের ভাগ বেশী আছে খেলে রাত্রে তৃষ্ণা হবে এবং জলপান করে তৃষ্ণা দূর করা হচ্ছে এমন স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা থাকে। ফ্রয়েড বলেন যে তিনি পরীক্ষার ভিত্তিতে এধরনের স্বপ্ন নিজের ওপর বার বার সৃষ্টি করতে পারেন। তৃষ্ণার ফলে জল খাবার ইচ্ছা হবে এবং স্বপ্নে সেই ইচ্ছার পূরণ হবে। স্বপ্নে জল খেয়েই যদি তৃষ্ণা মেটানো যায়, তাহলে জেগে উঠে সত্যিকারের জলখাবার প্রয়োজন হয় না—একথা বলা যায় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদাহরণে ওটোর প্রতি প্রতিহিংসা ফ্রয়েড যেমন স্বপ্নে চরিতার্থ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, এক্ষেত্রে তেমন শুধু স্বপ্নে জল খেলেই হবে না, বাস্তবেও খেতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই স্বপ্নের উদ্দেশ্য হ'ল ইচ্ছা চরিতার্থ করা।

এই তত্ত্ব প্রমাণ করতেই শুধু ফ্রয়েড এই অধ্যায়ে অনেকগুলো স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা সেসব প্রমাণ না দেখেও ফ্রয়েডের স্বপ্ন সম্পর্কে এই অভিমত ধরে নিতে পারি যে স্বপ্ন হ'ল ইচ্ছার চরিতার্থতা। এই অধ্যায়ে ফ্রয়েড শুধু এই কথাই প্রমাণ করেছেন। অবান্তর হলেও এখানে একটা কথা উঠতে পারে যে পশুরা স্বপ্ন দেখে কিনা। এ সম্পর্কে ফ্রয়েড কিছুই

বলেন নি।" তবে তিনি বলেন যে যদি তারা স্বপ্ন আদৌ দেখে থাকে তাহলে তাদের স্বপ্নও ইচ্ছার চরিতার্থতা ভিন্ন আর কিছুই হবে না। হাঙ্গেরীর এক প্রবাদের কথা ফেরেনজি (Ferenzi) উল্লেখ করেছেন। প্রবাদটি এইরূপ : হাঁসেরা স্বপ্ন দেখে শুধু বাজরার।"

৪

পূর্বের অধ্যায়ে ফ্রয়েড বলেছের যে স্বপ্ন আমাদের ইচ্ছাকে কাল্পনিক ভাবে চরিতার্থ করে। অনেকে বলতে পারেন যে আমাদের কোন কোন স্বপ্নে আমরা ইচ্ছার চরিতার্থতা দেখতে পাই। সুতরাং এটা আর নতুন কি কথা? এ-কথা তো আগে অনেকেই বলে গেছেন। কিন্তু, আমাদের কোন কোন স্বপ্ন ইচ্ছার চরিতার্থতা—এ-কথা ফ্রয়েড বলেন নাই। তিনি বলেছেন যে আমাদের সবগুলো স্বপ্নই ইচ্ছার চরিতার্থতা। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, আমাদের উৎকণ্ঠা-পূর্ণ স্বপ্নগুলো* ইচ্ছার চরিতার্থতা কি করে হয়?

স্বপ্নের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন যে স্বপ্ন আমাদের ইচ্ছা, কল্পনা, ধারণা, ইত্যাদিকে বিকৃত (distortion) করে প্রকাশ করে। এই আমাদের আসল ইচ্ছার সঙ্গে স্বপ্নে যা দেখি তার কোন মিল সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বপ্ন তাই অদ্ভুত ও অসম্ভব বলে মনে হয়। স্বপ্ন আসল জিনিসটিকে অনুকরণ করে না। যেমন, ধরা যাক কারও প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা; স্বপ্নে হয়তো দেখলাম যে তাকে আমি খুব ভালবাসি। এমন অননুকরণ আমরা স্বপ্ন ছাড়াও করে থাকি। সভ্য সমাজে ভদ্রতার জন্য সবসময়ই অননুকরণ করা হচ্ছে। গ্যাঠের 'ফাউষ্টে' মেফিস্-স্টোফিলিস্ বলছে : "মোটের ওপর তুমি যা' জান তার সারাংশটুকু ছেলেদের কাছে বলা যায় না।" রাজনীতিবিদদের অনেক সময়ই অনুকরণ করতে হয়। আসল কথা সহজভাবে এবং অবিকৃতভাবে প্রকাশ করা সবসময় সম্ভব হয় না। তাই-ই এই অননুকরণের প্রয়োজন, কারণ তা' না হলে সমাজ, ব্যক্তি বা বিবেক আসল কথা সহজভাবে বলার জন্য বাধা দেবে। আর এই বাধা যত বেশী শক্তিশালী এবং সক্রিয় অননুকরণ তত বেশী হয়ে থাকে। আমরা আগেই দেখেছি যে অচেতন মনের অনেক জিনিস সচেতনমনে বেরিয়ে

*Anxiety Dreams.

আসতে চায় কিন্তু অধিশাস্তা তাকে বাধা দেয়। এইখানেই অননুকরণের প্রয়োজন। অননুকরণের ফলে অচেতনমনের জিনিসগুলো বিকৃত হয়ে বেরিয়ে আসে কিন্তু সচেতনমন সেগুলো সঠিক চিনতে পারে না বলে বাধা দেয় না। এতে লাভ এই যে অচেতনমনের জিনিসগুলো, বা বলা যেতে পারে ইচ্ছাগুলো ঠিকই বেরিয়ে আসলো, বা বলা যেতে পারে চরিতার্থ হ'ল, কিন্তু আসল জিনিসগুলো অবিকৃতভাবে বেরিয়ে আসলে সচেতনমনে আমরা যে কষ্ট পেতাম, সে কষ্ট থাকল না। স্বপ্ন-ক্রিয়া অধ্যায়ে আমরা এই অধ্যায়ের মূলকথাটি বিশেষভাবে বুঝতে পারব।

৫

এখন প্রশ্ন হ'ল কোন্ কোন্ জিনিস দিয়ে এবং কোন্ কোন্ উৎস থেকে স্বপ্ন উৎপন্ন হয়ে থাকে? ফ্রয়েডের আগেই আমরা এ-বিষয়ে তিনটি তত্ত্ব জানতাম:

(ক) স্বপ্নে অব্যবহিত পূর্বদিনের ঘটনাবলীর প্রভাবই বেশী থাকে।

(খ) জাগ্রত অবস্থায় বহির্জগতের ঘটনাবলী আমরা যেভাবে বেছে নেই (অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে) স্বপ্নে তেমন করি না। স্বপ্নে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জিনিস বলে কিছু নাই। বরং জাগ্রত অবস্থায় যেগুলো অপ্রয়োজনীয় জিনিস বলে আমরা দৃক্‌পাত করি না, স্বপ্নে সেইসব জিনিস এসেই ভিড় করে।

(গ) স্বপ্নে অতীত দিনের স্মৃতিও এসে হাজির হয় এবং অনেক সময় শৈশবের ঘটনাবলীও এসে ভিড় করে।

কিন্তু ফ্রয়েডের সঙ্গে পূর্বসূরীদের পার্থক্য এই যে তাঁরা স্বপ্নের শুধু বাহ্যিক প্রকাশিত বস্তুটিকে (manifest content) উপরিউক্ত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, আর ফ্রয়েড এই তিনটি দিক থেকে স্বপ্নের গূঢ়তর আন্তর দিকটি (latent content) আলোচনা করেছেন।

জাগ্রত অবস্থায় যে সব জিনিস নিরপেক্ষ বলে মনে হয় (যে সব জিনিসের প্রতি আমাদের উৎসাহ নাই অথবা বিকর্ষণ নাই) সেই সব জিনিস এবং সমকালীন ঘটনাবলীই স্বপ্নের উৎসের একটি কারণ। দু'একটি উদাহরণ নেয়া যাক। সবগুলো স্বপ্নই ফ্রয়েডের নিজস্ব।

(ক) "এক বাড়ীতে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে ভেতরে ঢুকতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল।... ; এই অবসরে এক ভদ্রমহিলাকে আমি অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।" উৎস ঃ—পূর্বের সন্ধ্যায় ফ্রয়েড এক আত্মীয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথায় কথায় ফ্রয়েড তাঁকে বলেছিলেন যে যে জিনিসটি তিনি কিনতে চান তার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

(খ) "কোন এক জাতের গাছের ওপর আমি একটি রচনা লিখেছি।" উৎস ঃ—ঐদিন সকালে ফ্রয়েড এক বইয়ের দোকানে সাইক্লামেন (cycla-men) জাতের গাছের ওপর লেখা একটি **রচনা** দেখেছিলেন।

(গ) "রাস্তায় এক **মা** ও তাঁর মেয়েকে দেখেছিলাম। মেয়েটি আমার চিকিৎসাধীন ছিল।" উৎস ঃ—পূর্বের সন্ধ্যায় ফ্রয়েডকে এক রোগিনী বলেছিলেন যে তার **মা** কিছুতেই তার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে দেবে না।

তুচ্ছ নিরপেক্ষ জিনিস শুধু স্বপ্নেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে পরিণত হয়, একথা ঠিক নয়। জাগ্রত অবস্থায়ও এমন ঘটনা অনেক ঘটে থাকে। তুচ্ছ নিরপেক্ষ জিনিসে জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা অনেক সময় মানসিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। ফ্রয়েড বলেছেন ঃ যখন দেখি কোন অনূঢ়া মধ্যবয়স্কা রমণী কোন গৃহপালিত পশুর প্রতি তার অনুরাগ প্রেরণ করে, অথবা কোন অকৃতদার পুরুষ কোনকিছুর উৎসাহী সংগ্রাহক হয়ে যায়, অথবা যখন কোন সৈনিক তার বুকের রক্ত দিয়ে একটুকরো রঙ্গিন ন্যাকড়ার পতাকাকে রক্ষা করে, যখন করমর্দনে কয়েক মুহূর্ত্ত বাড়তি চাপ প্রেমিকের অপার আনন্দের কারণ হয় অথবা যখন দোথ ওথেলো নাটকে একটি হারাণো রুমাল ক্রোধবহ্নি জ্বালিয়ে দেয়—তখন ঐ যে মানসিক অভিক্রান্তির (Displacement) ক্ষেত্র সে বিষয়ে আমাদের কোন অভিযোগ থাকে না।

স্বপ্নের উৎস হিসেবে বিভিন্ন রকম উদ্দীপক থাকতে পারে। কিন্তু একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার ফলে স্বপ্নে সমস্ত উদ্দীপকগুলো একটি অভিনব পটে পরিণত হয়। স্বপ্নে নিরপেক্ষতা বলে কিছু নাই, সবটাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই স্বপ্নকে 'নিরপরাধ' বলা চলে না। আপাততঃ 'নিরপরাধ' স্বপ্নগুলোতেই যৌনতা বর্তমান, তবে এগুলো নিরপরাধ মনে হয় এজন্য যে প্রতিবন্ধক প্রহরী (censor) যৌনতাকে সরাসরি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হতে দেয় নি, যৌনতা এখানে কৃত্রিম এবং মুখোশপরা অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছে। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

স্বপ্নের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এতে এমনকি শৈশবের স্মৃতিরাজিও এসে ভিড় করতে পারে। স্বপ্নের এই বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করতে ফ্রয়েড অনেকগুলো স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন। শৈশবের স্মৃতিগুলো যখন স্বপ্নে এসে হাজির হয় তখনও আমাদের স্বপ্নের অপর বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে। স্বপ্নে অবান্তর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে কিছু নাই, সবই সমান। স্মৃতি যদি স্বপ্ন গঠনে সহায়তা করে, তবে এটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে শৈশবের স্মৃতিও স্বপ্ন গঠন করবে, কারণ আমরা জানি, মস্তিষ্কে কোন জিনিসের ছাপ একবার পড়লে তা' কোনদিনই একেবারে চলে যেতে পারে না। তার তীব্রতা কমে আসতে আসতে স্তিমিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কোনদিনই সম্পূর্ণ মুছে যেতে পারে না। সুতরাং এইসব ঝাপসা হয়ে আসা স্মৃতিরাশিও স্বপ্ন গঠন করবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

স্বপ্ন গঠনে শারীরিক উৎসের কথা বইএর প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে। এ-সম্পর্কে ফ্রয়েডের পূর্বসূরীরা সম্যকভাবে জ্ঞাত ছিলেন। পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য এইজন্য যে পূর্বসূরীরা শারীরিক উৎসকেই একমাত্র উৎস বলে ধরে নিতেন, আর ফ্রয়েড একে একটি উপাদান মাত্র বলে মানতেন। ফ্রয়েডের কথা হল, দৈহিক উদ্দীপনা স্বপ্নে নানা সময়ে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। কোন কারণ ব্যাতিরেকে এমন হতে পারে না। এবং একই কারণে দৈহিক উপাদানকে স্বপ্নের একমাত্র উপাদান বলা চলে না। এ-সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতামত এই ঃ ফ্রয়েডের মতে পূর্বদিনের সমকালীন এবং সুখদুঃখ নিরপেক্ষ অনুভূতি যেমন স্বপ্ন গঠনে সহায়তা করে ; ঘুমন্ত অবস্থায় দৈহিক উদ্দীপকগুলো (অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে সংবেদনগুলো), খুব বেশী তীব্র না হলে, ঠিক সেই ভাবেই কাজ করে। তাঁর বিশ্বাস, স্বপ্নের মানসিক উৎস থেকে আগত ভাবনাগুলির বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে খাপ খেলেই কেবল নয়। এইসব দৈহিক উপাদানগুলো স্বপ্নগঠনের সাহায্যে আনা যেতে পারে ; অন্যথায় এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। একদা তিনি অনুভূতি প্রকাশে বাধা দিলে কেমন লাগে তাই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, কোন ঘটনা দেখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বলাতে কি বোঝায় অথবা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে কিছু করতে না-পারা অবস্থায় এসে দাঁড়ালে মনের ভাব কেমন হয়—এইসব ভাবছিলেন। সেইদিনই তিনি স্বপ্ন দেখলেন ঃ

"আমি অসম্পূর্ণভাবে পোষাক পরেছিলাম এবং একদম নীচের তলায় একটি ফ্ল্যাট্ থেকে ওপরে উঠছিলাম। আমি একবারে তিনধাপ সিঁড়িতে উঠছিলাম এবং আমার তৎপরতা দেখে আমি উৎফুল্ল হয়েছিলাম। হঠাৎ এক পরিচারিকাকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে দেখলাম। ও আমার দিকেই আসছিল। আমার লজ্জা-লজ্জা বোধ হচ্ছিল এবং তাই তাড়া করে চলে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আমার আবেগ অবরুদ্ধ হলে যেমন হয় তেমন ভাব হল—আমি যেন সিঁড়ির ধাপগুলোর সঙ্গে (ছবির মত) সেঁটে রইলাম, ঘটনাস্থল থেকে একচুলও সরে যেতে পারছিলাম না।"

স্বপ্নটির ব্যাখ্যা ফ্রয়েড এরূপ করেছেন :—তিনি তাঁর ফ্ল্যাট থেকে সকালে প্রায়ই ওপরের ফ্ল্যাটে গিয়ে বেড়িয়ে আসতেন। এসময়ে তিনি যত্নসহকারে পোষাক পরতেন না এবং একেবারে তিনধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন। পরিচারিকার সঙ্গেও মাঝে মধ্যে দেখা হ'ত। স্বপ্নে যত্নসহকারে পোষাক না পরার একটি অর্থ যৌনতা এবং পরিচারিকার উপস্থিতি এ-ধারণাকে সমর্থন করতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটি অন্যরকম। পরিচারিকা তাঁর চেয়ে বয়েসে অনেক বড় একং চিত্তাকর্ষক কিছু নয়। আসল ঘটনাটি এই : সকালে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তাঁর খাকানি দিয়ে গলা পরিষ্কার করার অভ্যাস ছিল। কিন্তু কাছে কোন থুকদানি না থাকায় বাধ্য হয়ে সিঁড়িতেই তাঁকে থুথু ফেলতে হত। পরিচারিকা এতে ভীষণ আপত্তি করতো, যদিও আভাসে-ইঙ্গিতে। এতে তিনি বেশ বিব্রত এবং লজ্জা বোধ করতেন। অপরপক্ষে পূর্বের দিন তিনি ভাবছিলেন আবেগ অবরুদ্ধ হলে কেমন লাগে। তাই তিনি দৈনন্দিন অতি সাধারণ ঘটনার মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারাকে স্বপ্নে প্রকাশিত দেখলেন। এমনিভাবে মানসিক প্রক্রিয়া এবং ভাবধারার সঙ্গে যখন কোন দৈহিক অনুভূতি এবং তুচ্ছ ও নিরপেক্ষ সমসাময়িক ঘটনা মিলে যায় তখনই কেবলমাত্র স্বপ্ন গঠনে সহায়তা করতে পারে।

কতকগুলো বিশেষ ধরনের স্বপ্ন (typical dreams) সম্বন্ধেও ফ্রয়েড আলোচনা করেছেন। একটি কথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বপ্ন সংগঠন করে থাকে। এ-ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন। তাই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গেলে

সেই ব্যক্তির বিশিষ্ট ভাবনারাজী সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমন কতকগুলো স্বপ্ন আছে, সেগুলো প্রত্যেক ব্যক্তিতেই প্রায় একইভাবে হয়ে থাকে এবং তাদের ব্যাখ্যাও প্রায় একই। এ-সব স্বপ্নের আলোচনা করলে আমরা স্বপ্নের উৎস সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে পারব।

উলঙ্গ হওয়া এধরনের একটি স্বপ্ন। স্বপ্নে উলঙ্গ অবস্থায় আছি এবং তাই লজ্জাবোধ হচ্ছে—এই বোধ আমাদের ঘটে থাকে। ফ্রয়েড এটাকে প্রদর্শনের ইচ্ছা (exhibitionism) বলেছেন। শৈশবে উলঙ্গ থাকলেও লজ্জাবোধ হয় না, যেমন নাকি স্বর্গের অধিবাসীরা উলঙ্গ থাকলেও লজ্জা-বোধ করেন না। শৈশবের সেইদিনগুলো ফিরে পাবার ইচ্ছা থেকেই আমাদের স্বর্গের ধারণা এসেছে। আর একপ্রকার বিশেষ ধরনের স্বপ্ন হল আমরা যাদেরকে ভালবাসি তাদের মৃত্যু দেখে থাকি। এ-সব স্বপ্নের অর্থ এই যে আমরা সেইসব ব্যক্তিদেরকে হয়তো অনেকদিন দেখি না এবং তাই তাদেরকে মনে মনে খুব দেখতে ইচ্ছা হয়: অথবা এর অর্থ এই হতে পারে যে আমাদের আশংকা আছে যে তারা মরে যেতেও পারে। আমাদের ধারণা এই যে আমরা আমাদের ভালবাসার পাত্রের মৃত্যুর কথা চিন্তাও করতে পারি না। কিন্তু ফ্রয়েড দেখিয়েছেন কিভাবে ছেলে বাবার এবং ভাই ভাইয়ের মৃত্যু কামনা করে। মায়ের স্নেহের অংশ দাবী করে বলে ভাই ভাইয়ের মৃত্যু কামনাও করতে পারে। আবার ঈডিপাস এষনার জন্য ছেলেও বাবার মৃত্যু কামনা করতে পারে। এই উপলক্ষে ফ্রয়েড শেকস্‌পীয়রের হ্যামলেট নাটকের ব্যাখ্যা করেছেন। হ্যামলেট চিন্তার দ্বারা অভিভূত ও নিষ্পেষিত ছিলেন। তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল এই: একদিকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার ছিল তাঁর নেশা, অপরদিকে তাঁর ঈডিপাস এষণা তাঁকে নির্জ্ঞানমনে বলে দিত যে তাঁর বাবার হত্যাকারী তাঁরই মনের বাসনা (বাবার মৃত্যু) চরিতার্থ করেছে মাত্র এবং সেইজন্য তাঁর বাবার হত্যাকারীকে মেরে ফেললে সে আত্মপীড়নে ভুগবে। তাঁর মৃগীরোগীর মত ব্যবহার মনোবিজ্ঞান সম্মত। যৌনতার প্রতি তাঁর নির্লিপ্ততাও স্বাভাবিক। ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে কবি তাঁর নিজেকেই নাটকে ব্যক্ত করেছে। যৌনতার প্রতি নির্লিপ্ততা তাঁর টিমন অফ্ অথেন্স-এও লক্ষণীয় এবং এই নাটকও সমসাময়িক। ফ্রয়েডের মতে হ্যামলেট ঈডিপাস এষণার নাটক। হ্যামলেট ও ম্যাকবেথ সমসাময়িক নাটক। উভয়েই

শেকস্‌পীয়রের বাবার মৃত্যুর পর লেখা হয়। প্রথম নাটকে আমরা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক দেখতে পাই আর দ্বিতীয়টিতে পিতাকে পুত্রহীন দেখি (শুধু তিন কন্যাকে দেখা যায়)। ঈডিপাস এষণার প্রমাণস্বরূপ ফ্রয়েড উল্লেখ করেন যে সোলনের (Solon) আইনবিধিতে পিতৃহত্যার কোন শাস্তি বিহিত ছিল না।

তৃতীয় বিশেষ রকমের স্বপ্নে আমরা আমাদেরকে বাতাসে ভাসতে দেখি। শিশুকে আদর করতে গিয়ে বড়রা অনেক সময় তাকে হাত বা পা ধরে শূন্যে দোলাতে থাকে। বড় হলে তাই অনেকে শূন্যে ভাসার স্বপ্ন দেখে থাকে। কিন্তু আসলে এধরনের স্বপ্নের সঙ্গে যৌনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে প্রথম যৌন চেতনার সঙ্গে ছোটবেলায় দোলখাওয়া, লম্ফ-ঝম্ফ, কোন কিছু বেয়ে ওপরে ওঠা, ইত্যাদির সম্পর্ক আছে : অর্থাৎ এইসব কাজ করার সময়ই বালক-বালিকারা প্রথম যৌনতা বোধ করে। তাই স্বপ্নে শূন্যে ভাসার সঙ্গে যৌনতার যোগ-সূত্র আছে।

চতুর্থ এবং শেষ রকমের বিশেষ স্বপ্নে আমরা নিজেদেরকে পরীক্ষার হলে দেখতে পাই। অদ্ভুত ব্যাপার যারা পরীক্ষায় পাশ করে গেছে তারাই সাধারণতঃ এ-ধরনের স্বপ্ন দেখে, যারা পাশ করেনি তারা দেখে না। ষ্টেকেলের উদ্ধৃতি দিয়ে ফ্রয়েড বলেছেন যে এ-ধরণের স্বপ্নের সঙ্গে 'যৌন-পরীক্ষা' বা 'যৌনতা-প্রাপ্তি'র সম্পর্ক আছে। উদাহরণ স্বরূপ ষ্টেকেল বলেছেন যে 'matriculation' এবং 'matura' (যৌনতার দিক দিয়ে) এই দুটি শব্দের মধ্যে যেমন ধ্বনিগত মিল আছে তেমনি আছে অর্থগত মিল।

৬

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বপ্ন-চেতনায় প্রকাশিত বিষয় (manifest content) নিয়ে আলোচনা করেছি। বাইরে থেকে স্বপ্নকে যেভাবে দেখা যায় তারই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বপ্নের আরও একটি দিক আছে, যাকে আমরা বলি প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্লীন বিষয় (latent content)। এই দ্বিতীয় বিষয়টিকে আবার স্বাপ্ন-চিন্তাও (dream-thought) বলা হয়। স্বাপ্ন চিন্তা বা অন্তর্লীন বিষয় এবং চেতনায় প্রকাশিত বিষয় একই

ছবির পৃষ্ঠা সেই মুহূর্তে উল্টাচ্ছিলাম। ঐ বই-এর সঙ্গেই ছিল গাছটির একটি নমুনা।''

স্বপ্নটির মধ্যে বিশেষভাবে জোর ছিল 'উদ্ভিদজাতীয় রচনার' ওপর। স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করলে দেখা গেল যে এই ধারণাটির সঙ্গে ফ্রয়েডের অনেক-গুলো ধারণা জড়িয়ে আছে। কোকেন নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। 'উদ্ভিদজাতীয় রচনার' সঙ্গে এর মিল আছে। এর সঙ্গে মিল আছে তাঁর পরিচিত অধ্যাপক গার্ডনারের, কারণ ভাষাগত দিক দিয়ে বিচার করলে গার্ডনারের অর্থ বাগানরক্ষক এবং সেই জন্য 'উদ্ভিদজাতীয় রচনার' সঙ্গে মিল আছে। গার্ডনারের ফুটন্ত বা ফুলের মতো স্ত্রীর কথাও ফ্রয়েডের মনে ছিল। তেমনি ছিল ফ্লোরা (উদ্ভিদ) নামক এক রোগিণীর কথা। কয়েকদিন আগেই এই রোগিণীর কাছে তিনি ফুল নিয়ে একটি গল্প বলেছিলেন। যাহোক, এমনিভাবে অনেকগুলো ধারণা স্বপ্নের 'উদ্ভিদজাতীয় রচনার' মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে স্বপ্নের উপাদানের সঙ্গে স্বাপ্নচিন্তার অনেকভাবে মিল খুঁজে দেখা আগেই হয়েছিল। আবার একই স্বাপ্নচিন্তা স্বপ্নে বিভিন্ন জিনিসের বা উপাদানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। ভাবানুষাঙ্গিক পথে একটি স্বপ্ন-উপাদান অন্যান্য স্বপ্ন-উপাদানের অবতারণা করে। এই ভাবে একটি স্বপ্ন একটি অথবা কতকগুলো স্বপ্নচিন্তার দ্বারা ঘটে থাকে না, যেমন করে নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এক এক নির্বাচনী এলাকা থেকে ; বরং যেসব স্বাপ্নচিন্তার সবচেয়ে বেশী এবং শক্তিশালী সমর্থন (ভাবানুষঙ্গ) আছে সেইগুলোই স্বপ্নে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সমস্ত স্বাপ্ন-চিন্তার সমষ্টি থেকেই স্বপ্ন তৈরী হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি স্বপ্ন-উপাদানের সঙ্গে স্বাপ্নচিন্তার আগেই অনেকবার সচেতন বা অসবচেতন মনে ভাবানুষঙ্গ হয়ে থাকে।

(খ) সংক্ষেপন পদ্ধতির আলোচনার সময় আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি যে স্বাপ্নচিন্তা এবং স্বপ্নের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আছে। স্বাপ্ন-চিন্তাতে আমরা যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকি স্বপ্নে হয়তো দেখা গেল তার গুরুত্ব মোটেও নাই আবার যেটিকে স্বাপ্নচিন্তায় তুচ্ছ মনে করে থাকি স্বপ্নে (প্রকাশিত বিষয়ে) হয়তো সেটিই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্নের এই পদ্ধতিকে অভিক্রান্তি স্থানান্তরকরণ বা

displacement বলা হয়। একটু আগেই যে স্বপ্নটির কথা আলোচনা করা হয়েছে সেখানে প্রকাশিত বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে 'উদ্ভিদজাতীয় রচনার' গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। আসলে কিন্তু স্বাপ্নচিন্তায় ফ্রয়েডের সঙ্গে তার সহকর্মীদের সম্পর্কই বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

(গ) স্বাপ্নচিন্তাকে কিভাবে প্রকাশিত বিষয়ে (স্বপ্ন উপাদানে) রূপ দে'য়া হয়, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে ফ্রয়েডের বড় অবদান আছে। প্রথমতঃ, টুকরো টুকরো স্বপ্নবিষয়কে স্বপ্নে কি ভাবে গাঁথা হয়? এখানে একটি প্রশ্ন ঃ 'যদি', 'কারণ', 'ঠিক যেন', 'যদিও', 'হয় এটা না হয় ওটা',—এই জিনিসগুলো স্বপ্নে কিভাবে উপস্থাপিত হয়? ফ্রয়েড বলেছেন যে স্বপ্নে এ-সব কিছুই থাকে না। স্বপ্নে আসল জিনিসগুলো শুধুমাত্র উপস্থাপিত হয়ে থাকে। শুধু স্বপ্নেই যে এমনি ঘটে তা নয়। কবিতা এবং শিল্পেও আমরা এ-সব জিনিস অনেক সময় উপেক্ষা করে থাকি। অতীতকালে শিল্পীরা কোন মানুষের মূর্ত্তিতে ভাব ফুটিয়ে তুলতে না পারলে, তার মুখের কথা একটি আলাদা পাত্‌লা জিনিসে লিখে সেই মূর্ত্তির মুখে লাগিয়ে দিত। স্বপ্নেও আমরা অনেকটা অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি। তবুও স্বপ্নে এগুলো প্রকাশ করার কিছু কিছু উপায় আছে যুক্তি-যুক্ততাকে (logical connection) কালের সাম্প্রতিকতা দিয়ে স্বপ্নে বোঝান হয়। শিল্পীরাও অনেক সময় এমন করে থাকে। 'ab'—কে আমরা একবারে উচ্চারণ করি এবং একটি শব্দ হিসেবে ধরে নেই, কিন্তু 'a' এবং 'b' একটু দূরে থাকলে আমরা ধরে নেই যে 'a' পূর্ববর্ত্তী শব্দের শেষের অক্ষর এবং 'b' পরবর্ত্তী শব্দের প্রথম অক্ষর। স্বপ্নেও এমন ব্যাপার হয়ে থাকে।

কার্য্যকারণ সম্পর্কও স্বপ্নে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ স্বপ্নে দুটি অংশ থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বড় অংশটিকে কার্য্য বা 'ফল' ধরে নিতে হবে, এবং ছোট অংশটিকে ভাবতে হবে 'কারণ' হিসেবে। 'হয় এটা না হয় ওটা' এমন ব্যাপার স্বপ্নে এই ভাবে প্রকাশিত হয় যে উভয় অংশই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাদৃশ্য, সমান বৈশিষ্ট্যপূর্ণতা, ইত্যাদিও প্রকাশিত হতে পারে। এ-সবক্ষেত্রে দুটি বা ততোধিক জিনিসকে এক করে দেখা হয়ে থাকে। 'ক' এরও আমার প্রতি যেমন ঘৃণাভাব, 'খ'-এরও তেমনি আমার প্রতি ঘৃণাভাব—এ-জিনিসটিকে আমরা স্বপ্নে এ-ভাবে দেখি ঃ 'ক' এবং 'খ'

উভয়েরই আমার প্রতি ঘৃণাভাব এবং স্বপ্নে 'ক' এবং 'খ' দু-ব্যক্তি না দেখে আমরা এমন লোক দেখি যার মধ্যে 'ক' এবং 'খ' উভয়েরই সাদৃশ্য আছে।

(ঘ) এতক্ষণ আমরা স্বাপ্নচিন্তা ও স্বপ্নের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা দেখেছি যে স্থানান্তর করণের মধ্য দিয়ে স্বপ্নে আমরা কোন বস্তুর নতুনভাবে মূল্যায়ন করে থাকি। অর্থাৎ স্বাপ্নচিন্তায় যার গুরুত্ব বেশী তাকে হয়তো কম গুরুত্ব দিয়ে থাকি, আবার যার গুরুত্ব কম তাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি। স্বপ্নের আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। স্বপ্নে আমরা সবকিছুই দেখে থাকি—আমাদের চিন্তা, কল্পনা, ইচ্ছা সবকিছুই দেখে থাকি অর্থাৎ ছবির মাধ্যমে সবকিছুর প্রকাশ দেখি। স্বপ্নবিষয়ের ব্যাখ্যা করতে আমাদের সমস্যা হ'ল—এগুলোকে কি সদর্থক অথবা নঞার্থক হিসেবে ধরা হবে? এগুলোকে কি ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হবে? এগুলোকে কি কতকগুলো ধারণার প্রতীক হিসেবে ধরা হবে? কিন্তু এতসব সমস্যা থাকলেও অধ্যবসায় সহকারে আমরা স্বাপ্নচিন্তার সঠিক ব্যাখ্যা নিশ্চয় করতে পারি।

স্বপ্ন-সৃজন-ক্রিয়া "Dream-work" কথাটির একটি বিশেষ মানে আছে। স্বপ্ন-সৃজন-ক্রিয়ায় (dream-work) প্রতীক (symbols) একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। হার্বার্ট সিলবারার (Herbert Silberen) একটি পরীক্ষা চালান। যখন তিনি পরিশ্রান্ত এবং নিদ্রালু অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি মানসিক কাজ শুরু করেন। তিনি দেখতে পান যে তাঁর সমস্ত চিন্তারাজি যেন উবে যাচ্ছে এবং তার পরিবর্তে কতকগুলো প্রতীক এসে হাজির হচ্ছে। ঠিক একই রকমভাবে স্বপ্নে প্রতীকের আবির্ভাব হয়ে থাকে।

সিলবারারের পরীক্ষা থেকে দুটি উদাহরণ দে'য়া গেল।

উদাহরণ—১ঃ "আমি একটি রচনার একটি অসরল অংশের স্মৃতির কথা ভাবছিলাম।"

প্রতীকঃ "আমি দেখলাম—আমি একটা অ-সরল কাঠের টুকরোকে সরল করছি।"

উদাহরন—৫ঃ "আমি যে-সব অধিবিদ্যা সম্বন্ধে পড়াশুনা করছিলাম সে-সবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি ভাবছিলাম। আমি ভাবছিলাম যে

এ-গুলোর উদ্দেশ্য হ'ল নিজে নিজেকে ক্রমাগবয়ে উন্নততর চেতনার জগতে অথবা অস্তিত্বে পৌঁছে দেয়া এবং এরই মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে অস্তিত্বের মূল সূত্রটি।

প্রতীক ঃ "আমি লম্বা ছুরি দিয়ে একটি পিঠে কাটছিলাম যেন আমি মাঝখান থেকে একটুকরো তুলে নেব এই ভেবে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে স্বপ্ন ভিন্নও আমরা প্রতীকের ব্যবহার দেখে থাকি। 'সোলমনের গানে' এমন অনেক প্রতীকের উল্লেখ দেখা যায়। সোলমনের গানে খুঁটিকে পা, তোরণকে শরীরের ছিদ্রপথ, ইত্যাদিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বপ্নেও আমরা ঠিক একইভাবে প্রতীকের ব্যবহারদেখতে পাই।

(ঙ) শুধু স্বপ্নেই এই প্রতীকের (symbols) ব্যবহার দেখা যায় তা নয়। লোকগাথা, উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, প্রবাদ বাক্য ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে প্রতীকের ব্যবহার দেখা যাবে। ষ্টেকেল স্বপ্নের অনেক-গুলো প্রতীকের ব্যাখ্যা বা পরিভাষা তৈরী করেছেন। হ্যাভলক্ এলিসও বলেছেন যে আমাদের স্বপ্ন প্রতীকে ভরা। তবে প্রতীকের ব্যাখ্যা করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় প্রতীককে সোজাসুজি-ভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, প্রতীক হিসেবে নয়। আবার স্বপ্নে আমরা অনেক-গুলো প্রতীক থেকে একটি প্রতীক নিয়ে আমাদের স্বপ্নচিন্তাকে প্রকাশ করি। স্বপ্নের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে খাপ খাইয়েই এই প্রতীক বেছে নি।

ফ্রয়েডের মতে রাজা বা রাণী বা অনুরূপ জিনিস বা ব্যক্তি পিতামাতার প্রতীক। রাজকুমার বা রাজকুমারী নিজেকে বোঝায়। লম্বা ধরনের কোন জিনিস, যেমন ছুরি, গাছের গুঁড়ি, ছাতা ইত্যাদি পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক; অনুরূপভাবে লম্বা অস্ত্র, যেমন চাকু, ছুরি, ইত্যাদিও পুংজন-নেন্দ্রিয়ের প্রতীক। আবাব বাক্স, কাপবোর্ড, চুল্লি, ইত্যাদি জরায়ুর প্রতীক। অনুরূপভাবে যে কোন ফাঁকা জিনিস, যেমন জাহাজ ইত্যাদি স্ত্রী জননেন্দ্রি-য়ের প্রতীক। কোঠা, ঘর, ইত্যাদিতে স্ত্রীলোক বুঝতে হবে। মই, সিঁড়ি, সিঁড়িবেয়ে ওঠানামা, ইত্যাদি মৈথুনের প্রতীক। কাষ্ঠ স্ত্রীলোকের প্রতীক। বিছানা বিয়ে বোঝায়। ক্রিমিজাতীয় পোকার দ্বারা স্বপ্নে উত্যক্ত হতে দেখলে গর্ভবতী হবার কথা বুঝতে হবে। স্বপ্নে শূন্যে ভাসতে দেখলে যৌন উত্তেজনা বোঝাবে। 'তিন' এই সংখ্যা পুং জননেন্দ্রিয় বোঝায়—কারণ হয় তো এই যে এখানে তিনটি জিনিস থাকে।

ষ্টেকেলের মতে দক্ষিণ দিক নৈতিক দিক থেকে সঠিক অর্থাৎ নৈতিকতা এবং বামদিক অর্থনৈতিকতা বোঝায়। ফ্রয়েড তাঁর বই 'Introductory Lectures on Psycho-analysis'-এ বিস্তৃতভাবে স্বপ্নের প্রতীকের (symbol) আলোচনা করেছেন।

স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে মতামত তা' বেশীর ভাগই তাঁর রোগীদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে (সমীক্ষণের মাধ্যমে) পাওয়া গেছে। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই সমস্ত প্রতীক সুস্থ লোকের স্বপ্নের বেলায় খাটবে কিনা। ফ্রয়েড নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে সুস্থলোকের বেলাতেও তাঁর প্রতীকবাদ একইভাবে প্রযোজ্য। কারণ আমরা জানি যে মনস্তত্ত্বের মতে সুস্থ মানসিক দিক থেকে অসুস্থব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য মাত্র পরিমাণগত।

(চ) স্বপ্নে কোন শব্দের বানানের চেয়ে উচ্চারণের গুরুত্ব বেশী। স্বপ্নে প্রায়ই শব্দের উচ্চারণ নিয়ে বিভিন্ন অর্থ করা হয় (pun)। আবার স্বপ্নে আমরা অনেক সময় কথাও বলে থাকি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বপ্ন-সৃজন-ক্রিয়া (dream work) কোন প্রকার ভাষণের অবতারণা করে না। তবুও যতটুকু কথা আমরা স্বপ্নে বলে থাকি সেটুকু আসলে আমাদের স্বপ্ন-চিন্তাতে আগেই ছিল এবং সেই কথাটুকু আগে আমরা হয় বলেছি না হয় শুনেছি।

(ছ) এতক্ষণ আমরা স্বপ্নক্রিয়ার তিনটি উপাদানের কথা আলোচনা করেছি। এই তিনটি উপাদান হল—সংক্ষেপন, অভিক্রান্তি (displacement), এবং প্রদর্শনপদ্ধতি (representation)।

প্রদর্শনপদ্ধতিতে প্রতীকবাদ ছাড়াও আরও কিছু উপায় আছে। যাহোক, এই তিনটি উপাদান এবং আরও একটি উপাদান অথাৎ গৌণ বিস্তৃতি (secondary revision)—এই চারটি উপাদান ভিন্ন স্বপ্নক্রিয়ায় আর কোন উপাদান নাই। প্রথম তিনটিকে একত্রে মুখ্য বিস্তৃতি (primary elaboration) বলা হয়। অনুরূপভাবে শেষেরটিকে গৌণ বিস্তৃতি (secondary elaboration) বলা যেতে পারে। গৌণ বিস্তৃতি পরে আলোচনা করা যাবে। তার আগে স্বপ্নে বুদ্ধিগত ক্রিয়া থাকতে পারে কিনা লক্ষ্য করা যাক।

এ-সম্পর্কে ফ্রয়েড বলেছেন : স্বপ্নে যা স্পষ্টভাবে বিচার-বিবেচনা বলে মনে হয় তাকে স্বপ্ন-সৃজন-ক্রিয়ার বুদ্ধিগত কাজ বলে মনে করা উচিৎ নয়।

সেগুলো বরং স্বাপ্ন-চিন্তার বিষয়বস্তু এবং স্বাপ্ন-চিন্তা থেকে এ-গুলোকে তৈরী জিনিস হিসেবে নে'য়া হয়। এমনকি স্বপ্ন দেখার পর জেগে আমরা স্বপ্ন সম্পর্কে যে-মত পোষণ করি এবং আমাদের যে-অনুভূতি হয় তাও প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্লীন বিষয়ের (latent content) অংশ বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং এ-গুলোকেও স্বপ্ন-ব্যাখ্যার মধ্যে বিবেচনা করতে হবে।

(জ) স্বপ্নে একটি মজার জিনিস আছে। স্বপ্নে ডাকাত দেখে হয়তো আমি ভয় পেলাম। এখানে ডাকাত মিথ্যে হতে পারে কিন্তু আমি যে ভয় পেলাম তা' সত্যি।

(ঝ) এবার স্বপ্নের চতুর্থ উপাদানটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। অনেক সময় দেখা যায় যে স্বপ্নেই আমরা বেশ বুঝতে পারি যে আমরা স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন দেখে আমরা হয়তো অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম (দুঃখ বা ভয় পেয়েছিলাম) ; এবং তাই স্বপ্নেই হয়তো বলে উঠলাম, "এতো স্বপ্নমাত্র"। এ-কথা বলে যেন দুঃখ বা ভয় থেকে নিস্তার পাই। ফ্রয়েড বলেছেন যে প্রহরী অর্থাৎ অধিশাস্তা এবং অহং-এর যে অংশ মানসিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটা অচেতনমনের অদস্ (Id)-কে কিছুতেই বাইরে আসতে দিতে চায় না। কিন্তু তার অলক্ষ্যে যদি কখনো অদস্-এর এষণা বাইরে এসেই পড়ে তা'হলে স্বপ্নে আমরা দুঃখ পেতে পারি এবং ফলে আমাদের ঘুম ব্যাহত হতে পারে। তাই আমাদের ঘুম যাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য আমাদের মানসিক ক্রিয়া স্বপ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বলে ঃ "এতো স্বপ্নমাত্র"।

এই জিনিসটি থেকেই ফ্রয়েড স্বপ্নের চতুর্থ উপাদানের অস্তিত্বে উপনীত হ'ন। তিনি বলেন যে আমাদের মানসিক ক্রিয়াও স্বপ্ন গঠনে কাজ করে থাকে। মানসিক ক্রিয়া স্বপ্নের এই চতুর্থ উপাদন। শুধু স্বাপ্নচিন্তা থেকেই স্বপ্নের উৎপত্তি হয় না, এর সঙ্গে থাকে মানসিক ক্রিয়ার অবদান। স্বাপ্নচিন্তা প্রহরীর উপস্থিতির জন্য পরিবর্ত্তিত এবং হ্রাসপ্রাপ্ত অথবা পরিবর্দ্ধিত অবস্থায় প্রকাশিত হয় স্বপ্নাকারে। তেমনিভাবে মানসিক ক্রিয়াও স্বপ্নকে পরিবর্ত্তিত করে থাকে। এই মানসিক ক্রিয়ার কাজ অনেকটা দার্শনিকদের মত। দার্শনিকরা যেমন বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারের শূন্য অংশ পূর্ণ করে কল্পনা দিয়ে বা শুধু যুক্তি দিয়ে, তেমনি স্বপ্নের ঘটনা পরম্পরায় যদি কোন শূন্য স্থান থাকে তাহলে মানসিক ক্রিয়া ঐ অংশগুলো

পরিপূর্ণ করে থাকে। তাই জাগ্রত অবস্থার চিন্তার সঙ্গে মানসিকক্রিয়ার পার্থক্য নাই। মানসিকক্রিয়া স্বপ্নকে যৌক্তিকতা দান করে, পূর্ণ করে এবং সুসংবন্ধ করে অতিরিক্ত ঘটনাবলি দিয়ে, যেগুলো নাকি স্বাপ্নচিন্তায় থাকে না। এবং সেইজন্যই স্বপ্ন আমাদের কাছে অতটা অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক মনে হয় না। অবশ্য সবসময় মানসিকক্রিয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না এবং তাই স্বপ্ন কখনো কখনো অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক থেকে যায়। মানসিক ক্রিয়া দ্বারা স্বপ্নের এই পরিবর্ধনকেই গৌণ বিস্তৃতি (secondary revision) বলা হয়।

ফ্রয়েড বলেছেন: এটা নিশ্চিত যে অন্যান্য স্বপ্নের উপাদানগুলোর মত মানসিকক্রিয়াও স্বপ্নকে প্রভাবিত করে থাকে এই ভাবে, যে এটাও স্বপ্ন-চিন্তায় যে-বিষয়গুলো থাকে সেগুলোকে নির্বাচন করে থাকে পছন্দমত।

এখানে ফ্রয়েড স্বপ্নের সঙ্গে দিবাস্বপ্নের তুলনা করে দেখিয়েছেন যে উভয়ই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। দিবাস্বপ্নেও প্রহরী থাকে এবং দিবাস্বপ্নেও ইচ্ছা-চরিতার্থতা থাকে। শুধু তাই নয়, স্বপ্নের মত দিবাস্বপ্নও শৈশবের অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এখানে স্বপ্নের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি আলোচনা করেছেন। স্বপ্ন আমরা খুবই অল্প সময়ের জন্য দেখে থাকি। অনেক জটিল, ঘটনাবহুল স্বপ্ন দেখে আমাদের মনে হয় যে আমরা অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখেছি। আসলে কিন্তু খুবই অল্প সময়ে আমরা অতগুলো ঘটনা দেখেছি। একটি উদাহরণ নিলেই জিনিসটি স্পষ্ট হবে। জাষ্টিন টোবোবোলস্কা (Justine Tobo-wolska) তাঁর গবেষণামূলক রচনাতে একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। নাট্যকার কাসিমির বনজুর (Casimir Bonjour) একদা তাঁর লেখা নাটকের অভিনয় দেখতে যান। অত্যধিক ক্লান্ত থাকায় তিনি পর্দা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে তিনি ঐ নাটকের পাঁচটি অঙ্কের সমস্ত অভিনয় দেখেন। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি দেখেন যে পর্দা উঠে যাবার পর তাঁর নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে (নাট্যকারের নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে) দর্শকবৃন্দ হাততালি দিচ্ছে। এই হাততালি-তেই তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। অর্থাৎ তিনি দু'মিনিটের বেশী ঘুমান নাই। জাগ্রত অবস্থায় আমরা যখন চিন্তা বা কল্পনা করি তখন বিভিন্ন-রকমের অসংখ্য বাধা (উল্টো চিন্তা, যুক্তি, ভালমন্দ যাচাই, ইত্যাদি) এসে

হাজির হয়। কাজেই একাগ্রচিত্তে চিন্তা বা কল্পনা করতে পারি না। দিবা-স্বপ্নেও তাই স্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগে। অন্যদিকে আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন এসব কোন বাধা আসতে পারে না। তাই অতি অল্প সময়ে আমরা অনেক বড় ঘটনাবহুল স্বপ্ন দেখতে পারি।

তবে এটা ঠিক নয় যে স্বপ্নের পূর্বের তিনটি উপাদান স্বপ্নচিন্তা থেকে খসড়া স্বপ্ন তৈরী করে পূর্ণরূপ দেবার জন্য মানসিকক্রিয়ার কাছে হাজির করে। চারটি উপাদানই একই সঙ্গে কাজ করে থাকে। স্বপ্নকে পূর্ণরূপ দিয়ে বোধগম্য করার দায়িত্ব মানসিকক্রিয়ার। কিন্তু স্বপ্নেই মানসিক ক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যটি শুধু লক্ষ্য করা যায় না, জাগ্রত অবস্থায়ও এটা লক্ষ্য করা যায়। পড়ার সময় যদি কোন ভুল থাকে তা'হলে তা' আমাদের নজরে পড়ে না, আমরা ভুল শব্দটি নিশ্চয় দেখি কারণ ঐ শব্দ থেকে যে অনুভূতি আমরা পাই ঠিক সেই অনুভূভি শুদ্ধ শব্দটি থেকে পাওয়া যেত না। কিন্তু অন্যান্য শব্দ থেকে যে অর্থ উদ্ধার করি তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অর্থ করতে গিয়ে ভুল শব্দকে শুদ্ধ শব্দ বলে ধরে নেই বা, বলতে পারা যায়, ভুল শব্দকে শুদ্ধভাবেই দেখে থাকি। এক সংবাদপত্রের সম্পাদক বাজী রেখেছিলেন যে তিনি একটি সংবাদে 'সম্মুখে' বা 'পশ্চাতে' এই দুটি শব্দ প্রতিটি লাইনে ব্যবহার করবেন অথচ পাঠকগোষ্ঠী তা' লক্ষ্য করবেন না। তিনি বাজীতে জিতেছিলেন। আবার একবার ফ্রেঞ্চ চেম্বারের বৈঠকে এক নৈরাজ্যবাদী বোমা নিক্ষেপ করেছিল। পরে দর্শকদেরকে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে গাঁয়ের থেকে আসা দুজন লোক ছিলেন। একজন বললেন যে তাঁর ধারণা যে প্রতিটি বক্তার বক্তব্য শেষ হলেই বোমা নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। অপরজন বলেছিলেন (তিনি আগে কয়েকবার চেম্বার কক্ষে এসেছিলেন) যে তাঁর ধারণা প্রতিটি সার্থক বক্তৃতার পরই বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এ-ভাবেই আমরা কোন জিনিসকে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপখাইয়ে নেবার জন্য যুক্তি ব্যবহার করে থাকি। মানসিকক্রিয়াও স্বপ্নে অনুরূপ কাজ করে থাকে। মানসিকক্রিয়ার এমনধারা কাজ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে শুধু হয়ে থাকে না, জেগে উঠে ঐ স্বপ্ন সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি অথবা স্বপ্নটি কাউকে বলি তখনও দেখতে পাই। জেগে উঠে স্বপ্নটি সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি বা কাউকে স্বপ্নটি বলি তখন স্বপ্নের হারিয়ে যাওয়া অর্থাৎ ভুলে যাওয়া অংশগুলো, অথবা স্বপ্নের অসম্পূর্ণ

অংশগুলো এই মানসিকক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ভরে দেই বা পূর্ণ করি। অথচ এ-ব্যাপারটি সম্পর্কে আমাদের চেতনমন অবহিত থাকে না।

এইপ্রকার মানসিক ক্রিয়া সম্পর্কে যৌনবিজ্ঞানী হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ বলেছেন : অর্থাৎ, আমরা কল্পনা করতে পারি, 'ঘুমন্ত চেতনা' যেন নিজেকে বলছে : ঐ আমাদের প্রভু 'জাগ্রত চেতনা' আসছে, যিনি যুক্তির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাড়াতাড়ি কর! জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও এবং একটা শৃঙ্খলায় সাজাও—তা' সে যে-কোন রকমের শৃঙ্খলাই হোক না কেন—তাঁর আসার আগেই সব করা চাই।

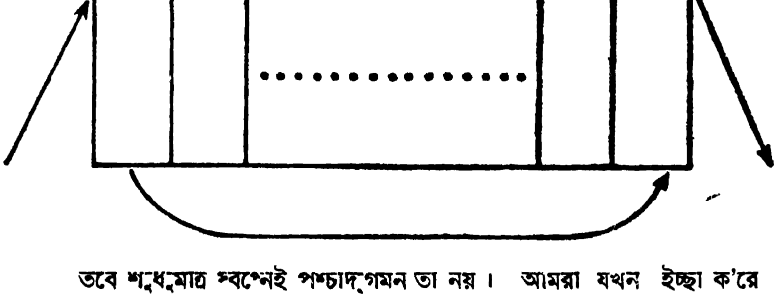
৭

(ক) স্বপ্নের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা আমাদের স্বপ্ন মনে রাখতে পারি না। অন্যান্য জিনিসের চেয়ে স্বপ্ন আমরা অনেক বেশী তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। স্বাভাবিক ভাবেই তাই এটা আমাদের একটা কৌতূহলের বিষয়। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা সঠিকভাবে জানা গেছে যে প্রতিবন্ধকতার জন্যই আমরা স্বপ্ন ভুলে যাই। আগেই আমরা জেনেছি যে নির্জ্ঞান মনের বিষয়গুলিকে সচেতনমন কিছুতেই বাইরে আসতে দেয় না। সচেতন মনের এই প্রচেষ্টাকে বাধা বলে। স্বপ্নে নির্জ্ঞান-মনো-বিষয়গুলি প্রহরীকে (censor) ফাঁকি দিয়ে বাইরে চলে আসে। স্বপ্ন যদি আমরা না ভুলে যাই তাহলে নির্জ্ঞান-মনো-বিষয়গুলি সচেতন মনে নানা প্রকার ঝামেলা পাকাতে পারে। স্বপ্ন ইচ্ছার চরিতার্থতা, কিন্তু সেই ইচ্ছা অধিশাস্তার দ্বারা অনুমোদিত নয়। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা তাই সচেতন মন সবসময় ভুলে থাকতে চায়। স্বপ্নেও যদি সেই ইচ্ছা বাইরে চলে আসে তা'হলে ভুলে যাবার মাধ্যমে সচেতনমন সেই ইচ্ছাকে আবার নির্জ্ঞান মনে পাঠিয়ে দেয়। নির্জ্ঞান-মনো-বিষয়কে বাইরে আসতে না দে'য়ার সচেতন মনের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিবন্ধক বলা হয়। আমাদের স্বপ্ন ভুলে যাবার পেছনে এই বাধা অনেকখানি কাজ করে থাকে।

(খ) স্বপ্ন সবসময়ই বর্তমানকালের হয়ে থাকে। অতীতকালের ঘটনাও বর্তমানে ঘটতে দেখি। এর কারণও আগেই আমরা দেখেছি। নির্জ্ঞান মনে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বলে কিছু নাই, সবই বর্তমান। আবার স্বপ্নে সবকিছুই চাক্ষুষ দেখি—ছবিতে দেখি। কথাবার্তা, চিন্তা-

ভাবনাও ছবিতে দেখি। স্বপ্ন গঠনের মানসিক পদ্ধতি সম্পর্কে ফ্রয়েড এখানে আলোচনা করেছেন। ফ্রয়েড বলেছেন যে মানসিক পদ্ধতি সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ (perception) থেকে শারীরিক ক্রিয়ার (motor action) দিকে যায়; অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ হওয়ার পর আমরা কোন কাজ করে থাকি। কিন্তু স্বপ্নে ব্যাপারটি হয় উল্টো। এই উল্টো ব্যাপারটিকে তিনি পশ্চাদ্-গমন (regression) বলেছেন। আমাদের প্রত্যক্ষ হ'লেই তার একটা ছাপ আমাদের মনে থেকে যায়। এটাকে বলা হয় স্মৃতি। আমরা যাকে চরিত্র (character) বলে থাকি তা' এইসব ছাপের ওপরই নির্ভর করে। এবং শৈশবের স্মৃতির ওপরই চরিত্র বেশী করে নির্ভর করে। যাহোক, তাহলে বোঝা গেল যে প্রত্যক্ষই আমাদের ক্রিয়ার একমাত্র কারণ নয়। স্মৃতি প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে।

স্মৃতি ছাড়াও আরও দুটি জিনিস প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে থাকে—একটি হ'ল নির্জ্ঞান মন আর আর অপরটি হ'ল অবচেতন মন। এদুটো সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কাজেই দেখা যাচ্ছে স্বপ্নে আমাদের প্রত্যক্ষ স্মৃতি, অবচেতনমন ও নির্জ্ঞান মন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রিয়া উৎপন্ন করে। অতীত বিষয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের এভাবে প্রভাবিত হওয়াকেই পশ্চাদ্‌গমন বলা হয়। ফ্রয়েড বিষয়টিকে নিম্নরূপ অংকন করেছেন:



তবে শুধুমাত্র স্বপ্নেই পশ্চাদ্‌গমন তা নয়। আমরা যখন ইচ্ছা ক'রে পূর্বের প্রত্যক্ষ করা কোন ঘটনার কথা স্মরণ করতে যাই তখন জাগ্রত অবস্থায়ও এরূপ পশ্চাদানুসরণ হয়ে থাকে। এখানে আমরা খাঁটি কল্পনা থেকে (পূর্বের প্রত্যক্ষ করা ঘটনার) উল্টোমুখী চলতে চলতে একেবারে পূর্বের ঘটনার প্রত্যক্ষে পেঁছে যাই। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করার সময় আমাদের

যেমন অনুভূতি হয়েছিল ঠিক তেমন অনুভূতি স্মৃতির মাধ্যমেই পাই। তবে জাগ্রত অবস্থায় এই উল্টো পথে স্মৃতিজনিত ঘটনার চিত্র (image) পর্যন্ত যেতে পারি, তার বেশী আমরা যেতে পারি না। কিন্তু স্বপ্নে ঠিক প্রত্যক্ষজনিত ঘটনার চিত্রে পেঁছুতে পারি। এর কারণ এই যে একটি বিষয়ের গুরুত্ব স্বপ্নে অন্য একটি বিষয়ে অর্পিত হ'তে পারে। এই নীতি অনুযায়ী স্বপ্নে প্রত্যক্ষের গুরুত্ব স্মৃতি অথবা নির্জ্ঞানমনের বিষয়ে অর্পিত হলেই প্রত্যক্ষ জনিত ঘটনার চিত্রে আমরা পেঁছুতে পারি। স্বপ্ন তাই আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয় ; আমরা স্বপ্নে যা' দেখি তা' যেন অনুভব করি, একেবারে বাস্তবের মত। ফ্রয়েড বলেছেন : পশ্চাদগমনে স্বাপ্নচিন্তার সূত্রটি স্বপ্নচিন্তার কাঁচামালে পরিণত হয়ে যায়।*

(গ) এ্যারিষ্টটল বলেছেন, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে চিন্তা করি সেই চিন্তাই যখন ঘুমন্ত অবস্থায় চলতে থাকে তখনই স্বপ্ন দেখি। আবার, অন্য দিকে, ফ্রয়েড বলেছেন, স্বপ্ন ইচ্ছার চরিতার্থতা। তাহলে কথা হচ্ছে, জাগ্রত অবস্থায় আমরা তো অনেকরকমের চিন্তা করে থাকি—বিচার করি, অনুমান করি, আশাকরি, অস্বীকার করি ইত্যাদি। তবে স্বপ্নে কেন শুধু ইচ্ছার চরিতার্থতা দেখতে পাব ? এ-প্রশ্নের উত্তর পাবার আগে দেখতে হবে স্বপ্নে যে ইচ্ছার চরিতার্থতা দেখতে পাই সে ইচ্ছার কতরকম উৎস থাকতে পারে। ফ্রয়েড চার রকমের উৎসের কথা বলেছেন—(১) জাগ্রত অবস্থায় বহির্জগতের কারণ থেকে এ-ইচ্ছার উৎপত্তি হতে পারে, হয়তো তখন তা' চরিতার্থ করা হয় নাই, তাই রাত্রিতে ঘুমে সেটা আমাদেরকে চেপে বসে : (২) জাগ্রত অবস্থায় এমন ইচ্ছা হয়তো অবদমন করা হয়েছে, তাই ঘুমে সে ইচ্ছা আবার হয়, ইচ্ছাটি তীব্র বলে ; (৩) জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে এ-ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাই ঘুমন্ত অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারে ; (৪) ঘুমন্ত অবস্থায় শারীরিক কারণে (যেমন তৃষ্ণা, যৌন আকাঙ্খা, ইত্যাদি) স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

ফ্রয়েড বলেছেন যে শিশুদের স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় অচরিতার্থ ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্টি হ'তে পারে। কিন্তু বয়স্ক লোকের স্বপ্ন এ-ভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ শিশুদের জাগ্রত অবস্থার ইচ্ছা স্বপ্ন

* In regression fabric of the dream-thought is resolved into its raw material.

সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট তীব্র হতে পারে। শিশুদের অবদমিত নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা তুলনামূলক ভাবে কম বলে, জাগ্রত অবস্থার এই ইচ্ছাগুলোই স্বপ্ন সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট তীব্র। কিন্তু বয়স্ক লোকের জাগ্রত অবস্থার অচরিতার্থ ইচ্ছার তীব্রতার চেয়ে অবদমিত নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছার তীব্রতা সাধারণতঃ অনেক বেশি তাই স্বপ্নসৃষ্টির বেলায় নির্জ্ঞানমনের ইচ্ছার প্রাধান্যই বেশি। এ-সম্পর্কে ফ্রয়েডের ধারণা এই যে সচেতন মনের ইচ্ছা শুধুমাত্র তখনই স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারে যখন সে নির্জ্ঞানমনের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলে তা' থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে। সুতরাং তাঁর মতে উপরোক্ত চারটি কারণে স্বপ্ন হ'তে পারে না। স্বপ্ন মাত্র একটি উৎস থেকে হ'তে পারে, তা' হ'ল শৈশবের অচরিতার্থ ইচ্ছা। তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ স্বপ্নে যে ইচ্ছার চরিতার্থ হয় তা' শৈশবের ইচ্ছা না হয়েই পারে না।

(ঘ) প্রশ্ন হতে পারে, স্বপ্নের কোন উপকারিতা আছে কিনা। অর্থাৎ স্বপ্ন আমাদের মনের কোন উপকার সাধন করে কিনা। আমরা জানি নির্জ্ঞানমনের বিষয় সদাসর্বদা বাইরে আসার জন্য উদগ্রীব। অবচেতন-মন ঐ বিষয়গুলোকে বাইরে পাঠাতে সর্বদা শক্তি প্রয়োগ করছে। অন্যদিকে সচেতনমন ঐ প্রচেষ্টাকে সাধ্যমত বাধা দিচ্ছে। অবচেতন ও সচেতন মনের মধ্যে এ-ভাবে টানা-পড়েন চলছে। ফলে আমাদের অনেকখানি মানসিক শক্তি নষ্ট হচ্ছে। আমরা যদি এ-দুটো প্রচেষ্টার মধ্যে একটা আপোষের ব্যবস্থা করতে পারতাম তা'হলে অনেকটা মানসিক শক্তির অপচয়ের হাত থেকে রেহাই পেতাম। স্বপ্ন এইরূপ আপোষের চেষ্টা করে। ফ্রয়েড সুন্দর-ভাবে জিনিসটিকে প্রকাশ করেছেনঃ যদি আমরা স্বপ্নকে খানিকটা বল্গাহীন স্বাধীনতা দেই আর তার প্রতি কমবেশী নিশ্চেষ্ট মনোযোগ প্রয়োগ করি; তাহলে দিনের বেলার মত রাত্রিবেলাতেও নির্জ্ঞান মনকে কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমাদের মনের যত শক্তি প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক কম শক্তি ব্যয়িত হবে। সচেতন-মন দিনের বেলায় নির্জ্ঞানমনকে অনেক শক্তি ব্যয় করে কড়া প্রহরায় রাখে। রাত্রিবেলাতেও তেমনি প্রহরা দিতে হ'লে আরও অনেক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ঘুমের ঘোরে যদি তার প্রহরা একটুখানি হাল্কা করে থাকে তাহলে নির্জ্ঞানমন বাস্তবতার মধ্যে (in reality) তার ইচ্ছা চরি-তার্থ করতে পারবে না, অথচ কল্পনার মাধ্যমে (স্বপ্ন) তার ইচ্ছার কিছুটা

চরিতার্থ করতে পারবে। তাহলে আমাদের লাভ এই যে একাধারে আমাদের শক্তি কম ব্যয়িত হ'ল, অপরদিকে আমাদের কোনরূপ ক্ষতিও হ'ল না। শুধু স্বপ্ন কেন, নানারকম মানসিক ব্যাধির ব্যাখ্যাও ফ্রয়েড একইভাবে করেছেন।

(ঙ) ফ্রয়েড এখানে দুটো মানসিক পদ্ধতির কথা বলেছেন—একটি মুখ্য পদ্ধতি (primary process) অপরটি গৌণ পদ্ধতি (secondary process)। এই বিপরীত ধর্মী দুটো পদ্ধতির অস্তিত্ব স্নায়ুরোগে, আমাদের নানারকম ভুলভ্রান্তি (ফ্রয়েডের Psychopathology of Everyday Life দ্রষ্টব্য) এবং বিভিন্ন প্রকার রসিকতার (jokes) মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বহির্জগতের সংস্পর্শে এলে স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনাকে বের করে দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজনাশূন্য করাই মুখ্য-পদ্ধতির কাজ। আর এইভাবে উত্তেজনাকে বের করে দেবার মধ্যে অহং সুখ অনুভব করে এবং সেইজন্য মুখ্য পদ্ধতি একই কাজ বার বার করে অনুরূপ সুখ পেতে চায়। গৌণ পদ্ধতি মুখ্য পদ্ধতির ঠিক উল্টো। এটা মুখ্য পদ্ধতিকে পুনঃ পুনঃ একই কাজ করে সুখ পাবার কাজ থেকে বিরত রাখে। মুখ্য-পদ্ধতি বাস্তবতা বোঝে না, কল্পনা ও বাস্তবতা তার কাছে এক, গৌণ-পদ্ধতি বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে।

স্বপ্ন কোন অস্বাভাবিক মানসিকতার লক্ষণ নয়। মানসিক ভারসাম্যতার কোনরূপ বিকৃতির জন্য স্বপ্ন তৈরী হয় না। নির্জ্ঞান মন সম্পর্কে জানবার সবচেয়ে সহজতম পথ হ'ল স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা। ফ্রয়েড বলেছেন ঃ স্বপ্ন-ব্যাখ্যা হ'ল নির্জ্ঞানমনকে জানবার প্রশস্ত পন্থা। নির্জ্ঞানমনের সমস্ত অবদমিত বিষয়গুলো দিনের বেলায় (অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায়) প্রহরীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। রাত্রিবেলায় (অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায়) প্রহরী যখন একটু দুর্বল হয়ে পড়ে তখন অচেতন মনের বিষয়গুলো বের হয়ে আসে স্বপ্নের মধ্যে। বিষয়টিকে বোঝাবার জন্য ফ্রয়েড ভার্জিলের এনিদ (Aeneid) থেকে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "If I cannot bend the Higher Powers, I will move the Infernal Regions." অর্থাৎ, আমি যদি উর্ধ্বতন শক্তিগুলোকে অবনত না করতে পারি তা'হলে নরকের অঞ্চলগুলোকে জাগিয়ে তুলব।

(চ) এখানে ফ্রয়েড শেষবারের মত নির্জ্ঞান এবং চেতন মনের কথা বলেছেন। মনকে নির্জ্ঞান এবং চেতন এই দুই প্রকোষ্ঠে ভাগ করা যায় না। যা' এক সময়ে চেতন মনে ছিল, আমরা যখন সে জিনিসটিকে ভুলে গেলাম তখন সেই জিনিসটিই নির্জ্ঞান মনে গিয়ে বাসা বাঁধল। আবার নির্জ্ঞানমনে থাকাকালীন সে জিনিসটি সর্বদা চেতনমনকে প্রভাবিত করছে। লিপ্‌স (Lipps) বলেছেন যে নির্জ্ঞান মনই আমাদের মনের মূল ভিত্তি। ফ্রয়েডও লিপ্‌স-এর মত পোষণ করেন। স্বপ্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে নির্জ্ঞান মন মনের বৃহত্তম অংশ এবং সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। শিল্পীর সৃষ্টি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নির্জ্ঞান মনের কাজ। গ্যাঠে, হেমহজ. প্রভৃতি মনীষীদেয় সৃষ্টির ইতিহাস জানতে গেলে দেখতে পাব মৌলিক সৃষ্টিগুলো চেতনমনের প্রচেষ্টা নয়, নির্জ্ঞান মন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা। নির্জ্ঞানমনকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—নির্জ্ঞানমন এবং অবচেতন মন। অবচেতন মনের যে অংশ কখনই সহজে সচেতন মনে আসতে পারে না সেটিকেই নির্জ্ঞান মন এবং যেটি কিঞ্চিৎ চেষ্টার ফলে আসতে পারে তাকে অবচেতন বলা হয়েছে। এখানে ফ্রয়েড আরও একটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। স্নায়ুতন্ত্রে শুধু পরিমাণগত জিনিস থাকে। কিন্তু প্রশ্ন: তাহলে গুণগত জিনিস আসল কোথা থেকে? ফ্রয়েড বল্লেন, পরিমাণগত জিনিসই যখন সুখ-ভোগ নীতি অনুযায়ী সুখ বা দুঃখের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই মনের পরিমাণগত জিনিসে গুণ আরোপিত হয়।

সবশেষে জিজ্ঞাসা: নির্জ্ঞানমনের ইচ্ছার কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে? আমাদের নীতি শাস্ত্রের ওপর কি এ-সব ইচ্ছার কোন প্রভাব আছে? ফ্রয়েড এ-সব জিনিস নিয়ে আলোচনা করেন নাই। তা হোক কিন্তু স্বপ্ন কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারে? এ সম্পর্কে ফ্রয়েড বলেছেন যে স্বপ্ন বরং অতীতের খবর রাখে। অতীতের অভিজ্ঞতারাজির ওপরই স্বপ্ন তৈরী হয়ে থাকে। সুতরাং স্বপ্ন ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের খবর বেশী রাখে। তা' সত্বেও ভবিষ্যতের কিছুটা ইঙ্গিত স্বপ্ন বহন করে থাকে। স্বপ্ন যেহেতু আমাদের মনের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে, এবং যেহেতু ইচ্ছা ভবিষ্যৎকে নিয়েই হয়ে থাকে, সেহেতু আমরা বলব যে স্বপ্ন ভবিষ্যৎ-এরও অন্ততঃ ক্ষীণ পথ প্রদর্শক। তবে এ-কথা অবশ্যই

মনে রাখতে হবে যে কোনরূপ দৈববাণী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বপ্ন করে না, অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কখনও কখনও ভবিষ্যৎ-এর দিকে স্বপ্ন ক্ষীণ ইঙ্গিত বহন করে মাত্র।

মনঃসমীক্ষণ

(১)

(গোড়ার কথা)

ফ্রয়েড তাঁর 'On the History of the Psycho-analytic Movement' নামক প্রবন্ধে মনঃসমীক্ষণের যে ইতিহাস লিখেছেন তা থেকেই আমরা মনঃসমীক্ষণের ইতিহাস বোধকরি সবচেয়ে ভালভাবে জানতে পারব। তাই মনঃসমীক্ষণের 'গোড়ার কথা'তে তাঁর সেই প্রবন্ধ থেকেই আলোচনা করা হল। এই প্রবন্ধ লণ্ডনের The Hogarth Press কর্তৃক তাঁর সংকলিত রচনাবলীর (Collected Papers) প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে। এ প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে মনঃসমীক্ষণের স্রষ্টা তিনি নিজে। অন্যকেউই এর স্রষ্টা বলে দাবী করতে পারে না। তিনি এই মনঃসমীক্ষণের গোড়ার কথা যত ভালভাবে জানেন অন্য কারো পক্ষেই তত ভাল জানা সম্ভব নয়। অবশ্য এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এই যে মনঃসমীক্ষণ ফ্রয়েডের সৃষ্টি হলেও মনঃসমীক্ষণের মত বা মনঃ সমীক্ষণের প্রধান প্রধান ভাবনাগুলোর মত কিছু কিছু ভাবনা ফ্রয়েডের আগে যে ছিল না তা নয়। কোন সৃষ্টিই হঠাৎ করে হতে পারে না। তার একটা ইতিহাস থাকবেই। যেমন, ধরা যাক, স্বপ্ন-তত্ত্ব। এটা মনঃসমীক্ষণের একটা বড় হাতিয়ার কিন্তু স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা হতে পারে তা ফ্রয়েড প্রথম বলেন নি। অতি পুরাতন কাল থেকে মানুষ স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করে এসেছে। তফাৎ শুধু এইটুকু যে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞান সম্মত বলে অনেকেই মেনে নেন, আর সেই পুরাকালের ব্যাখ্যাগুলো ছিল ব্যাখ্যাকর্তার চিন্তাভাবনা, খেয়ালখুশী, ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তাধারা ফ্রয়েডের আগে থেকে থাকলেও ১৯০৯ সালে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি প্রথম এর প্রকাশ্য প্রচার শুরু করেন। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজে এর সৃষ্টিকর্তা নন, সৃষ্টিকর্তা হলেন জোসেফ ব্রয়ার। একথা বলার একটু কারণ আছে। এটাই ছিল মনঃসমীক্ষণের প্রকাশ্য প্রচারের প্রথম

মুহূর্ত, তাই ফ্রয়েড নিজেকে এর সৃষ্টিকর্তা বলে ঘোষণা করেন নি. কারণ তাহলে মনঃ সমীক্ষণের প্রচারে ব্যাঘাত আসতে পারত। আর তা ছাড়া তখন ছিল মনঃসমীক্ষণের কেবল শুরু মাত্র। তাই কে এটা প্রথম আবিষ্কার করল এটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু ১৯১৪ সালে ফ্রয়েড যখন এই প্রবন্ধ লেখেন তখন তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এ-আবিষ্কার তাঁর নিজের। অন্য কেউ-ই এর দাবীদার হতে পারে না। মনস্তত্ত্বে ব্রয়ারের যে অবদান সেটা হ'ল বিরেচন (cathartic) পদ্ধতি। ব্রয়ারের ধারণা ছিল এই যে মানসিক রোগী যদি দু'দণ্ড মন খুলে কথা বলতে পারে, যদি সে বলে কি তার ব্যথা, কি তার অসুবিধা, তাহলে সে অনেকটা স্বস্তি পাবে। তাঁর এ ধারণা ঠিক। মন খুলে কথা বললে সব মানসিক রোগীই কিছুটা ভাল বোধ করে। ব্রয়ারের ধারণা ছিল, এ ভাবে দীর্ঘকাল ধরে রোগীর সব কথা যদি বের করে দেয়া যায় (catharsis) তা'হলে বোধহয় তার রোগ সেরে যাবে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবার সময় ফ্রয়েড ভেবেছিলেন, ব্রয়ারের এই বিরেচন পদ্ধতিকেই (catharsis) মনঃ সমীক্ষণের পূর্বসূরী বলে ধরে নেয়া হোক। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি বুঝতে পারলেন যে মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে ব্রয়ারের বিরেচনের কোন সম্পর্ক নাই এবং এই কারণেই তিনি বলেছেন যে তিনি নিজেই মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কারক।

ফ্রয়েড এবং ব্রয়ার উভয়েই প্রথমে সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসা করতেন। কিন্তু কিছুদিন পর ফ্রয়েড সম্মোহনের চিকিৎসা ছেড়ে দিলেন। তাঁর সম্মোহনকে ছেড়ে দেবার কারণ দু'টি ঃ প্রথমতঃ সবরোগীকে সম্মোহন করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ সম্মোহনের সাহায্যে সাময়িকভাবে রোগের উপশম হয় মাত্র, গভীর স্তরের রোগের কারণগুলো থেকেই যায় এবং ফলে কিছুকাল পর রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটে। সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসা অবশ্য আজও চলছে। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে এ-দিয়ে রোগের মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। সম্মোহনকে ছেড়ে দিয়ে তিনি অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি (method of free association) অবলম্বন করেন। দেখাদেখি ব্রয়ারও এই পদ্ধতি অবলম্বনকরেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি আবার বিরেচন তপদ্ধি অবলম্বন করেন। যাহোক ব্রয়ারের বিরেচন পদ্ধতিকে মনঃ সমীক্ষণের পূর্বসূরী বলা যায় না এই কারণে যে সমীক্ষণের যে তিনটি প্রধান স্তম্ভ তার একটিও বিরেচন অথবা সম্মোহন পদ্ধতিতে নাই। এই তিনটি স্তম্ভ হ'ল ঃ

বাল-যৌনতা (infantile sexuality) ;অবদমন (repression) ও প্রত্যাবৃত্তি (regression) ; এবং সংক্রমণ (transference)। ফ্রয়েডের মতে ৫ বছরের শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি তৈরী হয়ে গেছে। এই ব্যক্তিত্বের প্রচয় (development) যৌনতা ভিত্তিক। জন্মের পর থেকেই শিশুর মধ্যে যৌনতা রয়েছে। অবশ্য এখানে আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে ফ্রয়েডের যৌনতার পরিধি অনেক বিস্তৃত। সাধারণ অর্থে যৌনতা বলতে আমরা যতটুকু বুঝি সেটাই ফ্রয়েডের যৌনতা নয়। ফ্রয়েডের মতে যৌনস্থল শুধুমাত্র যৌনাঙ্গগুলোই নয়, পায়ু এবং মুখও। আবার যদিও এ-তিনটি স্থানই মৌলিক যৌনস্থান তবুও অনুসঙ্গ পদ্ধতিতে (association method) যৌন উপভোগের মৌলিক স্থানগুলোতেই যৌনতা নিবদ্ধ থাকে না। যেমন কল্পনারও উত্তরকালে ব্যক্তি যৌন উপভোগ করতে পারে। তেমনিভাবে শুধু বিপরীত লিঙ্গেই যৌনতা নিবদ্ধ থাকে না, অনুসঙ্গ পদ্ধতিতে সাধারণ জিনিসও (যেগুলো যৌন জিনিস নয়) যৌনতাপ্রাপ্ত হতে পারে। এমনিভাবে বিপরীত লিঙ্গের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি এবং বিপরীত লিঙ্গের যৌনতা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে এমন জিনিসও যেমন কলম, ফুল ইত্যাদিও যৌনতাপ্রাপ্ত হতে পারে।

ফ্রয়েডের শৈশবকালীন যৌনতা নিয়ে অনেক বাত-বিতণ্ডা হয়েছে। এ-সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা শুধু ম্যাক ডুগ্যাল-এর(William Mc Dougall) মতামত আলোচনা করলেই বোধকরি যথেষ্ট হ'বে। ম্যাক ডুগ্যাল তাঁর An outline of Abnormal Psychology-তে (পরিশিষ্টে) বলেছেন যে ফ্রয়েডের সর্বযৌনতাবাদে (pan-sexualism) তিনি বিশ্বাস করেন না। আবার শৈশবকালীন যৌনতাতেও তিনি বিশ্বাসী নন। কিন্তু অন্যদিকে সাধারণ লোকের মতেও তিনি আস্থা রাখেন না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে যৌবন শুরু হবার আগে যৌনচেতনা আমাদের আসে না। যৌবন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৌণ যৌনবৈশিষ্ট্যগুলো (secondary sexual characteristics), যেমন মুখে দাড়ি ওঠা, ছেলেদের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রকাশ পায় এবং তখনই শুধু আমরা যৌন চেতনা বোধ করি। ম্যাক ডুগ্যাল স্বীকার করেছেন যে যৌবন শুরু হবার আগেই আমরা যৌন-চেতনা বোধ করি। তাঁর মতে ৮ বছর বয়েস থেকেই এই চেতনাবোধ হয়ে

থাকে। তিনি বলেছেন ঃ "···বেশীর ভাগ মানুষের বেলাতেই যৌনচেতনা যে ৮/৯ বছর বয়সে প্রকাশ পায় এ-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে।" তাঁর নিজের বেলাতেও তাই-ই নাকি হয়েছিল।

অবদমন মনঃসমীক্ষণের আর একটি প্রধান স্তম্ভ। কোন অতি বেদনাময় অভিজ্ঞতা (trauma) অহং যখন সহ্য করতে পারে না তখন অহং এই অভিজ্ঞতাকে জোর করে নির্জ্ঞানমনে পাঠিয়ে দেয়। এই পদ্ধতিকেই অবদমন বা নিষ্পেষণ বলা হয়। চেতন অহং এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে নিষ্পেষণ করে না। এই নিষ্পেষণের কথা চেতন অহং জানেই না, নির্জ্ঞান অহং-ই এই নিষ্পেষণ করে থাকে। অদস্-এর কোন প্রচণ্ড শক্তিশালী কামনা যদি এমন হয় যে সে কামনা মেটাতে গেলে অহং-এর ভীষণ ক্ষতি হতে পারে তখনই এই বেদনাময় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। এ-অবস্থায় অহং দুটি বিপরীত-মুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। একদিকে অদস্ তার কামনাকে চরিতার্থ করে দিতে অহংকে ধরে বসে অন্যদিকে রয়েছে অধিশাস্তা। এই টানাপোড়নে পড়েই অহং বেদনা অনুভব করে। বেদনা অতি অসহনীয় হলে নির্জ্ঞান অহং এই অভিজ্ঞতার কথা একেবারে ভুলে যায়। কিন্তু নির্জ্ঞান মনে প্রেরিত হলেও এই অভিজ্ঞতা মুছে যায় না। নির্জ্ঞানমনে বিপরীতমুখী এই শক্তি-দ্বয় একটা মীমাংসা (Compromise) করে নেয় এবং মীমাংসাই আমাদের অগোচরে রোগলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। মীমাংসাটি এমনভাবে হয় যে অদস্-এর কামনা চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু সেটা সরাসরি না হয়ে বিকল্পপথে হয় বলে চেতন অহং এই কামনার চরিতার্থতা বুঝতে পারে না। এইজন্যই রোগলক্ষণগুলো শুধু সাধারণ লোকের কাছে নয়, রোগীর নিজের কাছেও অদ্ভুত এবং অপরিচিত বলে মনে হয়।

বেদনাময় অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীকালেও হতে পারে। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে ৪/৫ বছরের মধ্যেই মৌল বেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলো সব হয়ে যায়। উত্তর-কালে যে বেদনাময় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে সেগুলো সেই মৌল বেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলোকে দৃঢ় করে মাত্র। এইজন্যই উত্তরকালের রোগলক্ষণগুলোর কারণ জানতে হলে আমাদেরকে শৈশবের সেই মৌল বেদনাময় অভিজ্ঞতা-গুলো বুঝতে হবে। অতীত দিনের মৌল অভিজ্ঞতাগুলো খোঁজাকেই প্রত্যাবৃত্তি (regression) বলা হয়। শুধু চিকিৎসকই অতীত দিনের অভিজ্ঞতাগুলো বুঝতে চেষ্টা করেন না, রোগীর উত্তর জীবনে সকল

অভিজ্ঞতাই শৈশবের সেই মৌলবেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নির্জ্ঞানমনে বিচার করা হয়। এইজন্যই চিকিৎসকের অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে মাথা ব্যথা। ব্যক্তির মানসিকতার প্রচয়ের (development) কোন স্তরে বাধা আসলে ব্যক্তি পূর্ববর্ত্তী কোন স্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করে এটা জানা খুব দরকার। এখানে বাধা অর্থে অহং-এর পরবর্ত্তী স্তরের বিকাশ অহং-এর পক্ষে বিপজ্জনক অথবা বেদনাময়, বুঝতে হবে। পূর্ববর্ত্তী স্তরে অহং-এর ফিরে যাওয়াকেও প্রত্যাবর্ত্তন বলা হয়।

মনঃসমীক্ষণের তৃতীয় স্তম্ভটি হ'ল সংক্রমণ। আমরা জানি ইডিপাস এষণাই ফ্রয়েডের মতে মানসিক রোগের মুখ্য কারণ। শৈশবেই আমরা বাবা এবং মায়ের প্রতি আমাদের কামকে পরিচালিত করি। বাবা বা মায়ের প্রতি এই মৌল কামাসক্তি কোনদিনই একেবারে চলে যায় না। যারা পরবর্ত্তীকালে বাবা বা মায়ের প্রতি কামাসক্তিকে বাবা বা মায়ের বিকল্প কারও প্রতি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করতে পারে তারাই সুস্থ থাকে আর যারা পারে না তারাই মানসিক রোগে ভোগে। মানসিক রোগ সম্পর্কে এই-ই হ'ল ফ্রয়েডের মৌল কথা। মানসিকরোগ একবার হয়ে গেলে চিকিৎসক যখন চিকিৎসা করতে শুরু করেন তখন রোগী তার বাবা বা মায়ের মত ব্যবহার চিকিৎসক-এর কাছে থেকে আশা করে। মেয়েরা চায় তাদের ঠিক বাবাদের মত ব্যবহার। আর ছেলেরা চায় তাদের ঠিক মায়েদের মত ব্যবহার। রোগীর মা অথবা বাবার প্রতি যেমন কামাসক্তি ছিল রোগী সেই কামাসক্তি এখন চিকিৎসকের প্রতি চালিত করে। এই জিনিসটিকেই বলা হয় সংক্রমণ (transference)। এই সংক্রমণ প্রতিহত অথবা দূরীভূত করা বেশ কঠিন কাজ। অনেক সময় দেখা যায় রোগী তার নির্জ্ঞানমনের রোগের কারণ বুঝতে পারল এবং ফলে রোগলক্ষণগুলোও দূরীভূত হ'ল, কিন্তু তবুও রোগীকে স্বাভাবিক বলা চলল না। কারণ দেখা গেল রোগী চিকিৎসকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এখানে কামাসক্তি বলতে শুধু সাধারণ অর্থে যাকে যৌনতা বলা হয় সেটা বুঝলে দারুণ ভুল করা হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েডের যৌনতার এবং কামের সংজ্ঞা বিস্তৃততর পরিধিমণ্ডিত। সংক্রমণ কাটিয়ে উঠতে না পারলে রোগীকে স্বাভাবিক মানুষ বলা চলবে না। কারণ সে অচিরেই আবার রোগলক্ষণগুলোর দাস হয়ে পড়বে।

ফ্রয়েডের উল্লিখিত প্রবন্ধে মনঃসমীক্ষণের এই তিনটি স্তম্ভ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। কিন্তু এগুলো না জানলে মনঃসমীক্ষণের ইতিহাস বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলেই এখানে এগুলো আলোচনা করা হ'ল। এছাড়া পরে আমরা যখন চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচনা করব তখনও এগুলোর প্রয়োজন হবে। মনঃসমীক্ষণের এই তিনটি স্তর ছাড়াও এখানে আরও একটি প্রয়োজনীয় ধারণা আলোচনা করা বোধকরি যুক্তিযুক্ত। এটি হল প্রতিবন্ধক বা resistance। মনঃসমীক্ষণের সময় রোগীকে রোগের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে থাকলে রোগী হয়তো ঠিকমত উত্তর দেবে। অবাধভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতেও দেখা যাবে স্বভাবিকভাবে উত্তর (response) পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যখনই চিকিৎসকের প্রশ্ন বা অনুসন্ধান রোগীর মৌল নিষ্পেষিত বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে ছুঁয়ে যাবে, তখনই রোগী আর উত্তর দিতে চাইবে না—সে 'বাধা' দেবে। প্রশ্নটির উত্তর সে জানে না বা ভুলে গেছে ইত্যাদিভাবে সে প্রশ্নটিকে বা অনুসন্ধানকে এড়িয়ে যেতে চাইবে। চিকিৎসককে বুঝতে হবে যে এখানেই রোগীর সমস্যার মূল (crux) রয়েছে। রোগী বিস্মৃত এই অভিজ্ঞতাগুলো স্মরণ করতে চায় না এইজন্য যে সেগুলো যখনই তার চেতনমনে আসবে তখনই সে অসহনীয় বেদনা অনুভব করবে। তবে মনে রাখতে হবে যে এই 'বাধা'ও চেতনমনের কাজ নয়, এটিও অবচেতন মন করে থাকে। এর কারণ এই যে নির্জ্ঞান মনের গভীর স্তরে নিষ্পেষিত বেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলো চিকিৎসকের বিভিন্ন প্রশ্নের ফলে অনেকটা ওপরের দিকে উঠে আসে। আগাছায় ভরা পোড়ো বাড়ীর মতই বিভিন্ন চিন্তাভাবনার দ্বারা ঢাকা থাকে নিষ্পেষিত বেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলো। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে (অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে) এই বিভিন্ন চিন্তার আগাছাগুলো সরিয়ে ফেললেই পোড়োবাড়ীটি দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু তবুও চেতনমন এগুলো দেখেও যেন দেখে না, কারণ সে তাহলে কষ্ট পাবে। আর আগেই আমরা জেনেছি যে নিষ্পেষিত হলেও বেদনাময় অভিজ্ঞতার কামনাগুলো (অদস্-এর কাম) সবসময় বাইরে অর্থাৎ চেতনমনে আসতে চেষ্টা করে। আগাছাগুলো সরিয়ে ফেলার পর ঐ কামনাগুলো বাইরে আসার পক্ষে পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু চেতনমন টের পেলেই এগুলোকে আবার ঠেলে দেবে নির্জ্ঞান মনের গভীরে। এমতাবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমেই নির্জ্ঞানমনের কামনাগুলো চরিতার্থ হতে পার। তাই এই সময়ই রোগী বেশীর ভাগ স্বপ্ন

দেখে থাকে। আর এসময়ের স্বপ্নগুলো তাই চিকিৎসার পক্ষে খুব সহায়ক।

'বাধার' (resistance) সঙ্গে 'বাধ'কে (inhibition) এক করে ফেললে মারাত্মক ভুল করা হবে। উদ্দীপকের ফলে কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়াকে বাধ বলে। আর নির্জ্ঞান মনে নিষ্পেষিত অভিজ্ঞতাকে চেতনমনে না আসতে দেয়ার অহং-এর প্রচেষ্টাকে বাধা বলে। এ-ক্ষেত্রে অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিকে একটু ভাল করে বুঝে নেয়া বোধহয় যুক্তিযুক্ত। কারণ এটিকে না জানলে মনঃসমীক্ষণকে ভালভাবে বোঝা যাবে না। অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতি মনঃ সমীক্ষণের বড় হাতিয়ার। আমাদের চিন্তাজগতে একটি ধারণার সঙ্গে অপর একটি ধারণার এমন সংযোগ স্থাপিত হতে পারে যে দুটি ধারণার একটি মনে আসলেই অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে। যেমন কলমের ধারণা মনে হলেই হয়তো কাগজের ধারণা মনে আসল। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই যে এমন হবে তা' ঠিক নয়। অন্য কারো বেলায় কলমের ধারণা মনে আসলে হয়তো বই-এর ধারণা মনে আসবে। আমাদের মনে বিভিন্ন ধারণাগুলো একে অপরের সঙ্গে সংযোজিত থাকে। আবার অনেক সময় একটি প্রধান ধারণাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো ধারণা জোট বেঁধে থাকে। এই জোট-বেঁধে-থাকা ধারণাগুলোর একটিকে টান দিলেই মালায় গাঁথা ফুলের মত একটির পর একটি বেরিয়ে আসে। এভাবে সবগুলো ধারণা বেরিয়ে আসলে বোঝা যাবে মূল ধারণা কোনটি। অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে আমরা রোগীকে তার মনে যা' পর পর আসবে (তা' সে যত অর্থহীন ধারণাই হোক না কেন) তাই-ই বলতে বলি। রোগী একটি ধারণা থেকে শুরু করে পর পর যত ধারণা মনে আসে বলে যায়, চিকিৎসক শুধু সেগুলো শুনে যান, কোন রকম মন্তব্য করেন না বা কোনরূপ ভাব প্রকাশ করেন না। অবশ্য যদি রোগীর ধারণাগুলোর স্রোত একেবারেই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চলতে থাকে তাহলে চিকিৎসক কখনো কখনো একটু আধটু রোগীর চিন্তার স্রোতকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি রোগীকে অন্য একটি ধারণার কথা ভাবতে ভাবতে আর যত ধারণা মনে আসবে সেগুলো বলতে বলেন। এই পদ্ধতিকেই অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতি বলা হয়।

যা'হোক, মনঃ সমীক্ষণের এই কয়েকটি সাধারণ ধারণার কথা মনে রেখে আমরা আবার ফ্রয়েডের সেই উল্লেখিত প্রবন্ধটির কাছে ফিরে যাই। মূর্ছা-

রোগের কারণ সম্বন্ধে একটি বিষয় নিয়ে প্রথমে ফ্রয়েড এবং ব্রয়ারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ব্রয়ারের মতে মূর্ছারোগের কারণ অনেকটা দৈহিক। তিনি বলেন যে মস্তিষ্কে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যে যোগাযোগবিহীনতাই এ-রোগের কারণ এবং এই জন্যই তিনি সংবেশিত-প্রায় (hypnoid) অবস্থার কথা বলেছেন। অপরদিকে ফ্রয়েডের মত হল এই যে এই যোগাযোগবিহীনতা মূল কারণ নয়, এটা একটা ফল। নিষ্পেষণের ফলেই এই যোগাযোগবিহীনতা দেখা দেয়। সুতরাং মূর্ছারোগের কারণ বলতে আমরা মানসিক নিষ্পেষণকেই বুঝব। প্রথমদিকে ফ্রয়েড ব্রয়ারের মতবাদকে তাঁর মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষে দেখা গেল যে দুটো মতবাদ ঠিক বিপরীতমুখী। ব্রয়ার তার চিকিৎসার ইতিহাসে যৌনতার প্রভাব লক্ষ্য করেন নি। রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে যে "অতি-সহযোগিতা" (rapport) লক্ষ্য করা যায় তার পেছনে যে যৌনতা আছে তাও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নি। অপরদিকে ফ্রয়েড ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন যে রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে যে 'অতি-সহযোগিতা' গড়ে ওঠে তাও যৌনতার জন্যই। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে এটা সংক্রমণের (transference) জন্যই হয়ে থাকে। সংক্রমণ থেকেই তো অতি-সহযোগিতা গড়ে ওঠে এ-ধারণা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক রোগ সৃষ্টি করতে যৌনতা যে কি পরিমান শক্তিশালী তা ফ্রয়েড বুঝতে পারলেন।

মানসিক রোগে যৌনতার প্রভাবের ধারণা ফ্রয়েডের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল না। তিনজন মনীষীর কাছ থেকে ফ্রয়েড এই ধারণা পান। কিন্তু মজার কথা এঁদের সবাই মানসিক রোগে যৌনতার কথা বললেও যৌনতার গুরুত্ব এঁদের কেউই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নাই। এই তিন জন মনীষী হলেন—ব্রয়ার, শার্কো এবং ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ক্রোবাক। একবার, একদিন ফ্রয়েড এবং ব্রয়ার ভ্রমণ করছিলেন। পথিমধ্যে একজন লোক ব্রয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ফ্রয়েড একটু দূরে সরে দাঁড়ান। লোকটির সঙ্গে ব্রয়ারের কথা শেষ হলে তিনি ফ্রয়েডকে বললেন যে এই লোকটির স্ত্রী বায়ুরোগগ্রস্ত এবং তাই তার শরণাপন্ন। তিনি ফ্রয়েডকে আরও বললেন যে এসব রোগ হল secrets d'aleove এর ব্যাপার। ফ্রয়েড তখন তরুণ হাউস ফিজিসিয়ান ছিলেন। ফরাসী ভাষা তিনি তখনও ভাল বুঝতেন না তাই aleove শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করায়

তিনি বললেন যে aleove শব্দের অর্থ হ'ল বাসর শয্যা। সুতরাং secrets d'aleove এর অর্থ হ'ল বাসর ঘরের গোপন কথা। ব্রয়ারের এই মন্তব্য ফ্রয়েডের মনে রেখাপাত করেছিল। কয়েক বছর পর শার্কোর এক উক্তি থেকেও ফ্রয়েড একই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এরও এক বছর পর ফ্রয়েড যখন স্নায়ুতন্ত্রের রোগের চিকিৎসা করছিলেন তখন একদিন তিনি ক্রোবাকের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলেন। ক্রোবাকের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রণ হওয়ায় তিনি তার এক রোগিণীকে ফ্রয়েডের কাছে পাঠান। এই রোগিণী উৎকণ্ঠাতে (anxiety) ভুগছিলেন। ক্রোবাক ফ্রয়েডকে বললেন যে এই রোগিণীর আঠারো বছর আগে বিয়ে হলেও সে এখনো virgo intacta অর্থাৎ সম্পূর্ণ কুমারী। কারণ এর স্বামী একেবারে নপুংসক ছিল। ক্রোবাক বললেন, এটা হল রোগিণীর রোগের কারণ।

নিষ্পেষণের ধারণার জন্য কিন্তু ফ্রয়েড কারো কাছে ঋণী নন। অবশ্য তাঁর এটা আবিষ্কার করার পর একদিন ওটো র‍্যাঙ্ক তাঁকে বললেন যে দার্শনিক শোপেনহাওয়ার তাঁর World as Will and Idea-তে মানসিক রোগের কারণ সম্পর্কে যা বলেছেন তা' ঠিক ফ্রয়েডের নিষ্পেষণের ধারণার মত। লোকে শোপেনহাওয়ারের এই ধারণা আগে পড়েছে কিন্তু এর ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করে নি। নিষ্পেষণের ধারণা হল মনঃ সমীক্ষণের মূল ভিত্তি। ফ্রয়েডের সম্মোহন পদ্ধতি পরিত্যাগ করার পেছনে ছিল এই যে সম্মোহনে এই নিষ্পেষণ ধরা পড়ে না। অথচ এই নিষ্পেষণকে দূর করতে না পারলে স্থায়ী চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই তিনি সম্মোহন পরিত্যাগ করে অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

মনঃ সমীক্ষণের তৃতীয় ধারণা বলে যৌনতা ফ্রয়েডের আরও পরের আবিষ্কার। এর জন্যও তিনি কারও কাছে ঠিক ঋনী নন। ব্রয়ার অবশ্য পূর্বে বলেছিলেন যে মূর্ছারোগের কারণ সুদূরপ্রসারী অর্থাৎ অনেক আগের ঘটনা থেকে এর উৎপত্তি। তিনি কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন যে শৈশবে কোন প্রকার ধর্ষণের (seduction) ফলেই মূর্ছারোগ হয়ে থাকে। শৈশবের এরূপ অভিজ্ঞতার ফলে মূর্ছারোগের প্রতি ব্যক্তিটির একটু ঝোঁক থেকে যায়। পরবর্তিকালে যৌনসম্বন্ধীয় মানসিক আঘাত (trauma) হ'লে মূর্ছারোগ সহজেই হতে পারে। শৈশবকালীন যৌনতা সম্বন্ধে প্রথমে ফ্রয়ে-

ডের অভিজ্ঞতা ছিল না। এ-সম্পর্কে তাঁর মতবাদ বয়স্ক ব্যাক্তির মনঃসমীক্ষণ থেকেই জন্ম নেয়। উত্তরকালে তাঁর মতবাদগুলোকে তিনি শিশুদের মনঃ সমীক্ষণ করতে গিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেন। দেখা গেল তাঁর মতবাদ-গুলো পুরোপুরি ঠিক।

স্বপ্নতত্ত্বও সম্পূর্ণ ফ্রয়েডেরই আবিষ্কার। মনঃ সমীক্ষণের ইতিহাসের প্রথমদিকেই তিনি এটা আবিষ্কার করেন। স্বপ্নের প্রতীক (symbols) ব্যাখ্যা তিনি স্বাধীনভাবে করেন। শার্নারের (Scherner) প্রতীক ব্যাখ্যার কোন প্রভাব এ-ক্ষেত্রে ছিল না। ষ্টেকেল (Stekel) অবশ্য ফ্রয়েডের আগে স্বপ্নব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে তিনি একদম ভিন্নপথে অগ্রসর হয়েছিলেন। স্বপ্নব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খুব কম লোকই কাজ করেছেন। ষ্টেকেল এবং ফ্রয়েড ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ গবেষণা করে-ছেন তিনি কোন মনস্তাত্ত্বিক নন, তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। জোসেফ পপার (Joseph Popper) নামক এই ইঞ্জিনিয়ার তাঁর Phantasien eines Realisten নামক গ্রন্থে স্বপ্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করে-ছেন। লিংকিউস (Lynkeus) এই ছদ্ম নামে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

স্বপ্নব্যাখ্যা ফ্রয়েডের কাছে শেষেরদিক এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তিনি বলতেন যে কেউ মনঃ সমীক্ষণের প্রতি কতটা আস্থা-শীল তা বোঝা যাবে তিনি স্বপ্নব্যাখ্যার প্রতি কতটা আস্থাশীল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই তিনি স্বপ্নব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দেই তিনি তাঁর Die Traum-deutung মোটামুটি শেষ করে ফেলেন, অবশ্য ১৮৯৯ সালের আগে এটা লেখা হয় নি। Die Traumdeutung হ'ল ফ্রয়েডের স্বপ্নব্যাখ্যা।

১৯০২ সাল থেকে মনঃ সমীক্ষণের প্রভাব চারদিকে বোঝা যেতে লাগল। ফলে ফ্রয়েডের খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এইসময়ে একদল তরুণ চিকিৎসক ফ্রয়েডের কাছে এলেন মনঃ সমীক্ষণ শিখতে। চিকিৎসক ছাড়াও লেখক, চিত্রকর প্রভৃতি এসে হাজির হলেন ফ্রয়েডের কাছে মনঃ সমীক্ষণ শিখতে। ১৯০৭-এর দিকে মনঃ সমীক্ষণের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ব্লয়লার জানালেন যে ফ্রয়েডের লেখা বারঘুলজলিতে (Burgho"lzli) পড়া হচ্ছে এবং তাঁর মতবাদ ব্যবহৃত হচ্ছে। ডঃ এটিংগন

এবং সি. জি. ইয়ুং এসে যোগ দিলেন ফ্রয়েডের সঙ্গে। ফলে Jahrbuch নামে একটি সাময়িকী প্রতিষ্ঠিত হ'ল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। ইয়ুং ছিলেন এর সম্পাদক। তিনি ছিলেন জুরিখ (Zurich)-এর মনোবিজ্ঞানী। ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণে ব্রয়লার এবং ইয়ুং-এর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করতেন। ইয়ুং সফলতার সঙ্গে ডিমেনশিয়া প্রিককস্-এ (একপ্রকার বায়ুরোগ যা অল্প বয়সেই অর্থাৎ যৌবনের প্রাক্ মুহূর্তেই সাধারণতঃ হয়ে থাকে) মনঃসমীক্ষণ ব্যবহার করলেন। মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা ক্রমেই ভেঙ্গে যেতে লাগল। মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে ইয়ুং-এর আরও একটি বড় অবদান আছে। মানসিক জটিলতার (complex) ধারণা প্রথমে ইয়ুং-এর মাথাতেই আসে। অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে কাজ করতে করতে তিনি এই জিনিসটি আবিষ্কার করেন। অনেক সময় একটি বিশেষ ধারণা মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা তা'দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং সেই বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে যদি আবেগ থাকে তা'হলে তাকে 'জটিলতা' (complex) বলা হয়। Inferiority complex বা হীনমন্যতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি।

১৯০৭ সালে ভিয়েনা এবং জুরিখ গোষ্ঠীদ্বয় একত্রিত হলে মনঃসমীক্ষণের জয়যাত্রা দ্রুততর হ'ল। বিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ হ্যাভলক এলিস একজন মনঃসমীক্ষক না হয়েও মনঃসমীক্ষণের জয়যাত্রা লক্ষ্য করছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি লিখলেনঃ "ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তখন শুধুমাত্র অষ্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ডেই সমর্থিত এবং অনুসরিত হচ্ছে না, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, কানাডা এবং আমার মনে হয়, অষ্ট্রেলিয়াতেও হচ্ছে।" চিলির এক চিকিৎসক ১৯১০ সালের বুয়েনস আইরেসের এক আন্তর্জাতিক অধিবেশনে মনঃসমীক্ষণের প্রশংসা করলেন। তিনি শৈশবকালীন যৌনতাও সমর্থন করেছিলেন। মধ্যভারতের এক ইংরেজ চিকিৎসক কিছু মুসলমান রোগী চিকিৎসা করার পর বললেন যে, ইউরোপের মানসিক রোগীদের মধ্যে যেসব জিনিস লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো এদের বেলায়ও যায়। উত্তর আমেরিকাতেও মনঃসমীক্ষণের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। ১৯০৯ সালে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসীডেন্ট ষ্ট্যানলী হল, ইয়ুং এবং ফ্রয়েডকে ভাষণ দেবার জন্য ডাকলেন। এখানে মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে সবার কৌতুহল দেখে ফ্রয়েড বিস্মিত

হয়েছিলেন। এখানে মনঃসমীক্ষণ পাঠ্য তালিকা ভুক্তও ছিল। ইয়ুং এবং ফ্রয়েডকে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ ল্জ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। ফেরেনজি, জোন্স এবং এ. এ. ব্রিলের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডে মনঃসমীক্ষণ তার সুযোগ্য স্থান নিতে পারল। আমেরিকার বিখ্যাত স্নায়ুবিদ জেম্স্ জে. পুটনাম প্রথমদিকে বিরোধিতা করলেও শেষকালে মনঃসমীক্ষণকে সমর্থন করেছিলেন।

এতদিন পর্য্যন্ত যেসব দেশ মনঃসমীক্ষণের ব্যাপারে সবচেয়ে উদাসীন ছিল তাদের মধ্যে ফ্রান্স ছিল সর্বপ্রথম। মরিচাও-বুচ্যান্টই সর্বপ্রথম ফ্রান্সে মনঃসমীক্ষণের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। প্যারিসে তখন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে মনঃসমীক্ষণের প্রধান প্রধান এবং খাঁটি খাঁটি ধারণাগুলো আসলে জেনে (Janet)-এর ধারণাগুলোর পুনরাবৃত্তি মাত্র এবং যেগুলো তেমন নয় সেগুলো ঠিক নয়। ইটালীতেও প্রথমদিকে কিছুটা সাড়া পাওয়া গেলেও শেষের দিকে মনঃসমীক্ষণের কোন প্রভাব ছিল না। হল্যাণ্ডে কিন্তু তাড়াতাড়িই এর প্রভাব দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডে মনঃসমীক্ষণের জায়গা করে নিতে বেশ সময় লেগেছে, তবে ইংল্যাণ্ডে মনঃসমীক্ষণের একটা স্থায়ী বাসস্থান থাকবে এটা তখনই আশা করা গিয়েছিল। সুইডেনে পি. বিজেরে (P. Bjerre) সম্মোহন পদ্ধতি ত্যাগ করে মনঃসমীক্ষণ অবলম্বন করেন। আর. ভগ্ট ১৯০৭ সালে তাঁর সাইকিয়াট্রিন্স গ্রুন্ডট্রেক (Psykiatrien's grundtrack)-এ মনঃসমীক্ষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমন কি রাশিয়াতেও মনঃসমীক্ষণের প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসতে শুরু করে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অস্ট্রিয়ার এত কাছে থেকেও হাঙ্গেরীর মাত্র একজন মনঃসমীক্ষক এ পর্য্যন্ত দেখা গেছে—ফেরেনজি (Ferenzi)

জার্মানীতে মনঃ সমীক্ষণের অবস্থাটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। এটা ছিল শিক্ষিতলোকদের মধ্যে এবং বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তুমুল আলোচনার বিষয় এবং তাদের প্রচেষ্টা ছিল কি করে এটাকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এটা ছিল ওপরের ব্যাপার; ভেতরে ভেতরে জার্মানীতে মনঃসমীক্ষণের দানা বাঁধছিল। কারণ উত্তরকালে দেখা গেল যে জার্মানীতে এর যথেষ্ট মর্যাদা আছে।

ভৌগোলিক দিক থেকে মনঃসমীক্ষণের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন শাখা প্রশাখারও পরিধি বাড়তে লাগল। ফ্রয়েড দেখালেন যে, কবিদের কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নও অনেকটা লেখা সাহিত্যের বাস্তব স্বপ্নের মত। র‍্যাঙ্কের অজাচার (incest) সম্পর্কে বাজারে নতুন অবদান যোগাল। ১৯১০ সালে ফ্রয়েড সর্বপ্রথম ধর্মশাস্ত্রে মনঃসমীক্ষণের স্থানের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি দেখালেন যে বায়ুরোগগ্রস্ত রোগীদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে (obsession) ধর্মের অনুষ্ঠানাদির যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ডক্টর ফিষ্টার (Dr. Phister) নামে জুরিখের এক ধর্মযাজক বললেন যে ধর্মের গোঁড়ামীর উৎস হ'ল একপ্রকার বিপথগামী যৌনতা। "Totem und Tabu"-এর চারটি রচনাতে মনঃসমীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগত মনোবিজ্ঞানের সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করেছেন ফ্রয়েড। এগুলোতে তিনি সভ্যতার উৎস, রাষ্ট্রের গঠন, নৈতিকতা এবং ধর্ম, অজাচারকে অবৈধ বলা, বিবেক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। "Wit" নামক পুস্তকে তিনি কান্তিবিদ্যায় মনঃসমীক্ষণের অবদানের কথা বলেছেন। শিশুদের মনঃ সমীক্ষনের ব্যাপারেও প্রভূত প্রগতি উপলব্ধি করা গেল।

গোড়ার দিকে মনঃসমীক্ষণের গতিপথ কণ্টকবিহীন ছিল না। মনঃসমীক্ষণের প্রচারের পক্ষে সবচেয়ে অন্তরায় ছিল এই যে মনঃসমীক্ষণ মানুষের ভিতরকার কদাকার মানুষটাকে প্রকাশ করে দেয়। বিরোধীরা প্রথমে এমন কথাও বলতে দ্বিধা করে নি যে মনঃসমীক্ষণ ভিয়েনা শহরের একপ্রকার অসুখ। মনঃসমীক্ষণের সবচেয়ে বড় বাধা এসেছে বোধহয় এই ভিয়েনা শহরে। প্রথমদিকে সমর্থন করলেও শেষের দিকে ব্রয়লার পর্যন্ত এর বিরোধীতা করেন।

যা'হোক, প্রথম অধিবেশনের দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯১০ সালের মার্চ মাসে ন্যুরেমবার্গ শহরে মনঃসমীক্ষণের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে তিনটি মনঃসমীক্ষণের তিনটি শাখা খোলার প্রস্তাব নেয়া হয়—একটি আব্রাহামের তত্ত্বাবধানে বার্লিনে ; একটি জুরিখে ; একটি এ্যাড্‌লারের অধীনে ভিয়েনাতে। ব্রয়লার এ-অধিবেশনে যোগ দেন না। Zentralblatt নামে একটি সাময়িকীও স্থাপন করার প্রস্তাব নেয়া হয় এই অধিবেশনে। এরপর ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে বাইমারে (Weimer) মনঃসমীক্ষণের তৃতীয় অধিবেশন বসে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের চেয়ে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। জে. জে. পুটনাম এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকাতে ফিরে গিয়ে এই অধিবেশনের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ফ্রয়েড নিজে, তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ইয়ুং। চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় তৃতীয় অধিবেশনের দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক শহরে। দুঃখের বিষয় এ-অধিবেশনে ইয়ুং ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার প্রচেণ্টা প্রকাশ করেন এবং ফলে অধিবেশন সফল হয় নি।

১৯১১ সালে এ. এ. ব্রিল-এর অধীনে সর্বপ্রথম আমেরিকাতে মনঃসমীক্ষণের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নাম ছিল 'The New York Psycho-Analytic Society'। কিছুদিন পরে আরও একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর নাম হ'ল 'The American Psycho-Analytic Association' এবং এর সভাপতি হলেন বিখ্যাত পুটনাম (Putnam) আর সেক্রেটারি হলেন জোন্স। এসব শাখার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক সাময়িকীও প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৯০৮ সালে Jahrbuch নামক সাময়িকী স্থাপিত হ'ল। ১৯১০ সালে এ্যাড্লার ও ষ্টেকেলের তত্ত্বাবধানে Zentralblatt জন্ম নিল। ১৯১২ সালে হান্স স্যাক্স (Hans Sachs) ও ওটো র‍্যাঙ্কের (Otto Rank) অধীনে Imago প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এগুলো ছাড়াও বিদেশে আরো অনেক সাময়িকীর জন্ম হ'ল। আমেরিকাতে বিখ্যাত মরটন প্রিন্স (Morton Prince)-এর নির্দেশনায় The Journal of Abnormal Psychology মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক অবদান জোগাল। ১৯১৩ সালে হুয়াইট ও জেলিফ (White & Jelif) আরও একটি জার্নাল প্রকাশ করলেন—Psycho-Analytic Review.

এরপর মনং সমীক্ষণের ইতিহাসে এর বিষাদময় মুহূর্ত নেমে এল। মনঃসমীক্ষকদের সংগঠন থেকে দুটো গোষ্ঠী মতানৈক্যের জন্য বেরিয়ে গেল। প্রথম গোষ্ঠী বেরিয়ে যায় ১৯১০-১৯১১ সালের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি সরে পড়ে ১৯১৩ সালে। এ-দুটো গোষ্ঠীর বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্রয়েড অত্যাধিক মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯১০-১৯১১ সালে ইয়ুং মনঃসমীক্ষণের

কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তিনে ফ্রয়েডের সর্বযৌনবাদে বিশ্বাস করতে পারেন নি। নির্জ্ঞানমনে শুধুমাত্র যৌনতা থাকে—এ ধারণার ঘোর বিরোধী ছিলেন ইয়ুং। অচেতন মনে বিবর্ত্তনের মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাও জমা থাকে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মনঃসমীক্ষণের সংগঠন থেকে সরে পড়লেও ইয়ুং-এর যে মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক অবদান আছে তা' ফ্রয়েড কোনদিনই অস্বীকার করেন নি।

এর কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১৯১৩ সালে সরে পড়লেন আলফ্রেড এ্যাড্‌-লার (Alfred Adler)। ইয়ুং এর মত তিনিও ফ্রয়েডের সর্বযৌনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ফ্রয়েডের মনঃ সমীক্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে তিনি তাঁর মনস্তত্ত্বকে 'ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান' বা Individual Psychology নাম দিলেন। এ্যাডলার বললেন যে শারীরিক হীনতাবোধের জন্যই বায়ুরোগ হয়ে থাকে। শারীরিক এই হীনতা অনেক রকমের হতে পারে। যেমন কারো জন্ম থেকেই একটি হাত খাটো, বা একটি চোখ নেই, বা দেখতে কদাকার, রুগ্ন ইত্যাদি। এই শারীরিক হীনতার জন্য সমাজে এইরূপ শিশুর মিশতে অসুবিধা হয়। নিজেকে ক্রমেই সে সমাজের চোখে হীন বোধ করতে থাকে। হীনতাবোধের সঙ্গে আবেশ জড়িয়ে পড়ে। কারণ সে এই হীনতাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। হীনতাকে ঢেকে রেখে বা ভুলে গিয়ে সমাজের চোখে তার হীনতাকে সে দূর করতে চায়। এটাকেই এ্যাড্‌লার 'হীনতাবোধ' বা inferiority complex বলেছেন। কিন্তু সমাজের চোখে তার এই হীনতা দূর করতে গিয়ে সে অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে বসে সে মনে মনে ভাবে যে সে মোটেও হীন নয় বরং সমাজের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন কোন রুগ্ন শিশুর সমাজের চোখে বহুদিন অবহেলিত হবার ফলে হীনতা বোধ বা inferiority complex হ'ল ; দেখা যাবে এই শিশু তার হীনতাবোধকে দূর করতে গিয়ে এমন সব কাজ করে বসছে যা সুস্থলোকের পক্ষেও দুঃসা-হসের কাজ। এ-সব কাজ করে সে সমাজকে দেখাতে চায় যে সে মোটেও হীন নয়, বরং অনেকের চেয়েই শ্রেষ্ঠ। হীনতাবোধকে দূরে ঠেলে দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের এই প্রচেষ্টাকে এ্যাড্‌লার 'অতিক্ষতিপূরণ' বা over compen-sation বললেন। এই 'অতিক্ষতিপূরণ'ই আসলে বায়ুরোগ। এ্যাড্‌-লারের আরও একটি ধারণা এই যে মানুষ তার জন্মগত হীনতাবোধকে দূর করতে সবসময় ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। মানুষের এই ক্ষমতালিপ্সা বা

"Will to Power" এ্যাড্‌লারের মনস্তত্ত্বে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা অনেকটা দার্শনিক নিট্‌শে-এর Will to Power-এর মত।

যা হোক, ইয়ুং এবং এ্যাড্‌লারের দলত্যাগের ফলে মনঃসমীক্ষণ সাময়িকভাবে একটু আঘাতপ্রাপ্ত হলেও এর প্রভাব চারদিক ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এবং একথা ঠিক যে আজও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ফ্রয়েডই সবচেয়ে বেশী পরিচিত। চিকিৎসার জগতে মনঃ সমীক্ষণের জায়গা করে নিতে অনেক সময় লেগেছে। একদা একে 'পোরণোগ্রাফি' (অশ্লীল লেখা) বলে নিন্দা করা হত। কিছুদিন পরে মানুষের এই ভুল ভেঙ্গে গেল বটে কিন্তু তবুও মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসার জগতে স্থান পেল না। মৌখিক সমর্থন কোন কোন চিকিৎসক দিলেন বটে কিন্তু তাঁরা এর প্রয়োগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। আরও কিছুদিন পর চিকিৎসাশাস্ত্রে মনঃ সমীক্ষণ পংক্তি পেল। মনঃসমীক্ষণের জন্য তখনও সভ্য জগতের এক অংশ নিষিদ্ধ রয়ে গেল—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাতে মনঃসমীক্ষন স্থান পেল না। আশ্চর্যের কথা, শেষ জীবনে ফ্রয়েডকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন মহল থেকে মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে নবদিগন্তের ইঙ্গিত দেয়ার জন্য সম্মান দেখান হয়, কিন্তু গোড়ায় ম্যাসাচুসেট্‌স-এর ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান দেখান নি। ফ্রয়েডকে নোবেল পুরস্কার দেবার কথা উঠেছিল। কিন্তু মানুষ তখনও বোধহয় মনঃসমীক্ষণকে পোরণোগ্রাফি থেকে আলাদা করে ভাবতে পারত না, তাই ফ্রয়েড নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হলেন না। যা'হোক, মনঃসমীক্ষণ থেকে মানুষের উন্নাসিকতা এবং তাচ্ছিল্যের ছায়া ক্রমেই সরে পড়ছে। মনঃসমীক্ষণ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাতে স্থান পেয়েছে। ভদ্র সমাজেও মনঃসমীক্ষণের প্রকাশ্য আলোচনা চলছে। মনঃসমীক্ষণের অন্ধকার দিন চলে গেছে, মনঃসমীক্ষণ আজ মানুষের মুক্ত চিন্তাধারায় এক স্থায়ী স্থান করতে পেরেছে। ভারতবর্ষেও মনঃসমীক্ষণ পিছিয়ে নেই। আমাদের দেশের অনেকেই আজ মনঃসমীক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন।

ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা এ-বিষয়েও অগ্রণী। কলকাতা তথা ভারতের সর্বত্র বহু সমীক্ষক মনঃসমীক্ষণ করে থাকেন এবং অনেক মানসিক রোগী আজ ভারতে নির্দ্বিধায় মনঃসমীক্ষণের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

২

(প্রয়োগ ও পদ্ধতি)

মনঃসমীক্ষকের কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে, এ নিয়ে এখনো একমত হওয়া যায় নি। সাধারণ (general) চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক না হয়েও মনঃসমীক্ষক হতে পারা যাবে কিনা, এ প্রশ্ন ফ্রয়েডের আমলেই উঠেছিল। ফ্রয়েড বললেন যে সাধারণ চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক না হয়েও মনঃ সমীক্ষক হওয়া যেতে পারে। এমন সব মনঃসমীক্ষকদেরকে 'লে এ্যানালিষ্ট' (lay analyst) বলা হয়। তবে 'সাইকো-এ্যানালিস্ট' ও 'লে এ্যানালিস্ট'-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে সাইকোএ্যানালিষ্টরা (মনঃসমীক্ষকদেরকে 'সাইকো এ্যানালিষ্টস্' ও 'লে এ্যানালিষ্টস্' এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে) সাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক এবং মনোবিজ্ঞানে, বিশেষভাবে মনঃসমীক্ষণে, পারদর্শী। তাই তারা স্বাধীনভাবে মনঃসমীক্ষণ করতে পারেন। আর যেহেতু 'লে এ্যানালিষ্ট'রা সাধারণ চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক নন, তাই তাঁরা স্বাধীনভাবে মনঃসমীক্ষণ করতে পারেন না—কোন সাধারণ চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক যদি সপ্রমান (certify) করেন যে রোগী কোন শারীরিক অসুখে ভুগছে না এবং সে মানসিক রোগে ভুগছে তবেই শুধু লেএ্যানালিষ্টরা সেই রোগীর মনঃসমীক্ষণ করতে পারেন। তবে এখন 'লে এ্যানালিষ্ট'দের সংখ্যা খুবই কম। মনঃসমীক্ষণ করা এখন প্রায়ই সাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হয়ে থাকেন। মনঃসমীক্ষকের কোন প্রকার মানসিক জটিলতা থাকলে রোগীর মনঃসমীক্ষণের সময় মনঃসমীক্ষক তার মানসিক জটিলতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং তার ফলে চিকিৎসার ক্ষতি হতে পারে বলে, মনঃসমীক্ষকের উচিৎ নিজের মনঃসমীক্ষণ রোগীর মনঃসমীক্ষনের আগে অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয়া।

মনঃসমীক্ষণ বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে অনেক অর্থও প্রয়োজন। কাজেই খুব কমলোকই মনঃসমীক্ষণের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। অবশ্য আজকাল মনঃসমীক্ষণের সময় বিভিন্ন উপায়ে কমানোর চেষ্টা চলছে। রোগীকে সপ্তাহে ৫–৬ দিন চিকিৎসার জন্য সমীক্ষকের কাছে আসতে হয়। প্রত্যেকদিন ৪৫ মিনিট থেকে একঘন্টা সমীক্ষণ চলে।

এ ভাবে সাধারণতঃ এক থেকে তিন বছর অবধি সময় লাগে মনঃসমীক্ষণ করতে। চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে পূর্ব পরিচিত না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহলে চিকিৎসকের সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রোগীর জ্ঞান সমীক্ষণের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। একটি ঘরে শান্ত পরিবেশে মৃদু আলো ফেলে খাটের ওপর রোগীকে শুইয়ে দেয়া হয়। রোগীকে তার শরীর একেবারে শিথিল করে আরামে শুতে বলা হয়। সমীক্ষক রোগীর মাথার কাছে এমনভাবে বসেন যাতে রোগী সমীক্ষককে দেখতে না পায়, অথচ সমীক্ষক রোগীকে দেখতে পান। এরূপভাবে সমীক্ষকের বসার কারণ এই যে হয়তো রোগীর বিস্ময়কর কোন স্মৃতির কথা শুনে সমীক্ষক বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তাঁর এই বিস্ময়ের অভিব্যক্তি দেখলে রোগী যেমনভাবে পূর্বের অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে তার সমস্ত কিছু বলে যাচ্ছিল তেমনভাবে আর সে বলবে না। রোগীর মধ্যে বাধ (resistance) নেমে আসবে। অন্যদিকে সময় সময় রোগীর মুখের ভাব কেমন হয় তা সমীক্ষকের জানা প্রয়োজন।

মনঃসমীক্ষণের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে ফ্রয়েডের আগে ব্রয়ার 'ক্যাথারটিক' পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। ব্রয়ার প্রথমে সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসা করতেন। তিনি সম্মোহিত অবস্থায় রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলতে বলতেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে এ-ভাবে কিছুক্ষণ কথা বললে রোগী অনেকটা সুস্থ বোধ করে। এই জন্য তিনি এই পদ্ধতিকে বিরেচন বা ক্যাথারটিক পদ্ধতি নাম দিলেন। মনের চাপা ব্যথা যেন সম্মোহিত অবস্থায় রোগসম্পর্কে সর্বকিছু বলাতে বেরিয়ে যেত? কিন্তু ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন যে এ পদ্ধতিতে সাময়িকভাবে মাত্র রোগী সুস্থ বোধ করতে পারে, রোগীকে স্থায়ীভাবে সুস্থ করা এভাবে কিছুতেই সম্ভব নয়। ফ্রয়েড বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্যাথারটিক পদ্ধতিতে রোগীর সাময়িক সুস্থবোধ করার কারণ এই যে এর ফলে নির্জ্ঞানমনের কিছু কিছু জিনিস অনেক সময় বাইরে আসতে পারে। কিন্তু যেহেতু সেগুলো সম্মোহিত অবস্থায় বাইরে আসে সেইজন্য সম্মোহিত অবস্থায় রোগীর স্মৃতি, আবেগ ইত্যাদি চেতনমন স্বাভাবিক অবস্থায় (সম্মোহিত অবস্থায় নয়) কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। তাই ফ্রয়েড বললেন, যে নির্জ্ঞানমনের এই স্মৃতি, আবেগ ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় (সম্মোহিত অবস্থায় নয়) বের করে

আনতে হবে এবং এইসব জিনিসগুলোকে চেতনমনের কাছে হাজির করে তাকে যুক্তি দিয়ে এগুলো গ্রহণ করাতে হবে। তাহলেই শুধু চিকিৎসা সার্থক এবং স্থায়ী হবে। কিন্তু সম্মোহন ছাড়া নির্জ্ঞানমনের এই নিষ্পেষিত জিনিসগুলো কি করে বাইরে আনা যায় এই ছিল ফ্রয়েডের সমস্যা। ফ্রয়েড বললেন যে এটা সম্ভব অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতি দ্বারা।

অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে সমীক্ষক রোগীকে কোনরূপ দ্বিধা না করে তার মনে যা যা আসবে তাই-ই বলে যেতে বলেন। কোন বিষয় বা জিনিস অর্থহীন হলেও বলে যেতে হবে। কোন কিছু অযৌক্তিক হলেও রোগীকে সে জিনিস বলতে হবে। রোগীর সঙ্গে সমীক্ষকের এই চুক্তি হয়ে থাকে। রোগীকে বলা হয় যে সে এভাবে সবকিছু না বললে চিকিৎসা সম্ভব নয়। প্রথম দু'চার বৈঠকের পর রোগীর সঙ্গে সমীক্ষকের এক প্রকার অতিভাব (rapport) সৃষ্টি হয়। ফলে সমীক্ষকের কথামত রোগী সব বলে যেতে থাকে। এভাবে সবকিছু অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে বলে যেতে থাকতে থাকতে দেখা যায় যে এক সময়ে রোগী অবাধ-বলে-যাওয়া থেকে বিরত থাকে। সে থেমে যায়। তাকে থেমে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে হয়তো বলে যে তার আর বলার কিছু নাই, সে সব বলে দিয়েছে। এই স্তরকে বলা হয় বাধ বা resistance. কারণ রোগী বললে কি হবে যে তার আর বলার কিছু নাই, সব বলে দিয়েছে সে, তার আসলে তখনও বলার অনেক কিছু আছে, আসলে আসল জিনিসটিই তখনও বলে নাই। ব্যাপারটি এমন ঃ রোগী ততক্ষণই অবাধে বলে গেছে যতক্ষণ তার ভাবনাচিন্তা তার নিষ্পেষিত অভিজ্ঞতাকে ছুঁয়ে না গেছে। তার ভাসমান সাধারণ চিন্তাধারার কথা সে এতক্ষণ বলেছে। কিন্তু এসব কথা ক্রমে শেষ হয়ে গেলে সে ক্রমশঃ অধিকতর গভীর স্তরের চিন্তাধারার কথা বলতে বলতে যখন একেবারে তার নিষ্পেষিত বেদনাময় অভিজ্ঞতার স্তরে গিয়ে পেঁছিছে তখনই তার অহং থেমে গেছে—কারণ অহং কিছুতেই অচেতনমনের নিষ্পেষিত জিনিসগুলোকে কোন ক্রমে বাইরে আসতে দেবে না, কেননা তাহলে সে (অহং) কষ্ট পাবে। এটাই 'বাধ'।

এই বাধকে কাটানো মনঃসমীক্ষকের সবচেয়ে জটিল সমস্যা। বাধের স্তরে রোগী অনেক সময় চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কখনো সে তার এ-চিকিৎসায় ফল হবে না এমন মত পোষণ করতে থাকে এবং ফলে

আর সে আগের মত ঠিক ঠিক সময়ে এবং রীতিমত বৈঠকের জন্য আসেনা। আবার কখনও মনঃসমীক্ষণকে সে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এসব আসলে তার অহং-এর ভীতি প্রকাশ করে। সমীক্ষকের কাছে এলে তিনি তার (রোগীর) নির্জ্ঞানমনের নিষ্পেষিত বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে বাইরে নিয়ে আসতে পারেন এবং ফলে অহং কষ্ট পেতে পারে বলেই রোগীর নির্জ্ঞানমন তাকে সমীক্ষকের কাছে আসতে দিতে চায় না। বাধকে কাটিয়ে ওঠাতে সমীক্ষকের বিশেষ দক্ষতার দরকার। অভিজ্ঞতা এবং মনঃসমীক্ষণে বিশেষ শিক্ষণ প্রয়োজন এই বাধ কাটানোতে। বাধস্তরে নির্জ্ঞানমনের আবরণ উন্মোচিত-প্রায় হয় বলে এই সময়েই রোগী সবচেয়ে বেশী স্বপ্ন দেখে থাকে। সুতরাং এই স্বপ্নগুলো ব্যাখ্যা করলে তার নির্জ্ঞানমনের স্বরূপটি ধরা পড়বে। আবার ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতেও বাধকে কাটানো যায়। নির্জ্ঞানমনের সম্ভাব্য নিষ্পেষিত কোন জিনিসের ওপর মনকে নিবিষ্ট করে অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে রোগীকে সব কিছু বলে যেতে বললে এই বাধ কাটিয়ে অচেতনমনের খবর পাওয়া যেতে পারে।

'বাধ' কাটিয়ে উঠলে মনঃসমীক্ষণের আরও একটি বড় সমস্যা হ'ল সংক্রমণ (transference)। রোগী তার শৈশবের সংবন্ধ কামকে সমীক্ষকের প্রতি চালিত করে। ফ্রয়েডের মতে ইডিপাস এষণাই মানসিক রোগের মূল কারণ। সংক্রমণে রোগী সমীক্ষকের মধ্যে তার প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে খুঁজে পায়। এটা একটা বড় জটিল সমস্যা। এ-সময় মনে হয় যে রোগী সুস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে যদি সমীক্ষণ শেষ করে দেয়া হয় তবে দেখা যায় যে রোগী আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কারণ সংবন্ধ কামকে সমীক্ষকেব প্রতি চালিত করার ফলে রোগী তার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজন রোগীকে তার সংক্রমণের ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া। সচেতনমনে রোগী যতক্ষণ তার এই সংক্রমণকে বুঝতে না পারবে ততক্ষণ চিকিৎসা কৃতকার্য হবে না। রোগীকে তার রোগের কারণ বুঝিয়ে দিতে হবে এবং তার সংক্রমণ যে অহেতুক তাও বুঝিয়ে দিতে হবে। তার মনে বিশ্বাস জম্মাতে হবে যে অন্যান্য আর দশজন লোকের মত সেও মুক্ত বিশ্বে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির মত চলতে পারে। এটাই হ'ল চিকিৎসার সার্থক সমাপন।

মনঃসমীক্ষণ দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা। তাই একটি বাস্তব চিকিৎসার সম্পূর্ণ বিবরণ দেয়া এখানে সম্ভব নয়। জেম্‌স. সি. কোলম্যান-এর

'এ্যাবনরম্যাল সাইকোলোজি এ্যাণ্ড মডার্ণ লাইফ' (James C. Coleman : Abnormal Psychology and Modern Life) থেকে (পৃঃ ৫৯১) একটি বাস্তব চিকিৎসার কিয়দংশ নীচে তুলে দেওয়া হ'ল। এ-থেকে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হতেপারে।

"রোগিনীঃ ডক্টর, তিন বছর আগে আমার একবার ইনফ্লুয়েন্জা হয়েছিল কিন্তু তার আগে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সুখী ছিলাম। এই অসুখের সময়, যখন আমার জ্বর ছিল, তখন আমি কিছু দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। এর মাস কয়েক পরই আমার কিছু স্নায়ুরোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এ-লক্ষণগুলো চলে গেলে এই সমস্ত অসম্ভব ইচ্ছা এবং ভয় শুরু হ'ল। এ-গুলো তখন থেকেই আমার আছে এবং শত চেষ্টা করেও এ-গুলো দূর করতে পারছি না।

প্রথম লক্ষণগুলোর মধ্যে ছিল অত্যধিক নির্জীবতাঃ আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারতাম না। আমার বুক ধড়ফড় করত আর মাথার পেছনদিকে ছিল ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা। এরপর এল নিদ্রাহীনতাঃ আরও পরে, ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। আমি রাত্রে জেগে উঠতাম, আমার চিৎকার করতে ইচ্ছা হ'ত। আমি ভাবতাম, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। একখানি বইতে আমি কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে পড়েছিলাম এবং এরপর থেকে আমার মাথা থেকে আমি কিছুতেই **শব্দটিকে** (কুষ্ঠরোগ) দূর করতে পারছিলাম না।

আমি একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলামঃ

'আমি যাচ্ছিলাম······ষ্টেশনে, ট্যাক্সিতে, একটি লোকের পাশ কাটিয়ে গেলাম, লোকটি হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা করছিল। লোকটির মাথা ছিল না এবং আমি জানতাম লোকটির কুষ্ঠরোগ ছিল।

আমি আরও একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার নিয়োগ-কর্তা (employer) আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আমার মনে হচ্ছিল, তিনি আমার কোন ক্ষতি করবেন।'

এই স্বপ্নটিরও দীর্ঘকাল যাবত প্রভাব আছে। কারণ এখন তিনি যখন আমার পেছনে আসেন, তখন আমার ভীষণ

ভয় হয়। এটা অসম্ভব জানি তবুও এটাকে কিছুতেই দূর করতে পারি না।

এরপর আরও একটি স্বপ্ন দেখলাম।

'স্বপ্নে দেখলাম তিনি আমার দিকে পেছন থেকে আছেন এবং নীচু হয়ে কিছু করছেন এবং আমি তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত করলাম।'

এই স্বপ্নের পরই আমার লেগে থাকা লক্ষণগুলো শুরু হ'ল। অচিরেই আমার তাঁর পিঠে ছুরিকঘাত করার একটা ইচ্ছা বা আবেগ হ'ল। অবশ্য এর সঙ্গে ছিল একটা সদাসর্বদা ভয়। অফিসে পড়ে থাকা একজোড়া কাঁচির দিকে তাকাতেও আমার ভয় হয়। এটা একদম অসম্ভব, কারণ সত্যি আমি লোকটিকে **খুবই** ভালবাসি।

বরাবরই আমার একটি শক্তিশালী ও পরিষ্কার মন ছিল। তাই এটা দারুণ মর্মান্তিক যে আমি এইসব লক্ষণের কবলে পড়ব—কুষ্ঠরোগ এবং খুন করার ইচ্ছা। এক ডাক্তার আমাকে বেশ কয়েকবছর আগে বলেছিলেন যে এ সব যৌন নিষ্পেষণের ফলে হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। পাগল হবার ভয় ছাড়াও, এখন আমার মধ্যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা আছে।

এখন আপনার কাছে আমাকে শেষ চেষ্টায় জন্য পাঠানো হয়েছে বটে, কিন্তু, বিনয় সহকারে বলছি, এই মনোবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস নেই। আমি বিশ্বাস করি এসব একদম অর্থহীন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিন বছর যাবত আমার এ-লক্ষণগুলো আছে এবং এগুলোর একটা কিছু করা প্রয়োজন।

সমীক্ষক : তিন বছর আগে আপনার যে স্বভাব এবং আবেগ ছিল এবং যেগুলো এখন নাই, সে গুলোতে আপনি সন্তুষ্ট ছিলেন?

রোগিনী : না, তা আমার মনে হয় না। তিন বছর আগে মাত্র একটি ঘটনা ঘটেছিল—আমি আমার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে আমার সৎমা এবং বাবার সঙ্গে বাস করছিলাম।

এ'কথা থেকে মনে পড়ছে যে আমি আমার বাবাকেই ছুরিকাঘাত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই বাবার পরিবর্তে আমার

নিয়োগকর্তাকে ছুরিকাঘাত করার ইচ্ছা আসল। মনঃসৃষ্টিতে (phantasy) আমি কল্পনা করেছি, আমি তাঁকে রুটি কাটার ছুরি দিয়ে পিঠে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করছি। কল্পনা করছিলাম, তিনি ঝুঁকে আছেন, স্পষ্ট দেখলাম আমি হাত উঠিয়েছি, তাঁর ওপর ঝুঁকেছি ! এই ছবি বার বার মনে আসতে থাকল। মাঝে মধ্যে এ-ছবি না এসে আত্মহত্যার কথা মনে হয়। তখন আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতাম আমি আমার গলা কেটে ফেলছি।

সমীক্ষক : আপনার বাবার অথবা নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ আছে কি ?

রোগিণী : শৈশবে বাবা ছিলেন আমার আদর্শ। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারলাম যে বাবাই আমার মাকে অসুখী করেছেন। পরোক্ষ-ভাবে ভাবতাম, বাবাই মায়ের অপরিণত বয়সে মৃত্যুর কারণ। তারপর থেকে বাবাকে আমি ঘৃণা করতাম। কিন্তু এখন আমার আবেগগুলো বাবাকে ঘিরে নয়, নিয়োগকর্তাকে ঘিরে যিনি সবসময় আমার কাছে খুব ভাল ছিলেন। তিন বছর আগে এই বিপর্যয় আরম্ভ হবার পূর্বে চৌদ্দ বছর যাবৎ এই নিয়োগ-কর্তার সঙ্গে আমি খুবই সুখে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সর্বদা বেশ ভাব ছিল।

তিনি নিজের ব্যবসা নিজেই চালান। তিনি বলেন যে এর সফলতা সবটাই আমার জন্য, আমার দক্ষতার জন্য এবং আমি তাঁকে যে সাহায্য করেছিলাম তার জন্য। অবশ্য, আমার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতা দিয়ে আমি তাকে সাহায্য করেছি, কারণ আমার বয়স যখন বাইশ বছর তখন থেকেই আমি তাঁকে ভালবাসছি।

কিন্তু আমার অসুস্থতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই এবং আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে এসম্পর্কে আমি আর কিছু বলব না।

(এখানে চিকিৎসক আবার তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে অবাধ ভাবানুসঙ্গই তাঁর কাজ এবং তাঁর (রোগিণীর) মনে যা কিছু আসুক না কেন তা' তাঁর (চিকিৎসকের) কাছে না বলা উচিৎ নয়—এবং সম্পূর্ণ স্পষ্টবাদিতা চিকিৎ-সার সফলতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।)

রোগিণী : আচ্ছা, বেশ, আপনি যদি চান, আমি বলব। আমি তাঁর বিয়ে ভাঙ্গি নি। আমি তাঁকে যখন দেখি তার আগেই তাঁদের বিয়ের ব্যাপারটা ঠাণ্ডা এবং মৃতপ্রায় হয়েছিল। আমি সম্পূর্ণভাবে চেয়েছিলাম যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ডিভোর্স করুক। কিন্তু তিনি (স্ত্রী) রাজী ছিলেন না। তিনি (স্ত্রী) বললেন : 'আপনি যদি তার সহধর্মিণী হতে চান তাহলে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করুন।' এটা অনেকদিনের কথা, তখন আমার বয়স ছিল বাইশ বছর। আমার মনে হয়েছিল তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে আমি জীবনে ভালবাসতে পারি। আমার হতভাগা অসুখের আগে এ কয় বছর আমরা খুবই সুখী ছিলাম।

সমীক্ষক : তিন বছর আগে আপনার কি কোন সন্তুষ্টি ছিল যা' আপনি এখন পাচ্ছেন না ?

রোগিণী : হ্যাঁ, অবশ্য। আপনাকে আগেই বলেছি যে তখন পর্যন্ত আমার নিজস্ব ফ্ল্যাট ছিল এবং তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে আমার কাছে আসতেন এবং যতক্ষণ খুশী থাকতেন। যখন থেকে আমি আমার বাবা এবং সৎমায়ের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলাম তখন থেকে স্বাভাবিকভাবেই আমরা শুধু মাত্র ব্যবসার ক্ষেত্রে মিলতে পারছি এবং ভালবাসাবাসির খুব কম সুযোগ পাচ্ছি এবং তাও খুব সুখের হচ্ছে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এর সঙ্গে আমার লক্ষণগুলোর কি সম্পর্ক আছে। শুধুমাত্র আপনি যেমন বলেছেন, এ-দুটোর মধ্যে সমসাময়িকতা থাকতে পারে। এখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি ভীত এবং আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হতে পারে বলে আমার ভয় আছে। এ-পর্যন্ত আমি বেশ বুদ্ধিমতী ছিলাম। এসব আবেগ ও ভয় এবং এই ভয়ংকর শব্দটি জোর করে অধিকার স্থাপন করছে বলে আমি বিরক্ত বোধ করছি।

সমীক্ষক : সম্ভবত আপনি সবসময় আপনার আবেগ এবং অনুভূতিগুলোকে বেশ জোরের সঙ্গে প্রতিহত করেছেন।

রোগিণী : হ্যাঁ, আমি জানি আমার সবসময় শক্তিশালী অনুভূতি ছিল—নোংরা জিনিসের প্রতি বিরক্তির প্রবল অনুভূতি। আমি জানি ভালবাসার প্রবল অনুভূতি আমার আছে। ভালবাসা মানে ত্যাগ,

মানুষের যন্ত্র। এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমি মাঝে মধ্যে অনুভব করেছি যে তাঁকে এত ভালবাসি যে আমি তাঁকে খেয়ে ফেলতে পারি।

সমীক্ষক ঃ এবং আপনি এখন বোধহয় বলছেন ঃ 'আমি তাকে এত ভালবাসি যে আমি তাঁকে ছুরিকাঘাত করতে পারি।'

রোগিণী ঃ উঃ, না ! এর কোন অর্থ হয় না !

সমীক্ষক ঃ যতক্ষণ না আপনি বলছেন, 'আমি তাঁকে এত ঘৃণা করি যে তাঁকে ছুরিকাঘাত করতে পারি।'

রোগিনী ঃ আমি জানি কতকগুলো জিনিসের প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে আমি তাঁকে ঘৃণা করি।

আমি পশুদের ঘৃণা করি। পশুরা আমাকে স্পর্শ করুক এ আমি সহ্য করতে পারি না। চুল বা লোমও আমি সহ্য করতে পারি না। একসময়ে আমার ধারণা ছিল যে কুষ্ঠরোগ লোমের দ্বারা ছড়িয়ে থাকে এবং আমি বিশ্বাস করি না যে আমার এ ধারণা চলে গেছে।···আমি কখনো লোমে তৈরী পোষাক পরতে পারি নাই। আমি লোম নাড়াচাড়া বা স্পর্শ করতে পারি না।

সমীক্ষক ঃ আপনি আর কি কি নাড়াচাড়া করতে পছন্দ করেন না ?

রোগিণী ঃ কাদা, ক্রিমি এবং মাকড়সা। যেসব জিনিস সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয় সেগুলো স্পর্শ করতে আমার সব সময়ই ঘিন্ ঘিন্ করে। এসব জিনিসের কথা মনে হলেই আমার ঘৃণা অনুভব হয়, একপ্রকার ঠাণ্ডা ভয় হয় এবং 'কুষ্ঠরোগ' এই শব্দটি আমার মাথায় আসে। আমি কখনোই বিড়ালছানাকে মৃদু আঘাত করতে পারি নাই এবং যদি একটি পাও আমার গায়ে শরীর ঘষে তা'হলে আমি ভয়ে দারুণ ভীত হয়ে যাই যেমন নাকি আমার এ-সব চিন্তাতে আমি ভয়ে দারুণ ভীত হই। এটা কি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে যে আমি যখন বেশ ছোট ছিলাম তখন আমি কারো স্পর্শ পছন্দ করতাম না।···

যৌবনে অর্থাৎ বাইশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত একজন অথবা দুইজন লোকের থেকে এই ধরনের ভয় অনুভব হয়েছিল, একপ্রকার

ঠাণ্ডা ভয়। আমি পশুপ্রায় এক ব্যক্তির কথা ভাবছি। আমি ভাবছি সেইসব লোকদের থা যারা আপনার সঙ্গে নাচার সময় আপনার সুযোগ নেয়। এই দুই ব্যক্তির যে কেউ নাচবার সময় যখন আমার বাহু স্পর্শ করত তখন আমার ঠাণ্ডা ভয় হ'ত, যেমন নাকি 'কুষ্ঠরোগে'র কথা ভাবলে হয়। এদের একজনের আবার আমাকে খুব কাছাকাছি ধরে রাখার নোংরা অভ্যাস ছিল এবং সে বীভৎস ইঙ্গিত দিয়ে আমার বাহুতে আঘাত করত।

সমীক্ষক : এতে কি ইঙ্গিত থাকতো ?

রোগিণী : উঃ. নোংরা একটা কিছু—আমার মনে হয়, মৈথুন।

সমীক্ষক : আপনি যে বক্র পিঠে ছুরিকাঘাত করতে চান সেটা কি ইঙ্গিত দেয় ?

রোগিণী : একটি বাঁকা ছুরি : ঐ বাঁকা মোড়ক করার সূঁচ যা'দিয়ে আমার প্রেমিককে আঘাত করার কথা আমি একবার ভেবেছিলাম। উঃ, ডাক্তার, আপনি আমাকে ভীষণ বীভৎস জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ও-সব সম্বন্ধে আমি কি ভেবেছিলাম, তা আপনাকে আমি বলতে পারব না।

আমার বয়েস যখন ঊনিশ বছর, তখন আমি যৌন রোগ সম্পর্কে একটি ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম। এ দেখে আমি দানবীর মত সাদা হয়ে গিয়েছিলাম ভয়ে। আমার মনে হচ্ছিল সবকিছুই বেশ ভয়ঙ্কর। নোংরা, পাপ এবং যৌনতা সবই এক—যৌন রোগের মত এবং তখন আমার মনে হয়, কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে আমি যখন ভাবি তখন আমার এই অনুভূতিই হয়।

এসব জিনিসে আমার ভীষণ ভয় ছিল এবং তখন কেউ আমাকে স্পর্শ করুক এ আমি চাইতাম না এবং তা'সত্ত্বেও তখনই আমি লোকটির এত প্রেমে পড়ে গেলাম যে আমি তাকে বাধা দিলাম না। আমার বাবা তাঁর পছন্দ করা এ-লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ চিন্তা আমাকে প্রায় পাগল করেছিল। আমি এই লোকটিকে সহ্যই করতে পারতাম না—এমনকি আমার কনুই স্পর্শ করলেও সহ্য করতে পারতাম না, অথচ লোকটির কাছে ইচ্ছা করেই আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

লোকটি বিবাহিত ছিল। আমার মনে হয় না লোকটির সঙ্গে আমি মৈথুন করতে চেয়ে ছিলাম। আমি মনে করি না আমার তরফ থেকে মৈথুন চাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু লোকটিকে আমি এত ভালবেসেছিলাম যে আমি তাকে কিছুই প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না। আমি তার কাছে থেকে চুম্বন ও আদর না চেয়ে তাঁকে মনে মনে অত বেশী ভালবাসতে পারতাম না। তিনি যখন প্রথম আমাকে চুম্বন করেছিলেন, তখন আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু এর বেশী যা হয়েছিল তা আমি পছন্দ করি নাই। আমি বুঝতাম না তিনি কেন এর মধ্যে যৌনতা আনতে চেয়ে ছিলেন।

আমার যদিও কখনো কখনো এটা ভাল লাগতো তবুও এখন এটা আমার বেশীর ভাগই ভাল লাগে না। কিন্তু, আজও অবশ্য আমি কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করতে পারি নাই। এটা প্রায়ই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়, অথচ আমার স্বভাবই এই যে আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

সমীক্ষক ঃ এই অনুভূতি থেকে কি ভাবানুসঙ্গ হয় ?

রোগিণী ঃ ঐ-সব বীভৎস লোকদের কথা, যাদের কথা আগে বলেছি, যারা ইঙ্গিত দিয়ে আমার বাহু স্পর্শ করত। আমার এখন মনে পড়ে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অল্প বয়েসে কিভাবে বাবাকে আমার চুম্বন করতে হ'ত। আমি এটাকে ঘৃণা করতাম।

সমীক্ষক ঃ সুতরাং এখন যে ঘৃণাকে খুঁজেছিলাম তাকে পেলাম। এর সঙ্গে আপনার কি ভাবানুসঙ্গ হয় ?

রোগিণী ঃ ঐ ঠাণ্ডা ভয়। ঐ অনুভূতি যা' কুষ্ঠরোগে'র কথা ভাবলে আমার হয়। স্বপ্নের ঐ মস্তকবিহীন ব্যক্তি। কোন নৃশংসতা করা হচ্ছে। নোংরামি, মৈথুন। ছুরিকাঘাত করার অদম্য ইচ্ছা। এবং এর প্রতি আমার যে ভয়।

সমীক্ষক ঃ সুতরাং আপনার বাইশ বছর বয়েসের আগে নাচবার সময় কারো স্পর্শকে আপনি স্পষ্টতঃ যে বাধা দিতেন তা' এখনো যায় নাই। এই লোকটিকে ভালবাসা সত্ত্বেও এটা মনে হয় এখনো আছে। আপনার ভালবাসার জন্য তাঁকে আপনি যা খুশী করতে দেন, কিন্তু একই সঙ্গে প্রায়ই আপনার পুরানো সেই প্রতিবন্ধ থাকে

সেই ঠাণ্ডা ভীতির অনুভূতি এবং সেই 'কুষ্ঠরোগের' কল্পনা—যা', মনে হয়, যৌন রোগেরই নামান্তর। আপনার প্রতিবন্ধকে দূর করতে আপনি যদিও তাকে সহায়তা করেন, তবুও, মনে হয়, কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনার প্রতিবন্ধ প্রতিহিংসায় পরিণত হয় এবং তখনই আপনি তাঁকে (him) অথবা এটাকে (it) পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে চান।"

মনঃসমীক্ষণ বিশেষ ভাবে বায়ুরোগ, চরিত্রবিকৃতি এবং স্কিজোফ্রেনিয়াতে চিত্তভ্রংশ বাতুলতাতে ব্যবহৃতহয়ে থাকে। ফ্রয়েডের মতে সংক্রামণাত্মক বায়ুরোগে (Transference neurosis) মনঃসমীক্ষণ খুব কার্যকরী। তাঁর মতে মূর্ছারোগ, অহেতুক ভয় (phobia) এবং আবিষ্ট বায়ুরোগ (obsessional neurosis)—এ তিনটিই সংক্রামণাত্মক বায়ুরোগের অন্তর্ভুক্ত। সাইকোসিস-এ মনঃসমীক্ষণের কার্যকরীতা সীমাবন্ধ। রোগী যদি মনঃ-সমীক্ষণকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে, যদি সে মনঃসমীক্ষণের চেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে তাহলেও এ-রকম চিকিৎসা সম্ভব নয়। মনঃসমীক্ষণ রোগীর অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা না থাকলে সম্ভব নয়, এদিক দিয়ে এ-চিকিৎসা সীমাবন্ধ। ৪৫ বছরের উর্দ্ধে যে সব রোগী, তাদের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ সাধারণতঃ চলে না, অবশ্য রোগীর মানসিক সজীবতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে সম্ভব হতে পারে। যে সব রোগী অত্যধিক পরনির্ভরশীল, সারা জীবনে যারা কোনদিন আত্মনির্ভর ছিল না তাদের বেলাতেও মনঃসমীক্ষণ কম কার্যকরী (Lawrence C. Kolb, M. D. : Noyes' Modern Psychiatry)। কিন্তু এ-সব সীমাবন্ধতা থাকা সত্ত্বেও দ্বিধাহীনভাবে বলা যেতে পারে যে মানসিক রোগের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে মনঃসমীক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মনঃসমীক্ষণ, তার সীমাবন্ধতা সত্ত্বেও, বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগে প্রযোজ্য। মনঃসমীক্ষণের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে এ রোগের সাময়িক বা আপাত (palliative) নিরাময় করে না—ফ্রয়েডের মতে একমাত্র মনঃসমীক্ষণেই মানসিক রোগের স্থায়ী মূলোৎপাটন সম্ভব।

(বিস্তার ও বিতর্ক)

(৩)

ফ্রয়েড সর্বপ্রথম 'মনঃসমীক্ষণ' এই পদটিকে একটি বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এটি একটি বিশেষ মতবাদের নামে পরিণত হ'ল। মনঃসমীক্ষণ মানুষের অজানা অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলিয়েছে এবং মানুষের মনের অনেক গভীর স্তরের অনেক অতবাক্ করা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছে। ফ্রয়েড জীবদ্দশাতেই মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসাশাস্ত্রের গণ্ডি পেরিয়ে সাহিত্য, দর্শন, নৃতত্ত্ববিদ্যা, ধর্ম, শিল্প, ইত্যাদিতে প্রভাব বিস্তার করল। সাহিত্যে মানুষ অবচেতন মনের রহস্যের কথা জানতে চাইল। মানুষের মনের বেশীর ভাগটাই যে অযৌক্তিক বা যুক্তিহীন (irrational) তা' ফ্রয়েডের আগে কেউ এত সুষ্ঠু করে বলেন নাই। তাই মনঃসমীক্ষণের শুরু থেকেই সাহিত্যে মনের এই নির্জ্ঞান ও অযৌক্তিক প্রকোষ্ঠের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল। সাম্প্রতিক কালের অনেক নাটক, উপন্যাস, ইত্যাদি মনঃসমীক্ষণের দ্বারা এত বেশী প্রভাবান্বিত যে এগুলো পড়লে মনে হবে যে এগুলো কতকগুলো মানসিক রোগীর মনঃসমীক্ষণের বিবরণ মাত্র। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত অথবা মনঃ-সমীক্ষণের সঙ্গে কোন না কোন মিল আছে এমন কয়েকটি মাত্র রচনার উল্লেখ করা হল ঃ—

১। এলিজাবেথ বৌয়েন ঃ 'ডেথ্ অফ দি হার্ট' (উপন্যাস)
২। জেনিফার ডসন্ ঃ 'দি হা-হা' (উপন্যাস)
৩। ফেদর দোস্তোয়েভস্কি ঃ 'দি ইডিয়ট্' (উপন্যাস)
৪। উইলিয়াম ফক্নার ঃ 'দি সাউন্ড এন্ড দি ফিউরি' (উপন্যাস)
৫। এফ. স্কট ফিজর‍্যাল্ড ঃ 'টেন্ডার ইজ দি নাইট' (উপন্যাস)
৬। উইলিয়ম গোল্ডিং ঃ 'লর্ড অফ দি ফ্লাইস্' (উপন্যাস)
৭। ফ্রান্জ কাফ্কা ঃ 'দি ট্রায়াল' (উপন্যাস)
৮। ডি. এইস. লরেন্স ঃ 'সন্স এ্যান্ড লাভার্স' (উপন্যাস)
৯। আর্থার মিলার ঃ 'ডেথ অফ এ সেল্সম্যান' (নাটক)
১০। ইউগেন ও'নীল ঃ 'লং ডেজ জার্নি ইনটু নাইট' (নাটক)

এছাড়া সমালোচনা সাহিত্যেও দেখা যাচ্ছে যে মনঃসমীক্ষণের দিক থেকেও সব রচনাকে বুঝতে চেষ্টা করা হচ্ছে। দর্শনে ফ্রয়েডের আগে সাধারণ ধারণা ছিল যে মানুষ শুধু 'যুক্তিবৃত্তিসম্পন্নজীব' (rational-animal : Aristotle)। ফ্রয়েড দার্শনিকদের এই ভুল ভেঙ্গে দিলেন। তিনি দেখালেন যে মানুষের মনের বেশীরভাগই অযৌক্তিক, নির্জ্ঞান। ফলে দর্শনে নতুন নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হ'ল। ফ্রয়েড তাঁর 'দি ফিউচার অফ এ্যান্ ইলিউশন্'-এ ধর্মকে একটি অলীক কল্পনা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে শৈশবে ব্যক্তি বাবাকেই আদর্শ মনে করে, কেন না বাবার চেয়ে বড় কিছু হতে পারে অথবা বাবার মধ্যে কোন অপূর্ণতা থাকতে পারে, এ-সে ভাবতেই পারে না। বড় হলে বাবার মধ্যে অনেক অপূর্ণতা দেখতে পায়, তাই সে বাবাকে আর আদর্শ বলে ধরে নিতে পারে না। অথচ তার আদর্শ বলে একটা জিনিস থাকেই। কিন্তু কে হবে এই আদর্শ? তাই ব্যক্তি কল্পনায় ঈশ্বর বলে এক বস্তুকে ধরে নিয়ে তাঁর ওপর তার আদর্শ আরোপ করে। ফ্রয়েডের মতবাদ তাই ধর্মের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছে। শিল্পেও শিল্পীরা এখন অবচেতনমনের অভিব্যক্তিতেই বেশী জোর দিচ্ছেন। নৃতত্ত্ববিদ্যা, ধর্ম, পরিবার, সমাজ, ইত্যাদির উৎস মনঃ-সমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে চেষ্টা করছে। সুতরাং একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যেতে পারে যে মনঃসমীক্ষণ মানুষের চিন্তার জগতে এক বিরাট বিপ্লব এনেছে।

এতো গেল মনঃসমীক্ষণের একদিকের বিস্তারের কথা। অপর দিকে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের থেকে শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে বিরাট মহীরূহ সৃষ্টি করেছে। এ-সব শাখাপ্রশাখার কথা আলোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের শুধু এইটুকু মনে রাখলেই হবে যে এ-সব শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিভেদ থাকলেও মূল কয়েকটি বিষয়ে সবাই একমত। প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে অবচেতন বা নির্জ্ঞান মন বলে একটা জিনিস আছে আর প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে শৈশবের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্বকে স্থায়ী ভাবে অথবা প্রায় স্থায়ীভাবে গড়ে তোলে।

ইয়ুঙ্‌-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। ইয়ুং সর্বপ্রথম ফ্রয়েডের থেকে দূরে সরে আসেন। ইয়ুং সর্বযৌনতাবাদে আস্থা রাখতে পারেন নাই। ফ্রয়েডের libido (কাম) শব্দটিকে ইয়ুং অনেকটা বার্গস-এর e'lan

vital (জীবনী শক্তি)-এর মত করে ব্যাখ্যা করেছেন। ইয়ুং-এর আরও একটি মূলধারণা ফ্রয়েডের মতবাদের বাইরে। ইয়ুং বলেছেন, ব্যক্তির নির্জ্ঞান-মনে শুধু তার জীবনের নিষ্পেষিত অভিজ্ঞতা এবং দেহভিত্তিক অদসুই (ontogenetic) বর্তমান থাকে না। ব্যক্তির নির্জ্ঞানমনে বিবর্তনগত (phylogenetic) সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলোও বর্তমানথাকে। এইজন্যই বিভিন্ন জাতির জীবনের কতকগুলো মূল বিষয়ের মধ্যে এখনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির উপকথা, শিল্প, কল্পনা এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু কিছু মিল দেখা যায় (archetypes) এইজন্যই।

ইয়ুং-এর পর এ্যাড্‌লার দূরে সরে এলেন। তাঁর 'হীনতাবোধের' (inferiority complex) কথা জানে না এমন লোক কম আছে। এ্যাড্‌লারও সর্বযৌনতাবাদে বিশ্বাস করতেন না। এ্যাড্‌লারের মনস্তত্ত্ব-ও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ওটো র‍্যাঙ্ক-ও ফ্রয়েডের সর্বযৌনতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। অবশ্য এ-কথা যেন আমরা ভুলে না যাই যে ইয়ুং, এ্যাড্‌লার, র‍্যাঙ্ক এবং অন্যান্য যে সব মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের সর্বযৌনতা-বাদে বিশ্বাসী নন, তাঁরা যৌনতাকেই মানসিক রোগের একমাত্র কারণ এবং ব্যক্তিত্বগঠনের একমাত্র মূল উপাদান বলে ধরে নেন নাই বটে, কিন্তু তাঁদের মতেও যৌনতা মানসিক রোগের একটি বড় কারণ এবং ব্যক্তিত্বগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বটে, যদিও যৌনতার ওপর সবাই একইভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। যা হোক, এ-ভাবে কারেন হর্নে, এরিচ্ ফ্রোম্, সুল্লিভান প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা এবং অস্তিত্ববাদী মনোবিজ্ঞানীরা সবাই ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান থেকে দূরে সরে এসেছেন। অবশ্য এ-কথা কখনোই অস্বীকার করা যাবে না যে এঁরা সবাই কম-বেশী ফ্রয়েডের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত। বলা যেতে পারে ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের (অবচেতন ও নির্জ্ঞান মন) ইঙ্গিত না দিলে এঁদের এমন নতুন চিন্তাধারা সম্ভব হ'ত না।

ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের বহুধা সমালোচনা হয়েছে। এই সমালোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—এক, মতবাদগত (theoretical); দুই প্রয়োগগত (practical)। মতবাদের দিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে ফ্রয়েডের সর্বযৌনতাবাদকে এখন অনেকেই আমল দেন না। তবে, যে

কথা আগেই বলা হয়েছে, যৌনতা মানুষের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকর্মে যে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে একথা কেউই অস্বীকার করেন না। জীব-বিজ্ঞানের দিক থেকেও বলা যেতে পারে যে মানুষই হচ্ছে জীবজগতে সবচেয়ে বেশী যৌনতাগ্রস্ত (sexual) প্রাণী। তবুও বলতে হবে ফ্রয়েডের মতবাদে যৌনতা নিয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে সব স্তরের কথা ফ্রয়েড বলেছেন তা-ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র যৌনতার ওপর নির্ভর করে এ-কথা বেশীর ভাগ মনোবিজ্ঞানীই মানতে রাজী নন। ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার, সমাজ, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার বিরাট ভূমিকা আছে। ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বও অনেক মনোবিজ্ঞানীর কাছে স্বপ্নের উদ্ভট ব্যাখ্যা। রাশিয়ার শারীরতত্ত্ববিদ মনোবিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভ (I. P. Pavlov) সেখানকার মনোবিজ্ঞানীদের শিরোমণি। বলতে গেলে প্যাভ্‌লভই রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলী (physiology of the higher nervous activtiy) সম্বন্ধে গবেষণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মানসিক সমস্ত কিছুই শরীরতত্ত্বের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য ফ্রয়েডও হেম্‌হজের মতে বিশ্বাসী ছিলেন। হেমহজও বলেছেন যে মানসিক সমস্ত ঘটনাই শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ফ্রয়েডও বলেছেন ঃ[১]

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের মনোবিজ্ঞানের সম্ভাব্য সব ধারণাই একদিন শরীরতাত্ত্বিক সংস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং সম্ভবতঃ বিশেষ ধরনের উপাদান এবং বিশেষরকমের রাসায়নিক পদ্ধতি মানসিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ফ্রয়েডের এ-ধারণা থাকা সত্ত্বেও মনে হয় তার মতবাদ এবং রচনাতে কল্পনার প্রভাব আছে। তাই বোধহয় বিখ্যাত যৌন বিজ্ঞানী হ্যাভ্‌লক (Havelock Ellis) বলেছিলেন যে ফ্রয়েডকে একজন বড় বৈজ্ঞানিক না বলে বড় শিল্পী বলা উচিৎ।

মানসিক রোগের কারণ সম্পর্কে ফ্রয়েডের ইডিপাস্ এষণার মতবাদকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। প্যাভ্‌লভ্ কুকুরের ওপর পরীক্ষামূলক বায়ুরোগ

"(We must rocollect that all our provisional ideas in psychology will some" day based on an organic substructure. This makes it probable that special substances and special chemical processes control the operation......"

(Noyes' Modern Clinical Psychiatry : Kolb, M. D. Page 574.)

(experimental neurosis) সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এ-পরীক্ষা ফ্রয়েডের মতবাদকে অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছে। ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বেও প্যাভ্‌লভ্‌ তথা রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস নাই। যে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে ফ্রয়েডের দু'শত পৃষ্ঠার ঊর্ধ্বে লেগেছিল সেই স্বপ্নপ্যাভ্‌লভ্‌ মাত্র কয়েকটি কথায় ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লেনিনগ্রাডে সাইকিয়াট্রিস্ট, নিউরোপ্যাথলজিস্ট এবং নিউরোসাইকোলজিস্টদের এক অধিবেশনে প্যাভ্‌লভ্‌ 'ঘুমের সমস্যা' (The Problem of Sleep) শীর্ষক একটি রচনা পাঠ করেন। এর পর ঐ অধিবেশনে আলোচনার সময় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে ঘুমে উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের বাধ-ই (inhibition) স্বপ্নের কারণ। প্যাভ্‌লভের মতে শব্দ (word) স্বাভাবিক উদ্দীপকের (unconditioned stimulus) সঙ্গে মিশে গিয়ে অস্বাভাবিক উদ্দীপকের (conditioned stimulus) মত কাজ করতে পারে। এটাকে তিনি স্তরের সংকেত (second signal) বলেছেন। তাঁর মতে বাগানের সতেজ লাল গোলাপটির ছবি হয়তো প্রথম স্তরের সংকেত আর 'গোলাপ' এই শব্দটি দ্বিতীয় স্তরের সংকেত। প্যাভ্‌লভ্‌ বলেছেন যে জাগ্রত অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরের সংকেত কাজ করে আর প্রথম স্তরের সংকেতে তাই বাধ নেমে আসে (negative induction)। প্যাভ্‌লভ্‌ বলেছেন যে ঘুমের সময় উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রে (যেখানে দ্বিতীয় স্তরের সংকেত থাকে) যখন বাধ নেমে আসে তখন ঘুমন্ত ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক উদ্দীপকগুলো প্রথম স্তরের সংকেত হিসেবে স্বপ্নের সৃষ্টি করে থাকে।'

প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকেও মনঃসমীক্ষণকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ তো সোজাসুজি মনঃসমীক্ষণের দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যায় কিনা এই প্রশ্ন তুলেছেন। কোলম্যান তাঁর 'এ্যাবনর্মাল সাইকোলজি এ্যান্ড মডার্ন লাইফ'-এ (৫৯১ পৃঃ) বলেছেন : মনঃসমীক্ষণের কোন যথার্থ ফল আছে কিনা এ-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুব কমই আছে। মনঃসমীক্ষণ দীর্ঘসূত্রায়িত চিকিৎসা পদ্ধতি, এক থেকে তিন বছর সাধারণতঃ লাগে সম্পূর্ণ চিকিৎসার জন্য। এটা একটা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময়। প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হয়। ফলে এত অর্থ খরচ করে এত

(That is why when sleep begins and embraces only the higher part of the hemispheres, the adjacent lower part bearing a direct relation to impressions prevails and is manifested in dreams.'—I. P. Pavlov : Selected Works.)

দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা খুবই কমলোকের পক্ষে সম্ভব। আধুনিক ব্যস্ত জগতে এ-চিকিৎসা পদ্ধতি তাই কল্পনাও করা যায় না। আবার কেউ কেউ অবাধ ভাবানুষঙ্গ এবং সংক্রমণের ভিত্তিতে চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে নারাজ। এ-ছাড়া বিশেষ কিছু প্রকার রোগের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র এ-পদ্ধতি প্রযোজ্য। একেবারে শিশুদেরও মনঃ-সমীক্ষণ সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের কন্যা এ্যানা ফ্রয়েড অবশ্য শিশুদের মনঃসমীক্ষণ সম্ভব একথা জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই এ-কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ৪৫ বছর বয়েসের ঊর্ধে রোগীদেরকেও মনঃসমীক্ষণ এর দ্বারা চিকিৎসা করা সাধারণতঃ সম্ভব নয়।

মনঃসমীক্ষণের একেবারে শেষের প্রক্রিয়া হ'ল রোগীকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম করা। অন্যান্য দশজন লোকের মত সেও যে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারবে এ-আত্মবিশ্বাস তার মধ্যে জন্মাতে হয়। কে জানে যে মনঃসমীক্ষণের এ-অংশই আসলে মনঃসমীক্ষণের দ্বারা চিকিৎসার মূলমন্ত্র নয়? যদি তাই হয় তা'হলে অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের পার্থক্য কোথায়? ফ্রয়েড বলেছেন, একমাত্র মনঃসমীক্ষণের দ্বারাই মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্ভব, অন্ততঃ বায়ুরোগের চিকিৎসা সম্ভব। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যেঅন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারাও (যেমন, কার্ল রোজারের 'রোগী কেন্দ্রিক অপরিচালিত চিকিৎসা' বা Client-centered Non-Directive Therapy, 'অস্তিত্ববাদী চিকিৎসা' বা Existential Therapy, ইত্যাদি) রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব। বরং সময় ও অর্থের দিক থেকে মনঃসমীক্ষণের চেয়ে এ-গুলো অধিক সুবিধাজনক।

৪

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আজকের পৃথিবীটা বোধহয় অহেতুকভাবে ভাববাদ ও বস্তুবাদ দর্শনে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। ভাববাদীরা সবকিছুতেই বস্তুর ঊর্ধ্বে কোনকিছু অবশ্য বর্তমান ভেবে তা' খুঁজতে থাকে। তেমনিভাবে বস্তুবাদীরা বস্তুর ঊর্ধ্বে কোনকিছু থাকতেই পারে না এটা দৃঢ়ভাবে ধরে নিয়ে বস্তুর ঊর্ধ্বে যদি কিছু থেকেও থাকে তা' যেন দেখেও দেখতে চায় না। ভাববাদী এবং বস্তুবাদী উভয়েই এদিক দিয়ে একদেশদর্শী। আর সবচেয়ে মজার কথা, শুধু দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ভাববাদী ও বস্তুবাদীদের মধ্যে বিরোধ নয়, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদিতেও ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের কাদা ছোড়াছুড়ি। ভাববাদীরা যেটা মেনে নেবেন, বস্তুবাদীরা ঠিক তার উল্টোটা খুঁজে বেড়াবেন। আবার বস্তুবাদীরা যে সত্য প্রকাশ করবেন, ভাববাদীরা সেটাকে ভাববাদের দিক থেকে ব্যাখ্যা করবেন।

মনোবিজ্ঞানেও ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের সাপে-নেউলে ভাব প্রকট। ১৮৯৩ সালে ফ্রয়েড সর্বপ্রথম মনঃসমীক্ষণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর কিছুকালের মধ্যেই রাশিয়াতে বেশ কয়েকটি মনঃসমীক্ষণ সংস্থা গড়ে উঠল। বলশেভিক বিপ্লবের কিছুকাল পরেও ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের প্রভাব রাশিয়াতে ছিল। তাঁর প্রায় সব রচনাই রাশিয়ার ভাষায় অনূদিত হ'ল। কিন্তু বলশেভিকদের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাশিয়াতে ফ্রয়েডের প্রভাব ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল এবং অচিরেই ফ্রয়েড একটি অপরিচিত নাম হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এখানে নিশ্চয় প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানীরা বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত মনঃসমীক্ষণের চর্চা করতেন তাঁরা বিপ্লবের পর রাতারাতিই কি ফ্রয়েডের মতবাদকে ভ্রান্ত ঠাওরালেন? অথবা রাজনীতির চাপে ভাববাদী মনঃসমীক্ষণ বস্তুবাদের দেশে অচল হয়ে গেল? অথবা তাঁদের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে পোর্টনভ্ ও ফেডোটভের মত তাঁরা বলছেন: ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বায়ুরোগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশের

পরিপন্থী ? মনঃসমীক্ষণে বায়ুরোগের চিকিৎসা সম্ভব, এ-কথা জোর করে যাঁরা স্বীকার করতে চান না, তাঁদের ছেড়ে দিলে বাকী সবাই মেনে নিয়েছেন। সুতরাং ফ্রয়েডের মতবাদে অন্ততঃ কিছু সত্য প্রকাশ পেয়েছে এ-কথা ঠিক। তবে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীদের ফ্রয়েডের রচনায় এত অনীহা কেন ?

অপরপক্ষে, প্যাভ্‌লভ এবং অন্যান্য বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকরা কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে মানসিকরোগের যে বস্তুকেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন তা প্রশংসনীয়। ভাববাদীদের মত কল্পনায় ভর করে জাগতিক ঘটনার জটিলতম ব্যাখ্যা না করে বস্তুবাদীরা সহজ সরল অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বস্তুবাদীদের সুরে সুর মিলিয়েই একদিন ফ্রয়েড বলেছিলেন : আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের মনোবিজ্ঞানের সম্ভাব্য সব ধারণাই একদিন শরীরতাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং সম্ভবতঃ বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদ্ধতি মানসিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। আসল কথা এই যে ফ্রয়েডকে ভাববাদী বলা ঠিক নয়। তিনি ভাববাদ বা বস্তুবাদ বুঝতেন না, সত্যকে তিনি যেমন দেখেছেন শুধু তেমন বলেছেন।

এ-সব কথা বলার কারণ এই যে কি বৈজ্ঞানিক, কি সাহিত্যিক, কি শিল্পী সবাইকে আজ আমরা হয় ভাববাদী না হয় বস্তুবাদীদের শ্রেণীতে ফেলে দিয়ে তবে তাঁকে বিচার করি, আর যাঁর বিচার হচ্ছে তাঁর গোত্রের সঙ্গে বিচারকের গোত্র না মিললেই প্রমাদ। ফ্রয়েডও কিছুটা এই অযাচিত গোত্রপ্রেমের শিকার। বিশেষ করে বিজ্ঞানের জগতে এটা খুবই দুঃখজনক। বিজ্ঞানী সত্যকে খুঁজবে, কি তাঁর গোত্র সেটা বড় কথা নয়।

ফ্রয়েডের রচনা যখন ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করল তখন প্রথম দিকে একে অশ্লীল রচনা বলে ঘৃণা করা হ'ত। সভ্যতার মুখোশ পড়া ভদ্র মানুষটি তার অতীতের পশুবৃত্তিগুলোকে ত্বকের নীচে ঢেকে রেখেছে মাত্র এই ছিল ফ্রয়েডের কথা। তাই সভ্য মানুষ ফ্রয়েডের রচনাকে তার অহংকারের জন্য সহজে গ্রহণ করতে পারে নাই। কিন্তু সত্যকে বেশী-দিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না, মানুষ অচিরেই ফ্রয়েডের মতবাদের গুরুত্ব বুঝতে পারল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে মানুষের চিন্তার জগতে ফ্রয়েডের রচনা চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অচেতন মন, যৌনতাবাদ,

স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অবাধভাবানুষাঙ্গিক চিকিৎসা পদ্ধতি—ফ্রয়েডের এ-সব আবিষ্কার মানুষকে অবাক করে দিল। সাহিত্যে, মনোবিজ্ঞানে, নৃতত্ত্বে, সমাজবিজ্ঞানে, চিকিৎসাশাস্ত্রে ফ্রয়েডের প্রভাব দাবানলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকা, ইংলন্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে মানুষ মানুষকে নতুনভাবে বুঝতে চেষ্টা করল। মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদের মধ্যে ফ্রয়েডের মতবাদ যুক্ত হ'ল। প্রত্যেকটি সমস্যার আলোচনাতে সবারই প্রশ্ন ঃ এ-বিষয়ে ফ্রয়েড কি বলেন ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন ফ্রয়েডকে চিঠি দিয়ে জানতে চাইলেন ঃ যুদ্ধ কেন হয় ?

যে কোন আবিষ্কারের জনকৌতুহলেরই বোধহয় তিনটি স্তর থাকে। প্রথমে, সে আবিষ্কার যদি মানুষের পুরান চিন্তাধারাকে সজোরে নাড়িয়ে দেয় তাহলে, মানুষ সে আবিষ্কারের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ; দ্বিতীয় স্তরে, মানুষ যখন সে আবিষ্কারে সন্দেহাতীত হয় তখন সে আবিষ্কার নিয়ে হৈ-চৈ শুরু করে, সে আবিষ্কারের অস্বাভাবিক গুরুত্বের ভবিষ্যৎ বাণী করে ; তেমনি আবার শেষের দিকে আবিষ্কারটি যখন অতি সাধারণ সত্যে পরিণত হয় তখন মানুষের কাছে সে-আবিষ্কারের কদর কমে আসে, মানুষ তখন সে-আবিষ্কারের অন্ধকার দিকটিকেই বড় করে দেখে অথবা নতুন আবিষ্কারের আশায় বসে থাকে। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের জনকৌতুহলেরও এমনি দশা হয়েছে — প্রথমে সন্দেহ, তারপর বাহবা, এবং সবশেষে প্রায়-বিস্মৃতি।

কিন্তু এ-কথা ঠিক, ফ্রয়েডের মূল কতকগুলো আবিষ্কার মানুষের চিন্তাধারা থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। নির্জ্ঞানমন, যৌনতা, অবাধ-ভাবানুষাঙ্গিক চিকিৎসাপদ্ধতি, ইত্যাদির নতুন নতুন ব্যাখ্যা এবং নব নব প্রয়োগ পদ্ধতির কথা মানুষ আজ বলতে পারে, কিন্তু এ-সব নব নব দিগন্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলে মানুষ চিরদিন ফ্রয়েডের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। ফ্রয়েডের কথাই শেষ কথা নয়, এর জন্য মানুষ তাঁকে মনে রাখবে না, নতুন পথের দিশারী হিসেবেই মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে। ফ্রয়েডের আবিষ্কারে যে কিছু সত্য আছে, এ-কথা আজ আর তর্কের বিষয় নয়। মানসিক রোগের চিকিৎসায় ফ্রয়েডের যে অভূতপূর্ব অবদান তার কথা ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম ম্যাক্‌ডউগাল স্পষ্ট

ভাষায় বলেছেন (Preface to An Outline of Abnormal Psychology—W. McDougall, F. R. S.)। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের অম্লান প্রভাবের কথা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ শুধু ফরাসী সাহিত্যের প্রতীকবাদে ফ্রয়েডের কি প্রভাব তা' লক্ষ্য করবার বিষয়। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের সত্য বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন কিভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। ১৯৩৬ সালের ২১শে এপ্রিল ফ্রয়েডের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি ফ্রয়েডের নিষ্পেষণ (repression) পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন। ইংরেজ কবি পোপ বলেছিলেন, মানুষের সবচেয়ে বড় জানার জিনিস হ'ল মানুষ নিজে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে ফ্রয়েডের মানুষকে জানার অক্লান্ত সাধনা। মানুষকে জানার যাঁর এত সাধনা, মানুষ তাঁকে ভুলবে কি ক'রে?

সম্মোহন

সম্মোহন সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। অনেকে সম্মোহনকে ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে করেন। তাঁরা ভাবেন যে সম্মোহন যাদু-মন্ত্রের ব্যাপার—এ-সব জিনিস বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হ'তে পারে না। আসলে কিন্তু তা'নয়, সম্মোহন একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যে কেউ সম্মোহনের সৃষ্টি করতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এর পরীক্ষানিরীক্ষা সম্ভব। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আজকাল মানসিক চিকিৎসালয়ে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার জন্যও অনেক সময় সম্মোহনের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে।

আমরা মোটামুটি জানি যে সম্মোহন একপ্রকার নিদ্রা। কিন্তু ঘুমের সঙ্গে সম্মোহনের যতটুকু সাদৃশ্য আছে তার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য আছে জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে। রাশিয়ার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শরীরতত্ত্ববিদ আইভান্ পেট্রোভিচ প্যাভ্লভ্ একথা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ঘুম এবং জাগ্রত অবস্থা আসলে আপেক্ষিক ব্যাপার। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখনও আমাদের মন (বা মস্তিষ্ক) পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ে না ; আবার জাগ্রত অবস্থায় যখন থাকি তখনও আমাদের মন পুরোপুরি জেগে থাকে না—মস্তিষ্কের কিছু অংশ তখনও ঘুমিয়ে থাকে। নিদ্রা, জাগ্রত অবস্থা এবং সম্মোহনের মধ্যে তুলনা করলে বেশ বোঝা যাবে যে সম্মোহন অনেকটা জাগ্রত অবস্থার মত।

	জাগ্রত অবস্থা	ঘুম	সম্মোহন
১)	উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হয়	প্রতিক্রিয়া হয় না	প্রতিক্রিয়া হয়
২)	নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক	নিশ্বাস-প্রশ্বাস কমে আসে	নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক
৩)	ই. ই. জি. স্বাভাবিক	কমে আসে	স্বাভাবিক
৪)	জি. এস. আর : ৫,০০০ ওম্ (Ohm)	৫০,০০০	৫,০০০

[ই. ই. জি (electroencephalogram) যন্ত্রের দ্বারা মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ তরঙ্গ পাঠানো যেতে পারে। মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে চলাকালে এই তরঙ্গ

কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থায় এই বাধার পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ই. ই. জি. যন্ত্রে এই বাধার পরিমাণ মাপা যায়। অনুরূপভাবে আমাদের ত্বকের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ পাঠালেও ত্বক তরঙ্গকে বাধা দেয়। আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় ত্বকের বাধা দেবার শক্তিও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এ-বাধাকে ওম(ohm)-এ প্রকাশ করা হয়। জি. এস. আর. (galvanic skin response) যন্ত্রের সাহায্যে এই বাধার পরিমাপ করা হয়।]

সম্মোহন এমন জিনিস যা' আমরা সচরাচর দেখি না। পুরোপুরি সম্মোহন প্রত্যক্ষ হয়তো আমরা সচরাচর করি না, কিন্তু একটু-আধটু সম্মোহনের প্রভাবে আমরা প্রায়ই পড়ে থাকি। পাশে কেউ হাই তুললে আমরা অজ্ঞাতেই হাই তুলে ফেলি। ভাল বক্তার বক্তৃতা শুনে আমরা অনেক সময় প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়ি, আশে পাশের ঘটনার কথা ভুলে যাই। বই পড়তে পড়তে কখনো এমন হয় যে ৪×৫ পৃষ্ঠা পড়ার পরও বুঝতে পারি না কি পড়লাম। চায়ের দোকানে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে অজ্ঞাতে কখন চা খেয়ে ফেলেছি বলতেও পারি না। ডঃ এফ. এল. মার্কিউস (F. L. Marcuse) তার "হিপনসিস" নামক বইয়ে বলেছেন যে মল্ল-যোদ্ধারা আঘাত ভুলে থাকে অনেকটা সম্মোহিত হয়ে। জমাটি নাটক বা চলচ্চিত্র দেখে অথবা গান বা বাজনা শুনে অভিভূত হয়ে পড়া ইত্যাদি সবই একটু আধটু সম্মোহনের ফল। সম্মোহন সম্পর্কে পরে আলোচনা করলে কেন এ-সব জিনিসে সম্মোহনের প্রভাব আছে তা' আমরা বুঝতে পারব।

হাটে বাজারে অনেক সময় দেখা যায় সম্মোহন-কার উজ্জ্বল পাথরের দিকে অথবা হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ কালী দিয়ে কালো করে তার দিকে কাউকে তাকিয়ে থাকতে বলে এবং পরে সেই পাথরে অথবা নখে সেই লোকটিকে তার ইচ্ছামত ঈপ্সিত বস্তু দেখাতে পারে। ইংরেজীতে এগুলোকে crystal gazing বা উজ্জ্বল পাথরে ঈপ্সিত বস্তু দর্শন বলে। এটা সম্মোহনের ফল। সার্কাস পার্টীতেও প্রায়ই সম্মোহন দেখানো হয়।

(২)

কবে থেকে সম্মোহনের শুরু তা' কোন দিনই আমরা জানতে পারব না। অতীত কালেও মানুষ ঝর্ণার পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে আত্ম-

সম্মোহিত হ'ত বলে অনেকে অনুমান করেন। গ্রীস দেশে নবম খৃষ্টাব্দে মাটি খুঁজে কিছু পাথর পাওয়া যায়। এই সব পাথরে অনেক অসুখের অনেক রকম বিধান লেখা আছে। এ-সব বিধানের মধ্যে সম্মোহনের মত কোন জিনিসের কথা উল্লেখ আছে বলে অনুমান করা হয়। এ-পাথরগুলো খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর। চীন ও আফ্রিকায় এবং অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাসেও সম্মোহনের প্রচলন দেখা যায়।

তবে সম্মোহনের জনক বলে আমরা ফ্রানজ্ এনটন মেজমারকেই (Franz Anton Mesmer) বুঝি। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে কনস্ট্যান্সলেকের একটি অঞ্চলে এক সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। কিছুদিন দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর তিনি ভিয়েনাতে গিয়ে প্রথমে আইন ও পরে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-শাস্ত্রে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত হ'ন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'De plantetarum influxu'। এই পুস্তকে তিনি মানুষের শরীরের ওপর গ্রহগুলোর প্রভাবের কথা বলেন। পরবর্ত্তী কালে এই পুস্তকের চিন্তাধারাই তিনি 'animal magnetism' বা 'জৈবিক চুম্বকত্ব' মতবাদ নামে প্রচার করেন। পৃথিবী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মোৎসার্ট ও হেডন তাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজেও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সম্মোহন সৃষ্টি করতে সঙ্গীতের সহায়তার কথা তিনি বলেছেন।

১৭৭৪ সালে ম্যাকসিমিলিয়ান হেল নামক এক ভদ্রলোক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক টুকরো চুম্বকের আশ্চর্য্যজনক শক্তির কথা বলেন। হেলের কাছে থেকেই মেজমার সর্ব্বপ্রথম সম্মোহনের দীক্ষা নেন। মেজমার বিশ্বাস করলেন যে চুম্বকের মাধ্যমে গ্রহগুলোর অদৃষ্ট শক্তি মানুষ, পশু, পাখী, এমনকি অচেতন জিনিসকেও প্রভাবিত করতে পারে। চুম্বকের সাহায্যে চিকিৎসার এই হ'ল মেজমারের ব্যাখ্যা। এ-কথা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিছুদিন পর তিনি বুঝতে পারলেন যে চুম্বক ছাড়াও যদি তিনি আঙুল দিয়ে রোগীকে স্পর্শ করেন তা'হলেও রোগী সুস্থ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জৈবিক চুম্বকত্ব—মতবাদকে অবিশ্বাস করতে পারেন নি। 'বাভারিয়ান এ্যাকেডেমী অফ সায়েন্সস' তাঁকে সদস্য করলেন। মেজমারের অনেক সহকর্মী চিকিৎসকেরা তার আবিষ্কারকে সমর্থন করলেন। কিন্তু তাঁর বহু সহকর্মী চিকিৎসক তাঁর ঘোর বিরোধিতা

করতে লাগলেন। তাঁকে হাতুড়ে ডাক্তার বলে অপবাদ দিতে লাগলেন। অনেক অত্যাচারিত হয়ে অবশেষে তিনি ভিয়েনা ছেড়ে প্যারিসে এসে হাজির হলেন।

প্যারিসে এসেই তিনি তাঁর জৈবিক চুম্বকত্বের দিকে ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সেস এবং ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অফ মেডিসিনের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। অবশেষে তিনি ফরাসী দেশের সাধারণ জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশ করেন। অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং এস্‌লনের (D' Eslon) সহায়তায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করেন। দলে দলে রোগী এসে এখান থেকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে যেতে লাগল। এত রোগী আসতে লাগল যে একক ভাবে তাদের চিকিৎসা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। অবশেষে তিনি চুম্বকটিকে একটি বুকেতে (bouquet) রেখে তার চার পাশে রোগীদেরকে বসিয়ে দিতেন। এই বুকেতে ঐ চুম্বকটি থাকতো আর তার দু'ধারে দু'সারি বোতল থাকত। চুম্বকটি ও বোতলগুলো একটি কাঠের আধারে বসানো থাকত। রোগীরা আঙ্গুল দিয়ে ঐ বুকেটিকে স্পর্শ করে বসে থাকত। আস্তে আস্তে সঙ্গীতের সুর বাজতে থাকত। কিছুক্ষণ পর রোগীদের "ভাব (se'ance) আসত—তারা খিঁচুনী অনুভব করত। কিছুক্ষণ পর তারা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে যেত এবং চেতনা ফিরে এলেই দেখত যে তাদের অসুখ সেরে গেছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দর সিল্কে তৈরী রাজকীয় পোশাকে মেজমার মৌনভাবে মৃদু পদক্ষেপে কক্ষে পায়চারি করতেন। কখনো কখনো হাতের দন্ড দিয়ে রোগীদেরকে স্পর্শ করতেন।

মেজমারের এই চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য এত বেশী লোক আসতে লাগল যে তাঁর কক্ষে জায়গা হ'ত না। শেষে তিনি বন্ডী নামক স্থানে একটি একটি ওকবৃক্ষকে 'চুম্বকত্ব' প্রদান করেন এবং বুকের (bouquet) মত এই বৃক্ষটিও চিকিৎসার কাজ চালাতে পারত। সমস্ত ফরাসী দেশে "জৈবিক চুম্বকত্ব" নিয়ে তখন তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। জনসাধারণ দাবী করল যে তাঁর চিকিৎসার এই গোপন রহস্যের কথা প্রকাশ করা হোক। ফরাসী সরকার তাঁকে ৪০,০০০ লিভার মুদ্রার বিনিময়ে তাঁর গোপন শক্তিটিকে সরকার কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তির ওপর আরোপ করতে অনুরোধ জানাল। তাঁর আবিষ্কারকে সরকারী স্বীকৃতি দেয়ার শর্তে

তিনি সরকারের অনুরোধ রাখতে রাজী হ'লেন। ষোড়শ লুই ১৭৮৪ সালে একটি কমিশন গঠন করেন। এ্যাকাডেমী অফ মেডিসিন ও এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্যরা এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। 'জৈবিক চুম্বকত্বের সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ভার পড়ল এই কমিশনের ওপর। গিলোটিন যন্ত্রের আবিষ্কারক ডঃ গিলোটিন, বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন, রসায়নবিদ লেভোসিয়ার, উদ্ভিদবিদ জুনিও প্রমুখ এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশনের সামনে মেজমার তাঁর চিকিৎসাপ্রণালীর যে ব্যাখ্যা দিলেন তা কারুরই বিজ্ঞান-সম্মত বলে মনে হল না। কমিশন বললেন যে "জৈবিক চুম্বকত্ব"র দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় করা গেলেও মেজমারের 'জৈবিক চুম্বকত্ব' সম্পর্কে ব্যাখ্যা থেকে এ-জিনিসটিকে বৈজ্ঞানিক বিষয় বলে গণ্য করা চলে না।

বিষাদগ্রস্ত হয়ে তিনি প্যারিস ছেড়ে যাবেন ঠিক করলেন। এ-খবর শুনে রাণী মর্মাহত হলেন। তিনি মেজমারকে প্যারিসে থাকতে অনুরোধ করলেন এবং তাঁকে অনেক টাকা দিলেন এবং সম্মান দেখালেন। মেজমারের সমর্থকেরা 'সোসাইটি হারমোনিক' নামে সোসাইটি গঠন করে চাঁদা তুলে প্রতিষ্ঠান তৈরী করার উদ্দেশ্যে বাজারে শেয়ার (১০০ লুই মূল্যের) ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শেয়ার নিঃশেষ হয়ে গেল। এই সময়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য কাউণ্ট পিউসেগুর (Count Maxime de Puyse'gur) নিদ্রিত অবস্থায়ও যে মানুষ চলাফেরা করতে পারে এ-জিনিসটি আবিষ্কার করলেন। বৈজ্ঞানিক জগতে এক আলোড়ন শুরু হ'ল। কিন্তু তবুও এ্যাকেডেমিগুলো তাঁর আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিল না। ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লব দেখা দিল। মেজমারের অনেক শুভানুধ্যায়ী গিলোটিনে আত্মাহুতি দিলেন। তাঁরও ভয় ছিল, কিন্তু রাজন্যবর্গের সঙ্গে পরিচিত থাকার দরুণ তিনি ফরাসী দেশ ত্যাগ করে ভিয়েনাতে চলে যেতে সক্ষম হলেন। ভিয়েনাতে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁকে জ্যাকবিন ভেবে এবং ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ভেবে গ্রেফতার করে। দু'মাস পর ছাড়া পেয়ে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন। এখানে সাধারণ চাষীদের মধ্যে তিনি অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন।

দিন যেতে লাগল। নেপোলিয়নের যুদ্ধ শুরু হ'ল, ইউরোপ কাঁপতে লাগল, মানুষ মেজমারকে ভুলে গেল। যা'হোক ১৮১২ সালে বার্লিন

এ্যাকেডেমি মেজমারের "জৈবিক চুম্বকত্ব" নিয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করল। জার্মাণীর রাজা বিশেষ দূত পাঠিয়ে মেজমারকে, তাঁর নিজ মুখ থেকে এ-সম্পর্কে সবকিছু জানার জন্য, ডেকে নিলেন। ফরাসী বিপ্লবে মেজমারের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফরাসী সরকার সমস্ত ক্ষতি-পূরণ দিল। সুতরাং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাঁর শেষ জীবন সুখেই কাটল। ১৮১৫ সালের ৫ই মার্চ ৮২ বছর বয়েসে কনস্ট্যানস্ হ্রদের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মেজমারের পর পাইসিগুর, ব্রেইড (Braid), ইলিয়টসন (Elliotson), শার্কো (Charcot), ফ্রয়েড (Freud), জেম্স এস্ডেইল প্রমুখ মনীষীরা সম্মোহন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। ব্রেইডই 'সর্বপ্রথম 'হিপনসিস' কথাটির প্রচলন করেন। ইলিয়টসন ছিলেন লন্ডনের 'রয়াল মেডিক্যাল এন্ড চিরুরজিক্যাল সোসাইটির' (Royal Medical and Chirurgical Society) সভাপতি। তিনিই বক্ষপরীক্ষার যন্ত্র স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন। সম্মোহনের সাহায্যে তিনিই প্রথম অস্ত্রোপচার করেন। জোইষ্ট (Zoist) নামক পত্রিকা তিনি স্থাপন করেন। এ-পত্রিকায় তিনি সম্মোহনের ওপর অনেক রচনা লেখেন। জেমস্ এস্ডেইল ভারতে সরকারী চাকুরী করতেন। ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত তিনি এই চাকুরীতে ছিলেন। থাকতেন গঙ্গার পার্শ্বে শ্রীরামপুরে। তিনি সম্মোহন নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। রাশিয়ায় বেক্টেরেভ (Bekhterev), টোকার্স্কি (Tokarsky), কোরসাকভ্ (Korsakov), সেসেনভ্ (Sechenov), প্যাভলভ্ (Pavlov), প্রমুখ মনীষীরা সম্মোহনের ওপর অনেক পরীক্ষা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্যাভলভের অবদান সবচেয়ে বেশী। বিলেত ও আমেরিকায় যাঁরা সম্মোহনকে নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম ম্যাকডউগল-ই (William Mc Dougall) সম্ভবতঃ অগ্রগণ্য। ওপরে যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁরা হয় চিকিৎসক অথবা শরীর-তত্ত্ববিদ।

প্রথমদিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সম্মোহনকে অস্ত্রোপচার ইত্যাদির জন্য রোগীকে অনুভূতিশূন্য (anesthetise) করার জন্য ব্যবহার করা হ'ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্লোরোফর্ম, নাইট্রাস্ অক্সাইড (১৮৪৪ খৃঃ), প্রভৃতি অনুভূতিশূন্য করার ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে

সম্মোহনের প্রয়োজন কমে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্মোহনকে চিকিৎসার একটি অভিনব পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হলে সম্মোহন তার হারানো গৌরব ফিরে পায়। বর্তমানে রাশিয়ায় ও আমেরিকাতে এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশে সম্মোহন নিয়ে বহু গবেষণা চলছে।

সম্মোহিত করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং এই দক্ষতা অলৌকিক বলে অনেকের ধারণা। আসলে কিন্তু তা'নয়। যে কেউই সম্মোহন করার পদ্ধতি জেনে কিছুদিন চেষ্টা করলেই কাউকে সম্মোহিত করতে পারে। তবে এ-কথা ঠিক যে সবাই সম্মোহিত করার কাজে সমান দক্ষ হ'তে পারে না। সম্মোহনকারীর ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর সম্মোহন করার ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে। সম্মোহন অলৌকিক ব্যাপার নয়। মা যখন শিশুকে ঘুম পাড়ান তখন এই সম্মোহন অনেকখানি কাজ করে থাকে। মায়ের অনেকটা একঘেয়ে গুঞ্জন অথবা সুর করে ছড়া আবৃত্তি এবং শিশুর দেহে সমান তালে মৃদু আঘাতের ফলে শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। এ-টা অনেকটা সম্মোহনের মত। আমরা প্রতিদিন যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখনও কিছুটা সম্মোহিত হয়ে পড়ি। ইংরেজীতে এই জিনিসটিকে অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ার অব্যবহিত পূর্ব্বের সম্মোহিত প্রায় অবস্থাকে হিপনাগগিক (hypnagogic stage) অবস্থা বলে। অনুরূপভাবে ঘুম থেকে যখন জেগে উঠি তখনও অনুরূপ সম্মোহনের মত অবস্থা হয়। এটাকে ইংরেজীতে বলে হিপনোপম্পিক অবস্থা (hypnopompic stage)। সম্মোহিত অবস্থার অনেকগুলো লক্ষণ এই দুই অবস্থাতে দেখা যায়।

যে ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে হবে তাকে বিশ্রামরত অবস্থায় থাকতে দিতে হবে। ঘরে অতি উজ্জ্বল আলো না থাকলে ভাল হয়। যে ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে হবে সে যে কোন অবস্থায় থাকতে পারে, অর্থাৎ শুয়ে অথবা বসে। তবে লক্ষ্য করতে হবে যে তার কোন মাংসপেশী যেন কোনরূপ চাপে না থাকে। কোনরূপ উচ্চশব্দ না থাকা বাঞ্ছনীয়। যে ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে হবে তার থেকে এক ফুট দূরে অথচ তার দৃষ্টির রেখার প্রায় আট ইঞ্চি ওপরে ছোট্ট উজ্জ্বল বস্তু ধরে তাকে সেই বস্তুটির প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে বলতে হবে। এমত অবস্থায় এরূপ অভিভাবন (suggestion) দিতে হবে ঃ

"আমি আপনাকে যা'বলছি ভাল করে শুনুন, আমি আপনাকে যা বলছি খুব ভাল করে শুনুন, আপনার চোখদুটো আস্তে আস্তে ভারী হয়ে আসছে, আমি যা' বলছি ভাল করে শুনুন, আপনার চোখদুটো ভারী হয়ে আসছে, (এতক্ষণে উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লোকটির চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসবে আর তা' না হলে বন্ধ করে দিতে হবে), আপনি আমার কথা ভিন্ন অন্য কিছু শুনছেন না, আপনার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, আপনি শুধু অন্ধকার দেখছেন, শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, আপনি আরামে ঘুমিয়ে পড়ছেন, আপনি আরামে ঘুমিয়ে পড়ছেন, আপনি শুধু আমার কথা শুনছেন, শুধু আমার কথা শুনছেন, আপনার ঘুম এসে গেছে, আপনার গভীর ঘুম এসে গেছে, আমি ১ থেকে ১০ অবধি গুনতে গুনতে আপনি একেবারে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়বেন, আমি ১ থেকে ১০ অবধি গুনতে গুনতে আপনি একেবারে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়বেন, একেবারে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়বেন ; এক, আপনি গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন, গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন ; দুই, আরও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন, আরও আরও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন ; তিন, আরও গভীর ভাবে, আরও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন, চার, আরও আরও আরও গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন। পাঁচ আ—র—ও আ—র—ও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন, আপনি শুধু আমার কথা শুনতে পারছেন, আরও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন—ঘুম—আরও ঘুম—আ-র-ও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন,...... ইত্যাদি (Hypnosis : Fact and Fiction—F. L. Marcuse)।"

এ-ভাবে ১০ অবধি গুনতে গুনতে ঐ-ব্যক্তি একেবারে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু এ-ঘুমকে সাধারণ ঘুম বলা যাবে না কারণ এই-প্রবন্ধের প্রথমে ঘুমের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় তার কোন বৈশিষ্ট্যই এখানে থাকবে না। এ-ভাবে সম্মোহিত করতে গেলে কত সময় লাগবে তা' বলা মুস্কিল, কারণ যে ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা হবে তার এবং যিনি সম্মোহন করবেন তাঁর বৈশিষ্ট্যের ওপর এটা নির্ভর করে। আবার প্রথম অধিবেশনেই যে সম্মোহন করা সম্ভব হবে এমন নয়, কারও কারও অনেকগুলো অধিবেশন লাগতে পারে। ওপরে যে-ভাবে সম্মোহনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হ'ল সবাই যে এ-ভাবেই সম্মোহন করেন তা' ঠিক নয়। একটু আধটু ভিন্ন প্রণালীতেও

সম্মোহন করা যেতে পারে। এ-রকম কয়েকটি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া গেল।

ক) খুব তাড়াতাড়ি সম্মোহন করতে গেলে শরীরতাত্ত্বিক পথ বেছে নিতে হয়। ক্যারোটিড্ আর্টারি বলে একটি শিরা দিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন হয়ে থাকে। হাত দিয়ে চাপ দিয়ে রক্ত চলাচল অতি অল্প সময়ের জন্য বন্ধ করে দিলে ব্যক্তি একটু মূর্ছা বোধ করবে। এই সময় অভিভাবন দিলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে এবং ব্যক্তিটি সম্মোহিত হয়ে পড়বে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে এ-টা খুবই বিপজ্জনক পদ্ধতি। সুদক্ষ সম্মোহনকারীরাই শুধু এটা করতে পারেন।

(খ) যে ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে হবে তার কোন একটি হাত বা পা বা শরীরের কোন অংশ একবার ভারী, একবার হাল্কা, একবার ঠাণ্ডা একবার গরম—এমন অভিভাবন দ্রুত দিতে থাকলে সে ব্যক্তি বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং এতে খুব দ্রুত সম্মোহন করা সম্ভব।

(গ) ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অর্ধজাগ্রত করে অভিভাবন দিলে খুব সহজে সম্মোহিত হয়ে পড়ে। এমনভাবে সম্মোহিত করে আবার তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখা যায়।

সম্মোহিত করতে কত সময় লাগে তা ঠিক বলা যায় না। এটা যে ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে হবে তার উপর এবং সম্মোহনকারীর ওপর নির্ভর করে। তবে বলা যেতে পারে সাধারণতঃ ৬ মিনিট থেকে ১০ মিনিট সময় লাগে সম্মোহন করতে। তবে এর চেয়ে কম সময়েও সম্মোহিত করা সম্ভব। আবার এর চেয়ে অনেক বেশী সময়ও লাগতে পারে। এফ, এল, মারকিউস বলেছেন ঃ কোন কোন মানসিক চিকিৎসালয়ে এমন রিপোর্টও পাওয়া গেছে যে রোগীকে সম্মোহিত করতে ৩০০ ঘণ্টা (একটানা নয়) লেগেছে। সবাই কিন্তু সম্মোহিত করতে নাও সক্ষম হতে পারে। উইলিয়াম জেমস্ (আমেরিকার সুবিখ্যাত দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী) তাঁর 'দি প্রিন্সিপলস্ অফ সাইকোলজি' বইতে লিখেছেন ঃ মিঃ গুরণীকে (যিনি সম্মোহন তত্ত্বে অনেক অবদান করেছেন) তাঁর পরীক্ষার জন্য অপরের দ্বারা সম্মোহিত ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হ'ত, কারণ তিনি নিজে সম্মোহিত করতে পারতেন না। আবার একথাও ঠিক যে বেশীর ভাগ লোকই সম্মোহিত করতে সক্ষম। ঐ একই বইতে জেমস লিখেছেন ঃ বার্ণহেম বলেছেন যে

কেউ যদি শতকরা ৮০ জনকে সম্মোহিত না করতে পারেন তা'হলে তিনি সম্মোহিত করতে শিখেছেন বলে বলা যায় না।

আজকাল ঔষধের সাহায্যেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে অথবা যে ব্যক্তি সহজে সম্মোহিত হয় না তাকে সম্মোহিত করা যায়। এমন কতকগুলো ঔষধ হল নাইট্রাস অক্সাইড (উইলিয়াম জেমস্ এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন), ক্লোরোফরম, ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা (হাসিস, মেরিজুয়ানা), প্যারালডিহাইড (৩০-১২০ মিনিম), ব্রোমেথল (শরীরের ওজনের প্রতি পাউণ্ডে ২-৩ মিনিম), মিথাইলসালফোনেল (৫-২০ মিনিম), বারবিটোন (৫-১০ গ্রেন), ফেনোবারবিটোন (১-২ গ্রেন), থিয়োপেনটোন (১ ৮ গ্রেন), ক্লোরালহাইড্রেট, বুটোবারবিটোন, সাইক্লোবারবিটোন, হেক্সোবারবিটোন ইত্যাদি। ঘুম পাড়ানি যন্ত্র (somniatron) দিয়েও সম্মোহনের সৃষ্টি করা যায়। তবে এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে এই সব ঔষধ এবং যন্ত্র দিয়ে ঘুম আনা যেতে পারে কিন্তু সে ঘুমকে সম্মোহন বলা যাবেনা। সেটা সাধারণ ঘুম হবে। আমরা যখন এসব জিনিস নিয়ে সম্মোহনের সৃষ্টি করি তখন এগুলো দিয়ে যে ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে হবে তাকে অধিকতর শান্ত, উত্তেজনাবিহীন এবং তন্দ্রালু করে ফেলি। এই তন্দ্রালু ভাব এলেই আমরা ঐ ব্যক্তিকে অভিভাবন দিতে থাকি এবং ফলে সত্যিকারের সম্মোহন এসে পড়ে। অপর পক্ষে যদি ঐ ঔষধের প্রভাব বেশী হয়ে যায় তা'হলে সাধারণ ঘুম এসে যাবে। মনে রাখতে হবে যে এ-সব ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা সম্মোহনের কাজটা সহজতর করতে পারি মাত্র, কিন্তু সম্মোহনের জন্য অভিভাবন চাই-ই, অভিভাবনের কাজ ঔষধে বা যন্ত্রে হবেনা।

সম্মোহিত করে কোন ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে কোন একটি বিশেষ সংকেত করার সঙ্গে সঙ্গে সে যে কোন সময় পুনরায় সম্মোহিত হবে, তা'হলে সেই সংকেত করার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ব্যক্তি সম্মোহিত হয়ে পড়ে। এটাকে সম্মোহনোত্তর অভিভাবন (post-hypnotic suggestion) বলা হয়। এভাবে সম্মোহনের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তিকে বলা হয় যে সে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় ফিরে যাবার পর কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার গায়ের জামাটি খুলে ফেলবে, তা'হলে সেই ব্যক্তি ঠিক ঠিক সেই কাজটি করবে। মজার কথা, লোকটিকে এমন ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কোন কারণ সে দেখাতে পারবে না অথবা অযথার্থ কারণ দেখাবে।

সম্মোহনের স্তর গুলো চার রকমের হতে পারে। প্রথম স্তরকে হিপ্নইডাল (hypnoidal) স্তর বলা হয়। এ-স্তরে অলসতা অনুভব হয় এবং শরীরের অঙ্গগুলো ভারী ভারী বোধ হয়। দ্বিতীয় স্তরে সম্পূর্ণ শিথিলতা আসে এবং চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। এ-স্তরকে লঘু-স্তর বলা হয়। এর পরের স্তরকে মধ্যম-স্তর বলি। এখানে সম্মোহিত ব্যক্তি সমস্ত আদেশ মেনে চলে। শরীরের কোন অংশে অনুভূতি নাই এমন অভিভাবন দিলে, ঠিক তাই হবে। কোন অঙ্গ একটি বিশেষভাবে রেখে দিলে সেটি সেইভাবে থাকবে (catalepsy)। যেমন সম্মোহিত ব্যক্তির একটি হাত ঊর্ধে তুলে রেখে দিলে সেটি সেইভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঊর্ধ্বে তোলা থাকবে। চতুর্থ স্তরে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মোহিত হয়ে পড়ে। এ-স্তরে ব্যক্তির চোখ খোলা থাকলেও সম্মোহনের হানি হবে না। অভিভাবন দিয়ে এখানে ব্যক্তিকে এত বেশী অনুভূতিশূন্য করা যায় যে তার হাতের একটি আঙ্গুল আগুনে পুড়িয়ে দিলেও সে ব্যক্তি টের পাবে না। সম্মোহনোত্তর অভিভাবন এই স্তরেই সম্ভব। এই স্তরকে সোমন্যামবুলিজম বা স্বপ্নচারী স্তর বলে।

কেউ সত্যি করে সম্মোহিত হয়েছে কিনা অথবা সম্মোহিত হয়েছে এমন ভান করছে তা পরীক্ষা করে দেখা যায়। পরীক্ষা করার কয়েকটি মাত্র উপায় বলা হ'ল ঃ

(ক) এ প্রবন্ধের প্রথমদিকে বর্ণিত নিদ্রা, জাগ্রত অবস্থা এবং সম্মোহনের মধ্যে তফাৎ কতটুকু তা বলা হয়েছে। সম্মোহনের ঐ-সব বৈশিষ্ট্য থাকলেই বুঝতে হবে যে সম্মোহন মেকি হয়নি।

(খ) অভিভাবন দ্বারা অনুভূতিশূন্য করে শরীরের কোন অংশে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও যদি অনুভূতি না হয় তা'হলে বুঝতে হবে যে সত্যিকারের সম্মোহন হয়েছে।

(গ) অভিভাবন দিয়ে সম্মোহনের মধ্যে বমনোদ্রেক করা যায়, শরীরে ফোস্কা সৃষ্টি করা যায়, রক্ত-চাপ বৃদ্ধি করা যায়; সুতরাং এগুলো যদি সত্যিই লক্ষ্য করা যায় তা'হলেও বুঝতে হবে যে সম্মোহন মেকি নয়।

সম্মোহিত করে ব্যক্তির মধ্যে আমরা অনেকগুলো অদ্ভুত জিনিস সৃষ্টি করতে পারি। এমন কয়েকটি জিনিসের কথা বলা হ'ল ঃ

(ক) সম্মোহনের দ্বারা মাংসপেশীকে অতীব শক্তিশালী করা যায়। "ব্রিটিশ সোসাইটি অফ মেডিক্যাল হিপনোটিষ্টস"-এর প্রেসিডেন্ট ডঃ এস.

জে. ভ্যান পেল্ট বলেছেনঃ মাংসপেশীর সংকোচনে এমনকি হাড় পর্যন্ত ভেঙ্গে যেতে পারে এবং চোয়ালের মাংসপেশী ৬০০ পাউণ্ডেরও বেশী চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ অবস্থায় মন মাংসপেশীর ওপর 'বাধ' সৃষ্টি করে; তাই মাংসপেশী তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারে না। সম্মোহনের দ্বারা এই 'বাধ' (inhibition) সরিয়ে নিলে তাই মাংসপেশী এমন অতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

(খ) সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব রকম চেষ্টা করে অর্থাৎ তার সমস্ত আদেশ ঠিক ঠিক মেনে চলে। সম্মোহনের এই বৈশিষ্ট্যটির জন্য অনেকে সম্মোহনকে ভান (faking out) বলে থাকেন। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের একটি পরীক্ষা থেকে এ জিনিসটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্মোহিত ব্যক্তিকে হাতে পিসবোর্ডের তৈরী একটি ছুরি দিয়ে তিনি অপর এক ব্যক্তিকে আঘাত করতে আদেশ দেন। সম্মোহিত ব্যক্তি ঠিক তাই করে। কিন্তু তিনি যখন সত্যিকারের একটি ছুরি দিয়ে অনুরূপ আদেশ দেন তখন কিন্তু সম্মোহিত ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। তাই ম্যাকডুগাল বলেছেন যে সম্মোহনকারীর কোন আদেশ নৈতিকতার বিরোধী হলে সম্মোহিত ব্যক্তি সে আদেশ পালন করে না।

(গ) সম্মোহিত ব্যক্তির অনেক সময় সময় সম্বন্ধে আশ্চর্যজনক উপলব্ধি লক্ষ্য করা যায়। সম্মোহনোত্তর অভিভাবন দ্বারা ব্যক্তিকে সম্মোহনের কোন একটি নির্দিষ্ট সময় পরে কোন কাজ করতে বললে সে ব্যক্তি ঠিক ততটা সময় পরে সেই কাজটা করবে। সময় সম্বন্ধে এমন তীক্ষ্ণ উপলব্ধি সম্মোহনে লক্ষ্য করা যায়। এ-ভাবে এক ব্যক্তিকে সম্মোহনোত্তর অভিভাবন দ্বারা ৩,২৪০ মিনিট পর একটি কাজ করতে বলা হয়েছিল এবং সেই ব্যক্তি ঠিক সেই সময় পর উক্ত কাজটি করেছিল (British Journal of Medical Hypnotism Vol 1, No. 2, Dec. 1949)।

এখন প্রশ্ন হতে পারে সম্মোহিত ব্যক্তিকে কিভাবে সম্মোহন থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়। এ-কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ। শুধুমাত্র অভিভাবন দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়। সম্মোহিত ব্যক্তিকে এই অভিভাবন দিতে হবে যে সে জেগে উঠবে ২ মিনিটের মধ্যে অথবা বিশেষ সংকেত করার সঙ্গে সঙ্গে। কোন অতি তীব্র উদ্দীপনা প্রয়োগ করলেও স্বভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। আবার সম্মোহিত ব্যক্তিকে সম্মোহনের

মধ্যে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর তার সম্মোহনজনিত 'ঘুম' স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিণত হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ স্বাভাবিক নিদ্রার পর যখন সে জেগে উঠবে তখন তার অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে।

আগেই জেনেছি সবাইকে সম্মোহন করা যায় না। আবার যাদেরকে সম্মোহিত করা যায় তাদের সবাইকে সমান ভাবে সম্মোহিত করা যায় না। মোটামুটিভাবে শতকরা ৫ জনকে সম্মোহিত করা যায় না। শতকরা ১০ জনকে হিপনইডাল স্তরে, ২৫ জনকে লঘু স্তরে, ৩৫ জনকে মধ্যমস্তরে এবং ২৫ জনকে সোমন্যামবুলিজম স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। সম্মোহন, কল্পনার ওপর নির্ভর করে। অভিভাবনকে কল্পনায় ব্যক্তি গ্রহণ করে বলেই সম্মোহন সম্ভব। সেই জন্য বোকা ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা যায় না। কোন ব্যক্তি যদি সম্মোহিত হতে না চায় তাকে সম্মোহিত করা সম্ভব কি? উত্তরে আমরা বলব যে সম্মোহিত হতে না চাইলেও কোন ব্যক্তিকে সম্মোহন করা সম্ভব কারণ মনস্তত্ত্বের মতে ইচ্ছার চেয়ে কল্পনার শক্তি বেশী। ত্রিতল বিশিষ্ট কোন প্রাসাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে যদি ভাবি যে কিছুতেই নীচে পড়ে যাব না অথচ তখন যদি মনে নীচে পড়ে যাওয়ার ছবি ভাসতে থাকে তা'হলে আমরা অবশ্য নীচে পড়ে যেতে পারি। এখানে কল্পনা ইচ্ছার চেয়ে বেশী শক্তি-শালী হবে।

সম্মোহনকারীর কি কি গুণ থাকবে তা' সঠিক বলা যায় না। যে ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে হবে তার ওপর নির্ভর করবে কোন রকম সম্মোহনকারী কার্য্যকরী হবে। কোন কোন ব্যক্তি সম্মোহিত হতে সম্মোহনকারীর কাছে থেকে মাতৃসুলভ আচরণ পেতে চায় আবার কেউ কেউ পিতৃসুলভ আচরণ প্রত্যাশা করে। সম্মোহন করার আগে এটা ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। এতে সম্মোহনের সুবিধা হয়। আবার কোন্ ব্যক্তিকে সহজে সম্মোহিত করা যেতে পারে সেটাও আমাদের জানবার বিষয়। শিশুরা খুব কল্পনাপ্রবণ সুতরাং তাদেরকে সহজে সম্মোহিত করা যেতে পারে। ১৪ থেকে ২৬ বছরের ব্যক্তিদেরকে সম্মোহিত করা সহজ বলে দেখা গেছে। মেয়েদেরকে সহজে সম্মোহিত করা যায় বলে অনেকের ভুল ধারণা আছে। আসলে এ-ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নাই। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সম্মোহন প্রদর্শনের জন্য জনতার মধ্য থেকে কাউকে বেছে নেওয়ার জন্য সম্মোহনকারী অনেক সময় কতকগুলি কৌশলপ্রয়োগ করে

থাকেন। জনতাকে হয়তো সম্মোহনকারী বল্লেন যে তারা দু'হাত বন্ধ করে রাখলে আর খুলতে পারবে না : এমনকি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। এমতাবস্থায় এমন অভিভাবন কারও পক্ষে কার্যকরী হলে সম্মোহনকারী তাকে সম্মোহন করতে পারেন। সবশেষে মনে রাখতে হবে যে সম্মোহনের সমস্ত বিষয় এবং কলাকৌশল জানা থাকলেই কাউকে সম্মোহিত করা না যেতেও পারে। সম্মোহিত করা শিখতে হলে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সঙ্গে এর কলাকৌশল প্রয়োগের পদ্ধতিগুলো আয়ত্ব করা প্রয়োজন। শল্যচিকিৎসার সমস্ত অস্ত্র আয়ত্ব করলেই যেমন ভাল শল্যচিকিৎসক হওয়া যায় না তেমনি সম্মোহনের সমস্ত কলাকৌশল জানা থাকলেই কেউ সম্মোহনকারী হতে পারে না।

(৪)

সম্মোহনের দ্বারা রোগ নিরাময় করার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। সম্মোহন অথবা সম্মোহনের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন পদ্ধতি পুরাকালে চিকিৎসকেরা ব্যবহার করতেন। এ-ছাড়া ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করার সঙ্গে সঙ্গে সম্মোহনও ব্যবহার করতেন অতীতকালের চিকিৎসকেরা। শুধুমাত্র অতীতকালে নয়, একালেও সম্মোহন এককভাবে অথবা ঔষধের সঙ্গে রোগ-নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার শুধু মানসিক রোগেই সম্মোহনের ব্যবহার হয়ে থাকে না (অনেকের এমন ধারণা আছে), পুরোপুরি শারীরিক রোগেও সম্মোহন বিভিন্নভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ক্যান্সার রোগে সম্মোহন নিরাময় কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না বটে কিন্তু ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রনার উপশম করতে সম্মোহন কাজে লাগানো যেতে পারে (British Journal of Medical Hypnotism. December, 1949 Issue)। অভিভাবনের দ্বারা রোগীকে রোগযন্ত্রনা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি দেয়া যেতে পারে। এভাবে সম্মোহন চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে। সম্মোহন সম্পর্কে গবেষণা আজও চলছে, আজও আমরা সম্মোহন মানুষের কতটুকু উপকারে আসতে পারে তা ভালভাবে জানি না অথবা

পুরোপুরি জানি না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজও এ নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। সম্ভবতঃ এ-ব্যাপারে রাশিয়ার শরীরতত্ত্ববিদ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্যাভলভের অবদান সবচেয়ে বেশী। কিছুদিন পূর্বে এক আন্তর্জাতিক চিকিৎসক সম্মেলনে সভাপতি কার্ল মেনিনজার (Carl Meninger) বলেছিলেন যে এমন একদিন ছিল যখন চিকিৎসার জন্য রোগীর জিহ্বা, চোখ, ইত্যাদি পরীক্ষা করলে লোকে হাসত, তারপর মানুষ এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারল ; এরপর রোগীর বুকে ষ্টেথোস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করলে লোকে ভাবতো ভেতরের অসুখ বাইরের যন্ত্রে কি-ভাবে ধরা পড়বে ? এবং তাই তারা হাসত। কিছুদিন পর তারা তাদের অজ্ঞতা বুঝতে পারল ; আরও কিছুদিন পর রোগীর মলমূত্র পরীক্ষা করলে লোকে হতবাক হয়ে থাকত, কিন্তু তাদের সে ভুলও ভেঙ্গে গেল ; আজ মানুষ ভাবছেন যে চিকিৎসার ব্যাপারে স্বপ্ন বিশ্লেষণের আবার কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? চিকিৎসার জন্য স্বপ্ন বিশ্লেষণের ধারণা বাতুলতা-প্রসূত ; কিন্তু সে-দিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন মানুষের পূর্বের অজ্ঞতাগুলোর মত এ-অজ্ঞতাও দূর হয়ে যাবে। মেনিনজার স্বপ্ন বিশ্লেষণ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, সে-কথা সম্মোহনের বেলাও প্রযোজ্য। স্বপ্ন বিশ্লেষণ, সম্মোহন এ-সব মানসিক জিনিসগুলোকে মানুষ ভৌতিক বলে মনে করে। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে বিজ্ঞান আজ ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক বলে এ-গুলোকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। একথা ঠিক যে আজও মানুষ এ-সব জিনিসকে সন্দেহের চোখে দেখে। এর কারণ এই যে সত্যি হলেও, বিজ্ঞানাভিত্তিক হলেও, যে জিনিসে তা'রা অভ্যস্ত নয় সেগুলোকে সহজে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে চায় না। তবে আমরা নিশ্চিত যে সাধারণ মানুষের এই জড়তা অচিরেই ঘুচে যাবে এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণ, সম্মোহন . এ-সব জিনিষ বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপযুক্ত মর্যাদা বিজ্ঞানের রাজত্বে পাবে ।

আশ্চর্যের কথা, শুধু অশিক্ষিত সমাজে নয় শিক্ষিত সমাজেও সম্মোহনের উপযুক্ত মর্যাদা করে নিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে কথাটি কত সত্য। লণ্ডনের রয়্যাল মেডিক্যাল এণ্ড চিরুরজিক্যাল সোসাইটির ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট এলিয়টসন (Elliotson) চিকিৎসাবিজ্ঞানে সম্মোহনের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর

দিয়ে বলায় এবং সম্মোহন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করায় এবং অধিকন্তু সম্মোহনের সাহায্যে রোগীকে অনুভূতিশূন্য (anesthitised) করে অস্ত্রোপচার করায় তাঁকে উক্তপদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগল (William Mc Dougall.) তাঁর An Outline of Abnormal Psychology-তে সম্মোহনকে যথার্থভাবে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবজ্ঞাকৃত বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। তবে আনন্দের কথা এই যে ক্রমেই সম্মোহন সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দূরীভূত হচ্ছে। শুধুমাত্র ভাববাদী দেশগুলোতে নয় বস্তুবাদী দেশগুলোতেও সম্মোহন তার উপযুক্ত স্থান করে নিচ্ছে। প্যাভ্‌লভ্‌ সম্মোহনকে চিকিৎসার একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কে. প্ল্যাটোনভ এর (K. Platonov) "The Word as a Physiological and Therapeutic Factor"-এ ৪৫০ পৃষ্ঠাভরে প্যাভলভ কিভাবে সম্মোহনকে বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থান দিয়েছেন তাই-ই দেখিয়েছেন। শুধুমাত্র কথাতেই (যদি অভিভাবনের মত কথাগুলো হয়) যে শারীরিক রোগ বৃদ্ধি অথবা উৎপন্ন হতে পারে তা' আমরা আজ ভাল ভাবে জানি। উদাহরণ স্বরূপ, পোর্টনভ্‌ ও ফেডোটভ্‌ তাঁদের Psychiatry বই এ বলেছেন: মুখ্য চিকিৎসক হয়তো রোগীর সামনেই নিম্নপদস্থ চিকিৎসককে বল্লেন যে রোগীর হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ফলে, যে রোগী তার রোগকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল তার হঠাৎ উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল এবং তার হৃদযন্ত্রের উদ্‌বেগ আরো বেড়ে গেল। চিকিৎসকের কথা থেকে এ-ধরণের রোগবৃদ্ধিকে আয়াট্রোজেনি (iatrogeny) বলে। চিকিৎসকের উক্তি থেকে শুধুমাত্র রোগবৃদ্ধি নয়, নতুন রোগ উৎপন্নও হতে পারে।

যা' হোক বিট্রিশ সোসাইটি অফ মেডিক্যাল হিপনোটিস্টস' এর (British Society of Medical Hypnotists) ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ভ্যান্‌পেল্ট (Van Pelt)-এর মতে অধিকাংশ বায়ুরোগই আত্মসম্মোহনের ফলে হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ আহত হয়ে সৈন্য হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে গেল। হয়তো তার চোখের ওপরে একটু কেটে যাবার ফলে রক্ত ঝরে পড়ার জন্য সে দেখল যে সে দেখতে পারছে না। এই বিভ্রান্ত অবস্থায় হয়তো তার এই ধারণা হল যে তার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। যদি এমন হয় তা'হলে সে সত্যিকারে আর চোখে

দেখতে পারবে না। শরীরতত্ত্বের দিক থেকে তার চোখ ভাল থাকলেও সে আর চোখে দেখতে পারবে না। এ-ধরনের অসুখকে কার্মিক(functional) অসুখ বলা হয়। এখানে এই অন্ধত্বের কারণ আত্ম-সম্মোহন সে তার বিভ্রান্তির মধ্যে (সম্মোহনের উপযুক্ত পরিবেশ) নিজেকেই নিজে এই অভিভাবন দিয়েছে যে সে অন্ধ হয়ে গেছে। এ-সব ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায় হ'ল পুনরায় ঐ রোগীকে সম্মোহিত করে এই অভিভাবন দেওয়া যে তার চোখ ঠিকই আছে এবং সম্মোহন থেকে উঠলেই সে পূর্বের মত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। ভ্যানপেল্টের মতে যে সব রোগে সম্মোহন ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলো হল ঃ

(ক) বায়ুরোগ—মানসিক কারণজনিত অনুভূতিশূন্যতা, উৎকণ্ঠা, মৃগীরোগ, নিরানন্দময়তা (depression), ইত্যাদি।

(খ) শারীরিক অসুখের সঙ্গে যদি কোন মানসিক ব্যাপার জড়িত থাকে এবং শারীরিক রোগকে দুরূহতর করে তা'হলে সেসব মানসিক জিনিসগুলোও সম্মোহনের দ্বারা দূরীভূত করা যেতে পারে।

(গ) শারীরিক রোগের অসহ্য যন্ত্রণা দূর করে সম্মোহন মানসিক প্রশান্তি আনতে পারে।

(ঘ) কু-অভ্যাস, মাদকতা, যৌনবিকৃতি, প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সম্মোহন ভাল কাজ করে।

(ঙ) আধমাথা ধরা প্রভৃতি যেসব অসুখের কারণ আজও আমরা সঠিক জানিনা সে সব রোগের কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মোহনের দ্বারা নিরাময় সম্ভব।

(চ) অনেক প্রকার চর্মরোগ, বিশেষকরে যেসব চর্মরোগ মানসিক রোগের ফল সে সব সম্মোহনের সাহায্যে দূর করা যায়। নিউরোডার-মাটাইটিস, (neurodarmatitis) একজিমা, (eczema) ইউট্রিকারিয়া, (utricaria) সোরিয়াসিস (soriasis), ইত্যাদি সম্মোহনের দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব।

(ছ) অনুভূতিশূন্য শল্যচিকিৎসা, প্রসব করান, দাঁত ওঠান, ইত্যাদি আজ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ-ছাড়া মনঃসমীক্ষণের দীর্ঘসূত্রতাকে হ্রাস করার জন্যও অনেকে সম্মোহনের ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্য ফ্রয়েড এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। সম্মোহনের দ্বারা অপরাধীও খুঁজে বের করা সম্ভব। স্বাভাবিক

অবস্থায় অপরাধী তার সচেতনতার জন্য অপরাধ স্বীকার করে না। কিন্তু সম্মোহিত হলে অপরাধী অনেক সময় দোষ স্বীকার করে থাকে।

সম্মোহনের দ্বারা কোন্ চিকিৎসা করা সম্ভব একথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকেন। মানুষের মন এবং দেহকে আলাদা করে ভাবা ঠিক নয় অন্ততঃ এদের মধ্যে যে যোগাযোগ আছে সে দিক থেকে। ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্তের মতে মন যেমন দেহের কথা শোনে তেমনি দেহও মনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কার্মিক (functional) রোগ সম্পর্কে আজ আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এ-সব রোগ মানসিক কারণে হয়ে থাকে। আত্ম-সম্মোহনই এর কারণ। সুতরাং এর চিকিসাও সম্মোহনের দ্বারাই সম্ভব। সম্মোহনের দ্বারা রোগীর আত্ম-সম্মোহনজনিত অস্বাস্থ্যকর দৃঢ়বদ্ধ চিন্তাকে দূর করে স্বাস্থ্যকর ভাবনা মনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। সম্মোহন দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতির এই হ'ল মৌল ধারণা।

৫

কেন কাউকে সম্মোহিত করা সম্ভব এ-নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে, আজও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও বোধকরি হবে। এ-নিয়ে অনেক মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ-সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে। আমরা সমস্ত মতবাদ আলোচনা না করে শুধুমাত্র মুখ্য মতবাদ গুলোর উল্লেখ করব।

(ক) শারীরি- চুম্বক মতবাদ (Animal magnetism): এটাই ছিল মেজমারের মত। সম্মোহনকারীর শরীর থেকে একপ্রকার শক্তি সম্মোহিত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে বলেই সম্মোহনকারী সম্মোহিত ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এ-মতবাদে এখন খুবই কম লোকে বিশ্বাস করেন।

(খ) বায়ুরোগ মতবাদ (Neurosis theory): ফ্রান্সের সলপেট্রিয়ার (Salpe'trie're) হাসপাতালের বিখ্যাত শার্কো এবং তাঁর সহকর্মীদের মতে সম্মোহন একপ্রকার বায়ুরোগ। অনেকটা হিস্টিরিয়ার (hysteria) মত। তাঁদের ধারণা ছিল যে বিশেষ এক ধরনের ব্যক্তিদেরকেই শুধুমাত্র সম্মোহিত করা সম্ভব। কিন্তু তাঁদের মতবাদ টিকল

না, যখন দেখা গেল যে শতকরা ৯০ ভাগ ব্যক্তিকেই সম্মোহিত করা সম্ভব। শার্কোর ধারণা ছিল যে হিস্টিরিয়াতে রোগী যেমন বিশেষ কোন মুহূর্তে বা বিশেষ কোন জিনিসের সংস্পর্শে এলেই মূর্ছা যায়, ঠিক তেমনি কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে বিশেষ কোন চিহ্ন বা নির্দেশ দিলেই মৃগীরোগীর মত অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সম্মোহনের 'পাস' (Pass) এমন একটি বিশেষ চিহ্ন। 'পাস' একটি অতি সাধারণ জিনিস। যাকে সম্মোহিত করতে হবে তার শরীরের ঠিক ওপর দিয়ে (অথচ স্পর্শ না করে) হাত বুলানো, ব্যক্তিকে মৃদু আঘাত করা, ইত্যাদিকে 'পাস' বলে। যা' হোক শার্কোর মতবাদ এখন অচল।

(গ) অভিভাবনবাদ (Theory of suggestion): মেয়ার (F. W. H. *Myer*), জেনে (Janet), ফ্রয়েড, প্রমুখ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মেয়ারের মতে: অভিভাবন হ'ল আমাদের অর্ধচেতন আত্মার প্রতি সফল আদেশ। এই আদেশের ফলেই ব্যক্তি সম্মোহিত হয়। জেনের মতে: ব্যক্তি তার ইচ্ছার দ্বারা যে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতে পারে না সেই প্রবৃত্তি ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করাই অভিভাবন। এই অভিভাবন দিলেই ব্যক্তি সম্মোহিত হয়ে পড়বে। কিন্তু কি ভাবে এই প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয় তা' তিনি বলতে পারেন নি। সম্মোহনের কারণ সম্বন্ধে সিগমুন্ড ফ্রয়েডও স্পষ্ট ছিলেন না। তার মনঃসমীক্ষণসম্মত যুক্তি দিয়ে সম্মোহনের কারণ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ইডিপাস্ এষনাই সম্মোহনের কারণ। আমরা জানি যে অতি শৈশবেই আমাদের কাম মা অথবা বাবার প্রতি সংবন্ধ হয়ে পড়ে। এই সংবন্ধতা কোনদিনই একেবারে দূর হয় না। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা বিকল্প ভাবে এই মা বাবার প্রতি সংবন্ধ কাম প্রকাশ করতে পারি তা'হলে আমরা সুস্থ মানসিকতার অধিকারী হই, আর তা' না হলে বায়ুরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সম্মোহনকারী কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে পারে এইজন্য যে সেই ব্যক্তি সম্মোহনকারীর মধ্যে তার মা-বাবার বিকল্প খুঁজে পায়। সেখানে ওই ব্যক্তির ইচ্ছা না থাকলে তাকে সম্মোহিত করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বাবা-মায়ের বিকল্প সম্মোহনকারীর মধ্যে খুজে পেলেই হবে না। বাবা-মা যেমন ব্যবহার করতেন সম্মোহনকারীর কাছে থেকে অনুরূপ আচরণও এ ব্যক্তি আশা করবে—যেমন মেয়েরা সম্মোহনকারীর কাছে থেকে কঠোর ব্যবহার (sadistic) আশা করে

এবং পুরুষেরা আশা করে নরম মাতৃসুলভ আচরণ (mesochistic)। সম্মোহনকারীর মধ্যে মা-বাবার বিকল্প খুঁজে পায় বলে এবং সম্মোহিত হবে বলে ইচ্ছা করে বলেই শুধুমাত্র কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা সম্ভব কারণ সম্মোহনে ব্যক্তি সম্মোহনকারীর কথাগুলো যথাযথভাবে মেনে চলে মাত্র। ফ্রয়েডের মতবাদে সম্মোহিত ব্যক্তিকে সম্মোহনকারীর প্রতি "প্রেমাসক্ত" ভাবতে হবে এবং অভিভাবনকে মনে করতে হবে "ভালবাসার" ফল।

ফ্রয়েডের মতবাদের ত্রুটি স্পষ্ট। ফ্রয়েডের মতবাদ যদি ঠিক হত তা'হলে আমরা বলতে পারতাম যে স্বাভাবিক পুরুষেরা সম্মোহনকারীর কাছে থেকে বাবার মত ব্যবহার (sadistic) এবং স্বভাবিক মেয়েরা মায়ের মত (mesochistic) ব্যবহার প্রত্যাশা করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ-টা মোটেও ঠিক নয়। সুতরাং ফ্রয়েডের মতবাদকে আমরা যুক্তিযুক্ত বলে মানতে পারি না।

(ঘ) বিচ্ছিন্নতাবাদ (Theory of dissociation) : এ-মতবাদটি উইলিয়াম ম্যাকডুগ্যালের (William Mc Dougall)। ম্যাকডুগ্যাল বলেন যে আমাদের স্নায়ুতন্তুতে এক প্রকার শক্তি নিহিত থাকে। ভগ্‌ট (Vogt)-কে অনুসরণ করে তিনি এই শক্তিকে নিউরোকাইম (neuro-kyme) বলেছেন। বাইরে থেকে অথবা ভিতর থেকে উত্তেজনা এলে এই সঞ্চিত শক্তি মুক্ত হয় এবং স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত থাকে। আবার যদি সমস্ত রকম উত্তেজনা দূরীভূত করা হয় তা'হলে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র শান্ত হয়ে আসবে এবং আমরা ঘুমিয়ে পড়ব। উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্র থেকে নিউরোকাইম গিয়ে মস্তিষ্ককে উত্তেজিত রাখে। মস্তিষ্কের এক জায়গা উত্তেজিত হ'লে সে-উত্তেজনা নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নিকটবর্তী স্থানের উত্তেজনা কেন্দ্রীয় উত্তেজিত স্থান থেকে কম হয়। সুতরাং একই জায়গা বার বার উত্তেজিত করলে মস্তিষ্কের উত্তেজিত কেন্দ্রটি নিকটবর্তী অপেক্ষাকৃত কম উত্তেজিত অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা আছে। তাই হঠাৎ কারো ওপরে ভীষণ রেগে গেলে হাতে মারাত্মক অস্ত্র থাকলেও তাকে মারতে চেষ্টা করি না। কারণ মস্তিষ্কের একাংশ এ-কাজে সায় দিলেও অন্যান্য অংশ বাধা দেয়। কিন্তু মস্তিষ্কের এক অংশ অন্যান্য অংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ঐ উত্তেজিত একাংশের ইচ্ছাকে অন্যান্য অংশ বাধা দেয় না। এবং ফলে

মস্তিষ্কের ঐ একাংশের ঈপ্সিত কাজটুকু শুধু ব্যক্তিটি করে থাকে। সম্মোহনে এই ঘটনাটিই ঘটে থাকে। বার বার একই অভিভাবন অথবা 'পাস্' দেবার ফলে মস্তিষ্কের একটি মাত্র অংশ অতি উত্তেজিত হয় এবং অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এই একাংশে প্রেরিত সম্মোহনকারীর সমস্ত অভিভাবনই তখন সম্মোহিত ব্যক্তি মেনে নেয় এবং তদনুরূপ কাজ করে থাকে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ অনেকটা যুক্তিযুক্ত মনে হলেও শরীরতত্ত্বের দিক থেকে পরিপূর্ণ নয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে এই বিচ্ছিন্নতা কেন হয় তা ম্যাকডুগাল ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। শুধু উত্তেজনার পরিমাণের তারতম্যের জন্যই এই বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে না। বিচ্ছিন্নতাবাদকে ম্যাকডুগাল পরিবর্দ্ধিত করেছেন মাত্র। তারই মতে এ-মতবাদের আবিষ্কর্তা হলেন হুগস্ বেনে (Hughes Bennett)। যা'হোক, আমরা আগেই দেখেছি যে সম্মোহনের সর্বজনস্বীকৃত কোন মতবাদ নাই। সম্মোহন নিয়ে গবেষণা আজও চলছে। তবে আইভ্যান প্যাভলভের মতবাদ অনেকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।

(ঙ) প্যাভলভের মতবাদ ঃ আইভ্যান পেট্রোভিচ্ প্যাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) ছিলেন রাশিয়ার সবচেয়ে বড় শরীরতত্ত্ববিদ। তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির বৈদেশিক সদস্য ছিলেন এবং ১৯০৪ সালে পরিপাক যন্ত্রের ওপর কাজ করে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। প্যাভলভ্ শরীরতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তাঁর মতে মনস্তত্ত্বের সব সমস্যাই শেষকালে শরীরতত্ত্বের সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। তিনি উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের ওপর গবেষণা করতে গিয়েই সম্মোহন, ঘুম, ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হ'ন। তাঁর মত অনেকটা ম্যাকডুগাল যেখানে তাঁর মতবাদটিকে অস্পষ্ট রেখেছেন, প্যাভলভ সেখানে স্পষ্ট করে তাঁর মতকে ব্যক্ত করেছেন।

প্যাভলভ্ বলেন যে স্নায়ুতন্ত্রকে আমরা কতকগুলো স্বাভাবিক (unconditioned) জিনিস দিয়ে উত্তেজিত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, একটি কুকুরের সামনে এক টুকরো মাংস ফেলে দিলে তার লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হবে। এখন এই স্বাভাবিক উত্তেজকের সঙ্গে কোন অস্বাভাবিক জিনিস জুড়ে দিলে কালক্রমে এই অস্বাভাবিক জিনিসটিও স্বাভাবিক জিনিসটির মতই উত্তেজক (conditioned) হয়ে উঠতে পারে। যেমন, ধরা যাক

কুকুরটির সামনে প্রতিবার মাংস দেবার ঠিক আগে তার নাম (ভোলা) ধরে তাকে ডেকে তবে মাংস দে'য়া হ'ল। এ-ভাবে কয়েকবার নাম ডেকেই পরক্ষণেই মাংস দিলে, পরে তার নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটির লালাগ্রন্থি থেকে লালা ঝরতে শুরু করবে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এখন তার নামটি (ভোলা) মাংসের কাজটি করতে পারবে— অর্থাৎ লালা ঝরাতে পারে। সুতরাং এটা অস্বাভাবিক (যেটা সাধারণতঃ উত্তেজক নয় অর্থাৎ লালা ঝরায় না) জিনিস (conditioned) হিসেবে রূপ পেল। এমনিভাবে, প্যাভলভ্ বলেন, আমাদের ভাষাও অস্বাভাবিক শব্দ মাত্র নয়, ভাষাও স্বাভাবিক উত্তেজকের মত কাজ করতে পারে(second signalling system)। এ বিষয়ে প্যাভ্লভের উক্তি দারুণ গুরুত্বপূর্ণঃ বয়ঃপ্রাপ্ত গোটা পূর্ববর্তী জীবনে শব্দ বা ভাষা ভেতরের এবং বাইরের মস্তিষ্কমুখ, সমস্ত উদ্দীপকের সঙ্গে সর্ব্বদা জড়িত ছিল বলে শব্দ বা ভাষা ঐ-সব উদ্দীপকগুলোর মতই কাজ করতে সক্ষম।

প্যাভলভের আরও একটি ধারণা সম্মোহনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশ উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা পার্শ্ববর্তি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে (irradiation)। তেমনিভাবে স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশে বাধ (inhibition)এলে তা'ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত করা হলেও স্নায়ুতন্ত্র যদি প্রতিক্রিয়া না করে তাহলে সে অবস্থাকে আমরা বাধ বলি। এখন, একই উত্তেজনা (বিশেষকরে অল্প উত্তেজনা) বার বার প্রয়োগ করলে এবং সে উত্তেজনার সঙ্গে যদি কোন স্বাভাবিক উত্তেজক (unconditioned) না থাকে তাহলে স্নায়ুতন্ত্রে তাড়াতাড়ি বাধ এসে যায়। মস্তিষ্কের এক অংশ বাধিত (inhibited) হলেও অন্য অংশ স্বাভাবিক থাকতে পারে।

সম্মোহনে ব্যক্তিকে অনুত্তেজক পরিবেশে রাখা হয়, সুতরাং তার মধ্যে বাধ সহজেই আসতে পারে। এরপর সম্মোহনকারী ঐ ব্যক্তিকে একই উত্তেজক (যেমন চোখের ওপর আলো) অনেকক্ষণ ধরে (প্যাভ্লভের ভাষায় বারবার) দিতে থাকেন। তার ফলে ব্যক্তির চোখের স্নায়ুগুলো স্বাভাবিক-ভাবেই ক্লান্ত হয়ে আসে এবং সে-গুলোতে বাধ নেমে আসে। এই বাধ ক্রমে সমস্ত মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। সম্মোহনকারী ঐ ব্যক্তির সঙ্গে কথার মাধ্যমে তার মস্তিষ্কের একটিমাত্র অংশ জাগিয়ে রাখেন (auditory area)।

বাকী সমস্ত মস্তিষ্কে বাধ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। 'পাস'ও আনতে পারে। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কের সবগুলো অংশই প্রায় কমবেশী উত্তেজিত থাকে। তার ফলে কোন একটি অংশের প্রতিক্রিয়া অন্ততঃ কিছুটা বাকী অংশগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন পূর্বের উদাহরণে আমরা দেখেছি যে হাতে মারাত্মক অস্ত্র থাকলেও রাগের মাথায় আমরা কাউকে আঘাত করি না। এর কারণ এই যে মস্তিষ্কের এক অংশ অনুরূপ প্রতিক্রিয়া করতে চাইলেও অপর অংশ বাধা দেয়। কিন্তু আমরা দেখলাম যে সম্মোহনে শুধুমাত্র একটি অংশ জাগ্রত বা উত্তেজিত থাকে এবং বাকী অংশগুলো ঘুমিয়ে পড়ে বা বাধিত থাকে। সুতরাং এই উত্তেজিত অংশে যে কোন অভিভাবন দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হবে এবং এই প্রতিক্রিয়া অন্যান্য অংশগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। এই কারণেই সম্মোহনের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশী হয় (যেমন আগেই বলা হয়েছে যে চোয়ালের মাংসপেশী ৬০০ পাঃ—এর মত চাপ সৃষ্টি করতে পারে) এবং ত্বরান্বিত হয়। আর এই একই কারণে সম্মোহিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্মোহনকারীর অভিভাব (rapport) হয়ে থাকে। কেননা এই ভাব মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

আগেই বলা হয়েছে যে সম্মোহন কেন করা সম্ভব তা আমরা আজও ভালভাবে জানি না। অনেক মতবাদ আছে এ-ব্যাপারে। পরীক্ষানিরীক্ষা আজও চলছে। ভবিষ্যতে আমরা হয়তো সম্মোহনকে সঠিকভাবে জানতে পারব। রাশিয়াতে অবশ্য প্যাভলভের ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্যান্য সবদেশে প্যাভলভের মতবাদকে মেনে নিতে পারে নি সবাই। প্যাভলভের মতবাদে এদের প্রশ্ন এই যে বার বার একই উত্তেজনা দেবার ফলে যদি মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ বাধিত হয়, তা'হলে সম্মোহনকারীর বার বার একই অভিভাবন দেবার ফলে সম্মোহিত ব্যক্তির মস্তিষ্কের ঐ-অংশও কেন বাধিত হয় না। আরও একটি প্রশ্ন এই যে শরীরতত্ত্ববিদ হেসের (Hess) মতে আমাদের মস্তিষ্কে ঘুম-কেন্দ্র আছে। ঐ-কেন্দ্র তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা উত্তেজিত করে তিনি নিদ্রা সৃষ্টি করাতে পেরেছেন। অর্থাৎ, প্যাভলভের মতে নিদ্রা বাধ-এর ফলে হয়ে থাকে। হেসের পরীক্ষার ব্যাখ্যা অবশ্য প্যাভ্‌লভ করেছেন, কিন্তু সে-ব্যাখ্যা সবাই সন্তোষজনক বলে মনে করেন না। যাহোক, সম্মোহন মানুষের মনের (বা মস্তিষ্কের) বৈশিষ্ট্যের

একটি বিরাট দিক আমাদের কাছে খুলে দিতে পারে বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, সম্মোহন মানুষের অনেক অনেক কল্যাণে আসতে পারে। ভবিষ্যতে সম্মোহন সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক জানতে পারব এবং সম্মোহন আমাদের আরও অনেক কল্যাণে আসবে, হয়তো এ-আশা আমরা করতে পারি।

* * * *

ফ্রয়েডের রচনাবলী

1. Beyond the Pleasure Principle
2. Group Psychology & Analysis of the Ego.
3. The Ego and the Id.
4. The Future of an Illusion
5. Civilization and Its Discontents
6. New Introductory Lectures on Psychoanalysis.
7. An Autobiographical Study.
8. Inhibitions, Symptoms and Anxiety.
9. Moses and Monotheism
10. An Outline of Psychoanalysis.
11. On Dreams.
12. Studies on Hysteria (with Breuer).
13. The Interpretation of Dreams.
14. Psychopathology of Everyday Life.
15. Wit and Its Relation to the Unconscious
16. Modern Sexual Morality & Modern Nervousness
17. Three Contributions to the Theory of Sex.
18. Introductory Lectures on Psychoanalysis
19. A General Introduction to Psychoanalysis.
20. Collected papers.

    Vol. I : Early Papers. History of the Psychoanalytial Movement

    Vol. II : Clinical Papers. Papers on Technique.

    Vol. III : Case History.

    Vol. IV : Papers on Metapsychology and Applied Psychoanalysis.

    Vol. V : Miscellaneous Papers, 1888—1938.

পরিশিষ্ট-৩

গ্রন্থতালিকা

(যে সব বই ও পত্রিকা থেকে সাহায্য নিয়েছি)

1. Jones, Ernest : The Life and Work of Sigmund Freud.
2. James William : The Principles of Psychology, Vol. I&II
3. Chrichton-Miller. H : Psychoanalysis and Its Derivatives
4. Brown. J. A. C : Freud and the Post-Freudians.
5. Coleman, James C : Abnormal Psychology and Modern Life.
6. Kolb, Lawrence C : Noyes' Modern Clinical Psychiatry.
7. Anderson, E. W. & Dawson, W. S. : Aids to Psychiatry
8. Pavlov, I. P. : Selected Works.
9. Fedotov, D Portonov, A. : Psychiatry
10. McDougall, William : An Outline of Abnormal Psychology.
11. Freud, Sigmund : New Introductory Lectures on Psychoanalysis
12. Freud, Sigmund : A General Introduction to Psychoanalysis.
13. Freud Sigmund : On Dream.
14. Freud Sigmund : The Interpretation of Dreams.
15. Freud Sigmund : Collected papers, Vol. I, II, III, IV, & V.
16. Marcuse, F. L. : Hypnosis : Fact and Fiction.
17. Platonov, K. I, : The Word as a Physiological and Therapeutic Factor.
18. Dilling, Walter J. : The Pharmacology and Therapeutics of the Materia Medica.
19. Bykov, K. M. : A Text Book of Psychiatry.
20. The British Journal of Medical Hypnotism, Vo. I, No. 2, December, 1949.